পরস্পর

উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

ডি, এম্, লাইব্রেরি
৬১ কর্ন্ওয়ালিস ষ্ট্রিট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি, এম্, লাইব্রেরি

৬১ কর্ন্‌ওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর, ১৯৩৪

দুই টাকা

প্রিণ্টার — শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই উপন্যাসের বেশির ভাগ ১৯৩২ সনে লেখা।

শুধু শেষের পরিচ্ছেদ এই বছরের

প্রথম পরিচ্ছেদ

'চলো না, চলো না, মা।' অশান্তর কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্যের সঙ্গে উৎকণ্ঠা বেজে উঠলো। এক দ্রুত দৃষ্টিপাতে সে ফোলা-ফোলা শ্বেতায়মান কেশগুচ্ছের নিচে তার মা-র মুখ দেখে নিলে। 'না রে', ক্ষীণ একটু হেসে বাসন্তী বললেন, 'আজ থাক।'

'কেন, কেন মা?' চুলটাকে বুরুশের একটা শেষ ঘষা দিয়ে অ আয়নার কাছ থেকে সরে' এলো। এই নিরাশার জন্য ছিলো না। প্রতি রবিবার বিকেলে মা-কে নিয়ে সে বে এর ব্যতিক্রম বড়-একটা হয় না। আর, এ ছাড় নেই; কারণ, বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা সময়। সপ্তাহে দু'দিন—যে-সময়টা লোকে বিশ্রাম বন্ধু-সাহচর্য্যে, গল্প-গুজবে, আমোদে-উৎসবে কাটায়, বসে' থাকতে হয় কাগজপত্র-ভারাক্রান্ত তার সব (ধুলো, ছাপার কালি আর বিড়ির ধোঁয়া মি সময় কী-রকম ভারি, বিশ্রী একটা গন্ধ); স্ফুটনোন্মুখ দেশোদ্ধারকারী ও সমাজ-সং উৎকটতরো ইংরিজিতে লেখা সব চিঠি; লিখতে হ সভার অধিবেশন আর পাট আর মাঞ্চুরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পাদকীয়; রাস্তার আলো সম্বন্ধে কর্পোরেশনের নতুন প্যারাগ্রাফ। সেই সব লেখা তখন-তখন নিচের তলায় চ

বিশাল রোটারি যন্ত্রের উদর-পূরণ করতে, লৌহ-গুঞ্জনে যায় অসংখ্য চাকা পারস্পরিক নিখুঁত সমন্বয়ে নির্ভুল, দ্রুতবেগে কাজ করে' যাচ্ছে। পরদিন সকালবেলা কলকাতার হাজার-হাজার লোক চায়ের সঙ্গে তার সেই সম্পাদকীয় গলাধঃকরণ করে—ভাবা যায় না! এবং—যা আরো আশ্চর্য্য—কেউ-কেউ সেই লেখার সমর্থন, প্রতিবাদ, সমালোচনা লিখে পাঠায়। যতটা উৎসাহ নিয়ে তারা পড়ে, তার দশভাগ—একশো ভাগ নিয়েও যদি সে লিখতে পারতো!

এই রবিবারটা ছুটি। ঈশ্বর ছ'দিনে সৃষ্টি সমাধা করে' সপ্তম দিনটা বিশ্রাম নিয়েছিলেন; ছ'দিন অবিশ্রান্ত অনাসৃষ্টি করে' সপ্তম দিনে
পায় মুক্তি। এর বিকেলটা মূল্যবান, অমূল্য। ক্রিশ্চানরা ছুটির
বিত্র বলেছে, কোনো-না-কোনো সেইণ্টের স্মৃতির সঙ্গে তা
কিন্তু তার চেয়ে গভীরতর এক অর্থে ছুটির দিন পবিত্র :
বা মানুষের সব চেয়ে পবিত্র কাজ। সমস্ত অবান্তরতা
র মত নিছকভাবে, পরিপূর্ণ করে' সে শুধু সে।
সমস্ত কলকাতা। আজকের মত, সে যে আছে,
রদিকে আন্দোলিত, উচ্ছল জীবন-প্রবাহের কাছে এ-ই
অক্ষত সম্পূর্ণতা তার মনে। বাসন্তী বেড়াতে
প্রাহ অশান্ত এই সময়ের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে
ল্ল হৃদয়ে গভীর তৃপ্তি, তারা দু'জনে তাদের
। তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না, তা নিয়ে
গের ঠাট্টার বিরাম নেই। একটা বাড়ির দক্ষিণের
র জাল দিয়ে ঘেরা—সে-সম্বন্ধে একটা তীব্র মন্তব্য করাই
বাড়ির জানলায় নতুন পরদা লাগানো হয়েছে; ও-বাড়ির
শু-গোষ্ঠী একসঙ্গে চীৎকার আরম্ভ করেছে, কিন্তু সেই কলরবও

ছাপিয়ে উঠেছে পাশের বাড়ির গায়িকা-মেয়ের স্নায়ু-বিদারক, তীব্র কণ্ঠস্বর। তাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তারা গভীরভাবে কৌতূহলী, কিন্তু দূর থেকে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে; রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে যেটুকু চোখে পড়ে, নজরে আসে—সেই পর্য্যন্ত; তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করবার কথা তারা ভাবে না। কারণ, দূর থেকে সব মানুষই কম কি বেশি কৌতূহল উদ্দীপিত করে; দূর থেকে লক্ষ্য করবার পক্ষে সব মানুষই চমৎকার, অনায়াসে তাদের ভালোবাসা যায়। এবং সেই ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কখনো তাদের কাছে না-আসা; ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে পরিচিত না-হওয়া। রাস্তায় যেতে-যেতে দৈবাৎ দু'জন লোকের একটু বিচ্ছিন্ন আলাপ কানে এলো—মনকে তা নাড়া দেয়, কল্পনা তা অবলম্বন করে' সম্ভাবনার গলি থেকে বাঁকা গলিতে ঘুরে বেড়ায়—বিচিত্র তার রহস্যময়তা। কিন্তু তাদের সঙ্গে সংযোগ যদি ওখানেই সমাপ্ত না-হ'তো, যদি কখনো কোনোক্রমে তারা নিজের জীবনের পরিধির মধ্যে এসে পড়তো, তাহ'লে হয়-তো দেখা যেতো, পৃথিবীর সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত bore-গোষ্ঠীর তারা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, যাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোককে শুধু দূর থেকে, নিঃসম্পর্ক দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেই ভালোবাসা যায়; কোনো অপচালিত শুভেচ্ছা থেকে তাদের সঙ্গে মিশতে যাওয়া মানেই নিজের মনে রচিত তাদের সুন্দর মূর্ত্তিকে নষ্ট করা, এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও যন্ত্রণা দেয়া। 'প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে', তাঁর এই আদেশ পালন করা কত কঠিন, তা সম্পূর্ণ জেনে-শুনেই যীশুখৃষ্ট এ-কথা বলেছিলেন; প্রতিবেশী এত নিকট বলে'ই আমাদের মনে তার প্রতি ভালোবাসার ঠিক উল্টো ভাবই হয়। কিন্তু আধুনিক নাগর জীবনে যীশুর আদেশ পালন

করবার ব্যবস্থা আমরা করেছি : প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবধান হচ্ছে সব চেয়ে বেশি ; পাশের ফ্ল্যাটে যে-পরিবার বাস করে, আমাদের যেটুক্ এসে যায়, তার অস্তিত্ব না-থাকলেও চলতো। এবং যে-জিনিসের অস্তিত্ব নেই, তাকে ভালোবাসতে কোথাও আটকায় না। এই ছোট রাস্তায়, মধ্যবিত্ততার ছাপ-মারা বাড়িগুলোর যারা অধিবাসী, বাসন্তীর কাছে তাদেরই বা অস্তিত্ব কী ? তবু, একটু বেশ উপভোগ্য পরচর্চ্চা করতে-করতে রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে যায়—মা আর ছেলে—ছোট-খাটো, পরিচ্ছন্ন এক মহিলা, ধবধবে সাদা পোষাকের শীতল দূরত্বে শান্ত, চোখের কোলে বয়েসের সূক্ষ্ম রেখা, কিন্তু আশ্চর্য্যরকম মসৃণ, নরম গায়ের রঙ, ষোলো বছরের মেয়ের মত নিটোল, মসৃণ ঘাড়—খর্ব্ব, ঘন চুলে আবৃত ; আর তাঁর পাশে ক্ষীণাঙ্গ এক যুবক, কপাল থেকে চুলগুলো সুন্দরভাবে উপর দিকে আঁচড়ানো, মুখের রঙে উষ্ণ রক্তাভা। কী তুচ্ছ একটা কথায় উচ্ছল হাসি বেজে ওঠে, হাসির ধাক্কা সামলে নেবার জন্য বাসন্তী একটু থামেন। ছোট রাস্তা পার হ'য়ে তারা ট্র্যাম ধরে ; অশান্তর মুখে কথার বিরাম নেই ; তার ভিতর থেকে আনন্দের বুদ্বুদ যেন মুখের কথা হ'য়ে ফেটে বেরুচ্ছে। সোনালি বিকেলের ভিতর দিয়ে ট্র্যাম চলে ; ট্র্যাম-লাইনের পাশে গাছের সারি রোদে রূপান্তরিত, সবুজ হীরের মত জ্বলছে প্রতি পাতা। এদিকে চৌরঙ্গির কোনো দালানের জানলার কাচে রোদ হঠাৎ আটকা পড়েছে, যেন কোনো নতুন, আশ্চর্য্য বার্নিশে দালানের সমস্ত সামনাটা ঝল্‌মল্ করছে। অন্যদিকে, আকাশ-ভরা আলোর নিচে বিস্তৃত ময়দান যেন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ঘুমিয়ে আছে। কোনোদিন, যদি একটু দেরি হ'য়ে যায়, ফোর্টের গা ঘেঁষে অত্যন্ত লাল, অত্যন্ত গোল এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ চেহারার এক সূর্য্যকে তারা অস্ত যেতে দেখে। এস্‌প্লানেডের

পরস্পর

কাছাকাছি এসে তারা ট্রাম থেকে নামে ; এলোমেলো হেঁটে বেড়ায়, ময়দানের ভিতর দিয়ে প্রায় গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত, না-হয় চৌরঙ্গি দিয়ে নিরুদ্দেশ পদচারণা। রবিবার বলে' রাস্তায় ভিড় একটু কম ; ও-অঞ্চল অপেক্ষাকৃত শান্ত। কারণ, ভারতবর্ষ যারা শাসন করছে, তাদের ধর্ম্মভাব অন্তত এই রবিবার-পালনে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট ; শনিবার রাত্রির হুইস্কির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ধর্ম্মভাব মিশে তাদের অনেককেই সেদিন ঘরে আবদ্ধ করে' রাখে। মোটের উপর, চৌরঙ্গি সেদিন একটু নিষ্প্রভ, নির্জীব হ'য়েই থাকে ; এবং সেটাই অশান্তর ভালো লাগে—এমনিতেই যথেষ্ট গোলমাল, যথেষ্ট লোকজন তার জীবনে আছে—যথেষ্টরও বেশি। কোনোদিন তারা কোনো জিনিস কিনতে যায় মার্কেটে ; চেনা দোকানি দেখামাত্র একগাল হেসে নমস্কার করে ; যে-জিনিসের যা দাম চায়, বাসন্তী দর-দস্তুর করে' তার অনেক কমে সেটা কিনে আনেন ; বাইরে এসে সগর্ব্বে, বিজয়ের স্বরে বলেন : 'দেখলি ! তুই হ'লে তো যা চেয়েছিলো, তা-ই দিয়ে নিয়ে আসতিস।'

'শীতল সাহার সঙ্গে অতক্ষণ কথা বলার চাইতে বরং চার আনা বেশি খরচ হওয়া ভালো', অশান্ত ঠাট্টা করে।

'তা কেন ? কম দিয়ে যখন পারা যায়, বেশি কেন দিতে যাবো ? আমার মনে হয়, দোকানিরা সবাই তোকে ঠকায়।'

'যেটুকু ঠকায়, তুমি সেটা পুষিয়ে নাও। বেশি।'

বাসন্তীর মনের মধ্যে হঠাৎ কী-রকম খটকা লাগে : 'আচ্ছা, তোর কি মনে হয় আমাকে কম দামে জিনিসটা দিয়ে দোকানির সত্যি-সত্যি ক্ষতি হয়েছে ?'

'হ'তে পারে।'

'সত্যি ?' বাসন্তী খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটেন। অশান্ত আড়চোখে

তাকিয়ে দেখে, তাঁর মুখে চিন্তার ছায়া, মনে-মনে হেসে সে বলে : 'তবে দোকানি আমার চেয়েও ওস্তাদ ; একটা জিনিস এক পয়সা কমে ছাড়লে আর একটায় দু'পয়সা বেশি আদায় করে' নেবে। তুমি যতই দর-দস্তুর করো, ওদের যা লাভ থাকবার তা থাকবেই।'

'তা তো বটেই।' মুহূর্তে বাসন্তীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। 'না হ'লে ওদের চলবে কী করে? আর, সত্যিই তো, যদি ওর তেমন ক্ষতিই হ'তো, তাহ'লে কম দামে না দিলেই হ'তো ; আমি তো আর জোর করে' নিয়ে যেতুম না।'

* * *

হঠাৎ, অশান্তর মনের ঘনায়মান নিরাশার মধ্যে একটা আলো জ্বলে' উঠলো। 'তুমি না বলেছিলে, মা', সাগ্রহে সে বললে, 'কয়েকটা কাচের গেলাসের দরকার। চলো না আজ কিনে আনি।'

'দরকার মানে কি আর আজ না-কিনলেই চলবে না?'

'আজ হাতে টাকা ছিলো', (এটা অবিশ্যি সম্পূর্ণ সত্য নয় ; টাকা ছিলো, তা ঠিক ; কিন্তু তা দিয়ে পরের দিন একটা দেনা মেটাবার কথা ছিলো।) 'পরে তো আর থাকবে না—তাই এখন কিনে ফেলাই ভালো।'

'তোর এতই যদি গরজ হ'য়ে থাকে, যা না। না-হয় মালতীকে নিয়ে যা।'

'তুমিও তো যেতে পারো।'

'আমার আজ শরীরটা ভালো নেই।'

'ভালো নেই?' দপ করে' অশান্তর মুখের সব আলো নিবে গেলো। 'কী হয়েছে, মা?'

'কী আবার হবে। কিন্তু তুই যা না, একটু ঘুরে আয় না গিয়ে। মালতীকে নিয়ে বায়োস্কোপ দেখেও আসতে পারিস।'

'থাক গে, ইচ্ছে করছে না।'

অশান্ত একটা চেয়ারে বসে' পড়লো। সূক্ষ্মগতি, অদৃশ্য, অশুভ এই শক্তি : তার মা-কে তা পরাস্ত করেছে। সাধারণভাবে দিন কেটে যায়, কিছুই টের পাওয়া যায় না; কিন্তু হঠাৎ এক-এক সময় তা নিজের অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়ে যায়; ভয়ের যন্ত্রণায় অশান্তর রক্ত যায় হিম হ'য়ে। হৃৎপিণ্ড যাদের রুগ্ন, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ যে-কোনোদিন, যে-কোনো মুহূর্ত্তে···

'তোর বড় যে-ভাই ছিলো, সে যখন মারা গেলো পাঁচ বছর তার বয়েস। আমার বিয়ের দু' বছর পরে তার জন্ম। মাথা ভরা তার ভারি সুন্দর চুল ছিলো, আর ঐ বয়েসেই একবার তোর বাবাকে বড়-বড় অক্ষরে চার পৃষ্ঠা ভরা চিঠি লিখেছিলো। সে মারা যাওয়ার পর একমাস আমি একরকম বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম, কারো সঙ্গে কথা বলতাম না—একেবারে চুপচাপ। একটুও, একটুও কাঁদতে পারতাম না। তারই ফলে—ডাক্তাররা বলেছিলো—আমার সাংঘাতিক এক অসুখ করলো। কতদিন, কতদিন যে ভুগছিলাম। এমন আশা ছিলো না যে বাঁচবো। মরতে-মরতে ভালো হ'য়ে উঠলাম। সেই থেকে আমার হার্টের দোষ; সেই থেকেই মাঝে-মাঝে আমার বুকে ও-রকম ব্যথা হয়। তখন অবাক হ'য়ে ভাবতাম, কেন, কেন আমি বেঁচে উঠলাম। কিন্তু তার পরের বছরই তুই···'

পরের বছরই সে হ'লো। তার আগে কোথায় ছিলো সে? 'ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি বুকের মাঝারে।' ও-সব হচ্ছে কবিত্ব, ধোঁয়া, বাজে কথা—আধুনিক মনোবিজ্ঞান তা-ই বলছে। শিশু যখন জিজ্ঞেস করবে, 'কী

করে' আমি হ'লাম ?' তখন কোনো ফাঁকা কথা বলে' তাকে বুঝ দিয়ো না—নদীর স্রোতে তুই ভেসে এসেছিলি, চাঁদ থেকে ধুপ্ করে' পড়েছিলি তুই; এক পরী এসে তোকে দিয়ে গিয়েছিলো আমাদের কাছে। সত্যি ব্যাপারটা তাকে জানতে দাও; তাকে নিয়ে যাও ফুলের বাগানে ; বুঝিয়ে দাও কেমন করে' এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে এসে পড়ে, কেমন করে' গাছে ধরে নতুন কলি। তার মন সুস্থভাবে গড়ে' ওঠবার পক্ষে ও-বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারণা না-থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি বুকের মাঝারে—ও তো সুন্দর একটা কথা, রঙিন এক টুকরো কাচ, তা দিয়ে তার মন ভুলিয়ো না। শিশুকাল থেকে বিজ্ঞানের দৃঢ়, উজ্জ্বল পাথরে সে অভ্যস্ত হোক্। বিজ্ঞান সত্য। সত্যকে আমরা চাই, যে-কোনো মূল্যই তার জন্য দিতে হোক্ না। তার খাতিরে দুটো একটা স্বপ্নভঙ্গ আর মোহমুক্তি, কল্পনার অপমৃত্যু—কিছুই গ্রাহ্য করবার নয়। জয় হোক্ সত্যের। দূর করে' দাও ও-সব ভণ্ডামি—বন্যার জলে তোকে পেয়েছিলাম, তুই আমার চাঁদের টুকরো, বাগানের চাঁপা গাছে সব চেয়ে বড় ফুল ফুটেছিলি তুই। ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি বুকের মাঝারে।—কিন্তু সেটাই কি কম সত্য ? সে তো এই ইচ্ছাই, এই ইচ্ছা হ'য়ে সে ছিলো সবার আগে। এই ইচ্ছা সে। আর বুকের মধ্যে ইচ্ছা হ'য়ে যে ছিলো, সে আজ বুকের উপর, ছোট মুঠি দিয়ে সে বুক আঁকড়ে ধরে' শোষণ করে প্রবৃত্তি-অন্ধ মুখ দিয়ে। এখনো অন্ধ, এখনো অর্দ্ধ-অচেতন প্রাণ—এখনো তার গর্ভ-জীবনের চরম নির্ভরশীলতায় সে মায়ের সঙ্গে লীন, একীভূত। 'খোকা আমার, সোনা আমার, মাণিক আমার…'

* * *

'সোনা আমার, মণি আমার, আমার চোখের তারা, আমার আকাশের চাঁদ।' ঘুমের মত নরম মায়ের কণ্ঠস্বর। মায়ের কোলে সে

পরস্পর

শিশু, তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই; সে মায়ের অংশীভূত, অঙ্গীভূত। 'মাণিক আমার, সোনা আমার'. আকাশের চাঁদের নিচে একটানা সুর কাঁপছে, 'তুই আমার বুকের রক্ত, আমার মাংস।' সমস্ত সহর শান্ত, চাঁদের নিচে মা আর ছেলে। 'খোকার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।' 'ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের ঘরে এসো…।' সূক্ষ্ম, সাদা ধোঁয়ার মত চাঁদের উদ্দেশ্যে মায়ের কণ্ঠস্বর; রাত্রির নীরবতাকে সেই স্বর আঘাত করছে না, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে; একভাবে তাকে আরো গভীর করে' দিচ্ছে। 'ঘুম, ঘুম, ঘুম। খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলো দেশে। খোকা, তুই ঘুমো। লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার, ঘুমো, ঘুমো।' চাঁদের দিকে সে ছোট-ছোট আঙুল বাড়িয়ে দেয়—চাঁদকে তার চাই। 'খোকা, তোকে চাঁদ ধরে' দেবো, তুই ঘুমো। চাঁদ, চাঁদ, চাঁদ, তুমি এসো আমার খোকার কাছে, তার কপালে চুমো খেয়ে যাও, তার চোখে চুমো খেয়ে যাও, ঘুম পাড়িয়ে যাও তাকে। চাঁদ; চাঁদ, চাঁদ—আমার আকাশের চাঁদ, আমার চোখের তারা, মণি আমার, সোনা আমার, ঘুমো, তুই ঘুমো।' তন্দ্রাচ্ছন্ন, মোহময়, এই ক্ষীণস্বর চাঁদের দিকে কাঁপতে-কাঁপতে মিলিয়ে যায়: এই ঘুম-পাড়ানি সুর যেন রাত্রির প্রশান্ত সত্তারই অন্য এক প্রকাশ, তার শ্রাব্য সংস্করণ। 'খোকা আমার, সোনা আমার…'

শীতের প্রত্যুষ। ঘুম ভেঙে আধো-অন্ধকার ঘরে সে চোখ মেললো। বালিসে, বিছানায় সমস্ত রাত্রির ঘুমের উষ্ণ, মিষ্টি গন্ধ। তার চেয়েও মিষ্টি গন্ধ তার মা-র গায়ে। মা-র আরো কাছে সরে' গিয়ে সে তাঁর গলার হার ধরে' কয়েকটা টান দিয়ে ডাকলো, 'মা, মা।' মা-র শরীর থেকে স্রোতের মত স্নেহের উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে তার মধ্যে; তাঁর

বুকের মধ্যে সজোরে মুখ চেপে সে চুপ করে' রইলো। খানিক পরে সে হাঁপিয়ে উঠলো ; সরে' এসে তাকালো ঘরের লঘু অন্ধকারের দিকে। জলের মত ম্লান, পায়ের দিকে জানলার কাচ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু ছটফট করে' আবার সে মা-র দিকে ফিরলো—বিছানায় থাকতে আর তার ভালো লাগছে না। ঘুম-ভাঙা, জড়ানো গলায় সে আবার ডাকলো, 'মা, ওঠো, ওঠো।'

'উঁ ?' ঘুমের মধ্যে বাসন্তী সাড়া দিলেন। তাঁর এক হাত অজান্তে অশান্তর মাথার উপর এসে পড়লো।

'ওঠো মা, ওঠো।'

বাসন্তী চোখ মেললেন।—'বাবাঃ, এরই মধ্যে ছেলের ঘুম ভেঙে গেছে!' অশান্তর ঘন চুলের মধ্যে তাঁর আঙুলগুলো খেলা করতে লাগলো। 'আর-একটু ঘুমো। রোদ উঠুক।'

'আর ঘুমোবো না, মা।'

'তবে চুপ করে' শুয়ে থাক্।'

'না, মা', অশান্ত লাথি মেরে তার গা থেকে লেপ সরিয়ে দিলে, 'শুয়ে থাকবো না।'

বাসন্তী লেপটা ফের তার গায়ের উপর টেনে দিলেন। তাঁর হাতের চুড়ির টুংটাং শব্দ হ'লো। 'চুপ কর্।'

অশান্ত সজোরে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো, 'চুপ করবো না—' কিন্তু হঠাৎ সে চুপ করে' গেলো। ঘরের ম্লান ধূসরতায় মা-র অশরীরী স্বর অদৃশ্য রেখার সুরের নক্সা এঁকে যাচ্ছে। জানলার কাচ স্পষ্টতর হ'য়ে ফুটে উঠলো ; ঘরের জিনিসগুলোর পরিচিত আকৃতি একটু-একটু চোখে পড়ে। মৃদুস্বরে, মৃদুস্বরে তার মা গান করছেন, তাঁর কণ্ঠস্বরই একটা আদর। শুনতে-শুনতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরস্পর

নিচু চেয়ারের উপর একটা খাতা ছড়ানো : মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে' সেই খাতায় সে একমনে পেন্সিল দিয়ে দ্রুতগতিতে তির্যক সব রেখা এঁকে যাচ্ছে—তার নিজের মতে, ইংরিজি লিখছে। অনেক কল্পনা খাটিয়েও ও-রকম লেখায় বেশি বৈচিত্র্য আনা যায় না, অক্ষরগুলো মোটামুটি এক চেহারার হ'য়ে পড়তে চায়। একটু পরেই, তাই, সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। চোখ তুলে দেখলো; মেঝের মাঝখানে পা ছড়িয়ে বসে' বাসন্তী রঙিন বল্‌টা দিয়ে খেলা করছে। অমনি কাগজ-পেন্সিল ফেলে' সে গেলো ছুটে; বল্‌টার উপর হাত রেখে বললে, 'দে আমাকে।'

দু' হাত দিয়ে প্রাণপণে বল্‌টা আঁকড়ে ধরে' মালতী বললে, 'ন্‌না।'

উল্টো টান দিতে-দিতে অশান্ত বলবে, 'ছাড়্‌, ছাড়্‌ শিগগির।'

'না—না—না।' মালতীর গলা ক্রমশ চড়তে লাগলো। ঝাঁ করে' উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌টা সে বুকের উপর শক্ত করে' চেপে ধরলো। 'দেবো না, দেবো না।'

কোনো কথা না-বলে' অশান্ত স্থির দৃষ্টিতে মালতীর মুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ—ঠাস্—চড় বেজে উঠলো মালতীর গালে; এক টানে সে বল্‌টা কেড়ে নিলে। মালতীর মুখ টুক্‌টুক্ করে' উঠলো; আস্তে-আস্তে তার গালের, চোখের কোলের চামড়া রেখায়-রেখায় ভেঙে যেতে লাগলো, মুখ গেলো বাঁকাভাবে খুলে : চোখের উপর জল উঠে এসে একটু সময় যেন ইতস্তত করলো, হাঁ আরো বিস্ফারিত হ'লো—তারপর, অত্যন্ত হাস্যকরভাবে, মালতী রীতিমত কান্না জুড়ে দিলে; তার চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে তার খোলা মুখের মধ্যে ঢুকতে লাগলো। অবাক হ'য়ে অশান্ত রইলো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে মা এলেন।—'কী হয়েছে?'

'খোকা—আমায়—মেরেছে—মা—অ্যা-অ্যা—'

'তুই ওকে মেরেছিস্?'

'মেরেছি।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

'ইচ্ছে! মারতে খুব মজা লাগে—না?'

'লাগেই তো।'

'এত বড় ছেলে—একটুকু মেয়ের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না?'

'না, করে না।'

'মা, আমার—বল্—' মালতীর ফুরিয়ে-আসা কান্না তার বুক থেকে উঠে এসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কয়েকবার সশব্দে নিঃসৃত হ'লো।

'তুই ওর বল্ নিতে গেলি কেন?'

'নেবোই তো।

'নেবোই তো! আব্দার ছাখো না ছেলের! আচ্ছা বেশ—থাক্ তুই বল্ নিয়ে। চল্ রে মালতী আমরা এখান থেকে যাই।' অশান্তর দিকে তার দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত না করে' মালতীকে কোলে নিয়ে মা অন্তর্হিত হলেন।

একা ঘরে অশান্ত হাতের বল্টা খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। ভারি সুন্দর বল্টা—এক-এক দিকে এক-এক রকম রঙ, আলো লেগে এক সঙ্গে অনেক ছোট-ছোট রামধনু ঝলসে ওঠে। জিনিসটাকে সে সত্যি বড় ভালোবাসতো। কিন্তু হঠাৎ তার কী মনে হ'লো, এক আছাড়ে সে সেটা ছুঁড়ে মারলো মেঝের উপর, কাচের বল্ বোলায়ারি আওয়াজ করে' ঠিক মাঝখান দিয়ে হু'ভাগ হ'য়ে ভেঙে গেলো।

পরস্পর

'কী হ'লো আবার?' মা আবার এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তারপর, দ্বিখণ্ডিত বল্‌টা চোখে পড়ামাত্র—'এই ছাখো, বল্-বল্ করে' মারামারি, সেই বল্‌ই ভাঙলো তো!' তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তিনি রঙিন অর্দ্ধ-চন্দ্র দুটো কুড়িয়ে নিলেন; হাত দিয়ে জোড়া লাগাতে ঠিক মুখে-মুখে মিলে গেলো; জিনিসটা আবার তার প্রাক্তন স্বচ্ছ দীপ্তিতে জ্বলে' উঠলো।—'কী সুন্দর জিনিসটা, দিলে শেষ করে'। দস্যি ছেলের হাতে কিছু যদি থাকতো! কী করে' ভাঙলো?'

অশান্ত কথা বললে না।

'পড়ে' গিয়েছিলো হাত থেকে? না কি, ইচ্ছে করে' ভেঙে ফেলেছিস্?'

তবু অশান্ত চুপ।

বিরক্ত হ'য়ে বাসন্তী ছেলের ঘাড় ধরে' ঝাঁকুনি দিলেন। 'কথা কইতে পারিস্ নে? হয়েছে কী তোর?'

আর হঠাৎ, অশান্ত মা-র আঁচলে মুখ গুঁজে প্রবলভাবে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

শান্ত, অত্যন্ত শান্ত, মালতী আর সে বসে' আছে। কাছে একটা ইজি চেয়ারে পিঠ খাড়া করে' বসে' মা একটা উলের জামা সেলাই করছেন। কাঁটার নিয়মিত, মৃদু খুটখুট ছাড়া ঘরে আর শব্দ নেই। অনেক, অশান্তর মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে' কেউ কোনো কথা বলছে না। সুস্পষ্ট, প্রতক্ষ্য একটা হিংস্র শক্তি, নীরবতা তাদেরকে অসাড়, বাতগ্রস্ত করে' দিচ্ছে। অশান্ত সহজে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলো না, তার কান্না পাচ্ছিলো।

খুট-খুট, খুট-খুট: সময়ের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে এই শব্দ অবিশ্রান্ত নিজের

পুনরাবৃত্তি করে' চলেছে। দ্রুত, গোপন দৃষ্টিতে অশান্ত একবার মা-র মুখে তাকালো: বাসন্তীর মুখ সাদা, ব্যঞ্জনহীন, ঠোঁটের উপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ঠোঁট, কয়েক গোছা চুল বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গালের উপর এসে পড়েছে; শূন্য, স্থির দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, কলের মত কাজ করে' যাচ্ছে তাঁর দু'হাতের আঙুল! খুট্-খুট্, খুট্, খুট্-খুট্: একঘেয়ে, ক্লান্তিকর শব্দে একটা পোকা স্তব্ধতার শরীরকে খেয়ে যাচ্ছে। খুট্-খুট্: মস্তিষ্কের মধ্যে ভারি, অপ্রতিরোধ্য একটা নেশা ছড়িয়ে গেলো।

অশান্তর আর সহ্য হচ্ছিলো না। এই মোহ, এই মৃত অসাড়তা, হিম-স্পৃষ্ট নিরপেক্ষতা ভেঙে ফেলবার জন্য তার সমস্ত প্রবৃত্তির মূলে আলোড়ন জাগলো। মা-র উরুর উপর হাত রেখে, তাঁর সত্তাকে দাবি করে', জীবনের মধ্যে তাঁকে আকর্ষণ করে' সে ডাকলো, 'মা!'

কিন্তু বাসন্তী অনুপস্থিত; তিনি সেখানে নেই। বিচ্ছিন্নতার দুর্গে বন্দী, অশান্তর ডাক তাঁর মনে পৌঁছলো না। কথা না-বলে' তিনি শুধু ছেলের মুখে একবার তাকালেন; এমন নিরপেক্ষ, ভাবহীন, পাষাণ-শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন, যেন অশান্তর মুখ সাদা একটা দেয়াল, যা অতিক্রম করে' তিনি অন্য-কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন। যেন তিনি জানেন না যে এটা তাঁর ছেলের মুখ, যে তাঁর মাংস, তাঁর রক্ত। আত্ম-বিস্মৃতভাবে অশান্তর মুখে তাকিয়েই তিনি বুনে চললেন। তার মুখের উপর মা-র চোখ, অথচ তিনি তাকে দেখছেন না। সে নেই। কেমন একটা ভয়ে, তাড়াতাড়ি সে সরে' গেলো।

আর একটু পরেই বাসন্তী ফিরে এলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আটটা।' তারপর সেলাই রেখে দিয়ে রাস্তার দিকে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ঈষৎ-আনত পিঠের নরম ভঙ্গি দুঃখে, তিক্ততায়

মুখর। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তিনি কী যেন বললেন, অশান্ত বুঝতে পারলে না। তারপর, 'চল্ তোদের খাইয়ে আনি', শিশুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন। ঘরের পুঞ্জীভূত জড়তা ভেদ করে', যেন অনেক দূর থেকে মা-র কণ্ঠস্বর তাদের কানে এসে লাগলো। এখনো দূর, বিচ্ছিন্নতার দুর্গে এখনো বন্দী, মা তাদেরকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ নীরবতায়, ভাই-বোন মাখন আর ডিম-সেদ্ধ দিয়ে তাদের ভাত-খাওয়া সেরে উঠলো।

'যা', তাদেরকে আঁচিয়ে দিয়ে মা বললেন, 'ঘরে গিয়ে বোস্। আমি দুধ নিয়ে আসছি।'

দু'জনে অপেক্ষায় চুপ করে' রইলো। তবু সে একটা সংস্পর্শ চাইলো—ঘরের এই শূন্য, এই নেতি থেকে যে-কোনো মুক্তি। মালতীর কাঁধের উপর সে হাত রাখলো; সঙ্গে-সঙ্গে মালতী কাঁধ তুলে, মাথা পাশে হেলিয়ে, সেই হাত চেপে ধরলো তার গালের সঙ্গে। শরীর থেকে শরীরে, মূক, এবং মূকত্বে প্রবল অন্ধ, শিশু-সহানুভূতি স্রোতের মত বয়ে' চললো।

মা যখন দুধের পেয়ালা নিয়ে এলেন, অশান্ত আপত্তি করলে না, মা-র দিকে একবার তাকালো না পর্য্যন্ত। পেয়ালার মধ্যে জোর করে' দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে ফেললো।

'একটু জল, মা।'

ঠাণ্ডা, পাৎলা জল কৃতজ্ঞভাবে তার মুখ দিয়ে পেটে নেমে গেলো। দুধের আঠা-আঠা ঘনতার পর জলের স্নিগ্ধ তরলতা এত আরামের।

বাসন্তী আর একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। স্থির, ঈষৎ-আনত, যেন কিছু-একটা ঘটবার আশায় খানিকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে কিসের একটা শব্দ হ'লো। মুহূর্ত্তের জন্য চমকে উঠলো তাঁর

চোখ। তারপর, আবার শান্ত, স্তব্ধ, 'নাও, এইবার শুয়ে পড়ো তো তোমরা', সেই সুদূর, দুর্গান্তরালবর্ত্তী স্বরে তিনি বললেন।

ছোট বিছানায় বাসন্তী তার পাশে এসে বসলেন। হঠাৎ মা-র চোখের উপর তার হাত পড়লো। 'তুমি কেঁদো না, মা', রুদ্ধস্বরে সে বলে' উঠলো, 'বাবা আসবেন, এক্ষুনি আসবেন।'

'হুঁ। এখন ঘুমিয়ে পড়ো তো।'

চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে' অশান্ত শুয়ে রইলো। মা-র কোলের উপর তার একখানা হাত। এখানেও সে সেই সংস্পর্শ, বাস্তবতা খুঁজছে, কিন্তু ঠিক পাচ্ছে না। মা-কে সে ঠিক ছুঁতে পারছে না। মালতীর সঙ্গে তার সংস্পর্শে ছিলো একটা নির্ব্বাক, অপ্রকাশ্য পরস্পর-চেতনা, অন্তরঙ্গতায় ঐশ্বর্য্যময়, অন্ধকার অনুভূতির উষ্ণতা—এত গভীর সে-অন্তরঙ্গতা যে তা অচেতন। কিন্তু তার মা-র স্পর্শে হিমস্পৃষ্ট কাঠিন্য—দুই শরীরের মাঝখানে একটা ব্যবধান, বাইরের সংযোগ দিয়ে যা অতিক্রম করা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ সেই শৈত্য ভেঙে গেলো। গরম এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো তার হাতের উপর। অমনি তড়াক করে' সে উঠে বসলো; মা-র কোলে মুখ লুকিয়ে বললে, 'মা, তুমি কেঁদো না! তুমি কেঁদো না, মা।'

নিবিড় করে' তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' বাসন্তী অর্দ্ধ-স্ফুট, অর্দ্ধ-রুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলেন, 'খোকা, খোকা।' মা-র চোখের জলে অশান্তর গাল ভিজে গেলো। 'খোকা, খোকা।' মা-র বুক প্রতি মুহূর্ত্তে তার বুকের উপর ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তার মনে আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত শান্তির রাজত্ব।

পরে, রাত্রির এক অনিশ্চিত প্রহরে, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলো।

জানলার কাছে হাওয়ার বিলাপ, নিশীথের অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট কোনো ধ্বনি, যেন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উৎসারিত কোনো অবর্ণনীয় বেদনা। রাত্রির আত্মা থেকে রক্ত-ধারার মত সেই শব্দ উত্থিত হচ্ছে। অশান্ত চোখ মেললো না। তবু এক অবরুদ্ধ আক্রোশে তার সমস্ত অন্তর অন্ধ হ'য়ে গেলো।

*　　*　　*

বাবাকে তার শুধু অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। তার জীবনে তার বাবার অস্তিত্ব ছিলো সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক; অনিবার্য্য—এবং সম্ভবত প্রয়োজনীয়—বলে' তাঁকে সে মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; তাঁর সঙ্গে কোনোরকমের সংস্রব—না, না, সে-কথা সে ভাবতে পারতো না। তাঁকে সে ভয়ের চোখে, সন্দেহের চোখে, অবিশ্বাসের চোখে দেখতো—পারতপক্ষে কখনো কাছে যেতো না। দূর থেকে মাঝে-মাঝে —অদ্ভুত, অপ্রিয় জিনিস সম্বন্ধে মানুষের মনে যে-প্রবৃত্তিগত কৌতূহল আছে, তা-ই নিয়ে সে তাঁকে লক্ষ্য করতো, যেমন চিড়িয়াখানায় গিয়ে সম্মোহিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকতো শিকের পিছনে বনমানুষের কার্য্যকলাপের দিকে। একটা ইজি-চেয়ারে বসে' তিনি অবিশ্রান্ত চুরুট টানছেন আর বই পড়ছেন, তাঁর কপালের উপর এক পাশের চুল প্রায় সব সময় এসে পড়ে' আছে। মাঝে-মাঝে হাত দিয়ে সেই চুল সরিয়ে দেয়া ছাড়া তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর বিশেষ কোনো নড়াচড়া হ'তো না। স্থির, অত্যন্ত স্থির, এমন করে' তিনি বসে' থাকতেন যেন আসলে তিনি ওখানে নেই, যেন সত্যি-সত্যি তাঁর শরীর তাঁকে ধারণ করছে না। কদাচিৎ কারো সঙ্গে কথা বলতেন, খাবার সময় হ'লে অন্যমনস্কভাবে খাওয়া সেরে উঠে আপিসে চলে' যেতেন। ফিরে এসে আবার বসতেন বই আর চুরুট নিয়ে। দিনের

পর দিন এমনি কেটে যেতো। অশান্তর, শেষ পর্যন্ত, তাঁকে নিরীহ গোছেরই বনমানুষ মনে হ'তো।

কিন্তু এমন সময় আসতো, যখন তিনি প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতেন; যখন, যেন অন্য কোনো জগৎ থেকে তিনি ফিরে আসতেন তাদের মধ্যে। অশান্তর ভারি অবাক লাগতো—ব্যাপারটাকে সে তার মনে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারতো না। চিড়িয়াখানার বনমানুষ দূর থেকে যাকে দেখতে মজার অন্ত নেই—সে যদি তার শিকের বাইরে পালিয়ে আসে, যদি তোমার সঙ্গে তোমার মত করে'ই কথা কয়—ভাবো একবার! ভাবো একবার, সে যদি তোমাকে কোলে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করে! কিছুর মধ্যে কিছু নয়—হঠাৎ বাবা খপ্ করে' তাকে ধরে' সজোরে দোলাতে-দোলাতে বলতে লাগলেন:

'When I was that and a very little boy,
With heigh-ho ! the wind and the rain,
All foolish things were but a toy,
And the rain it raineth every day.'

ভয়ে তার হাত-পা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে; পড়ে' যাবার ভয়ে সে একটু নড়তে পারছে না। প্রবল দোলানির মধ্যে এক ফাঁকে সময় করে' নিয়ে সে বললে, 'আমায় নামিয়ে দাও।'

'আগে বল্—When I was that—বল্, আমি যা বলছি।' সম্পূর্ণ পদ্যটা তিনি আবার আবৃত্তি করলেন।

কথাগুলো অশান্ত ভালো করে' বুঝতেই পারে না—বলবে কী ছাই। তবু সুরটা তার ভালো লাগে, তার ইচ্ছে করে ঐ রকম করে' বলতে। নিজের অজান্তেই সে বলে' ফেলে, 'আবার বলো।'

এবং বাবার সঙ্গে-সঙ্গে 'হেই-হো!' বলে'ই হেসে ওঠে।

'হেই-হো!' বাবা তাকে হঠাৎ শূন্যে ছুঁড়ে মারেন, চীৎকার করে' ধুপ্ করে' সে তাঁর কোলের উপর এসে পড়ে। 'আমায় নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও।'

তার কথা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না-করে' বাবা তাকে বগলদাবা করে' উপস্থিত হলেন গিয়ে রান্নাঘরে। 'শোনো, শোনো, তোমার ছেলে কী বলছে। এই, তোর মা-কে শুনিয়ে দে তো!'

কিন্তু অশান্ত বাবার কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় নিচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে' মা-র আঁচল ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আর প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। 'মা, ও মা—'

'আঃ', রান্নায় ব্যাপৃত বাসন্তী বলে' উঠলেন। 'কেন মিছিমিছি ছেলেটাকে জ্বালাতন করছো? ছেড়ে দাও না ওকে।'

'ছাড়বো—ছাড়বো—ছাড়বো—না।' প্রত্যেক কথার সঙ্গে বাবা তাকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। 'বল্ তবে—with heigho-ho! the wind and the rain.'

শরীরটাকে মোচড়াতে-মোচড়াতে অশান্ত আর-একটু হ'লেই বাসন্তীর কাঁধের উপর পড়ে' গিয়েছিলো—বাবা খপ্ করে' তার কোমরের বেল্টটা ধরে' ফেললেন; সেই ক্ষীণ অবলম্বনে শূন্যে ঝুলতে-ঝুলতে মা-র আঁচল ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে উন্মাদভাবে সে কাৎরাতে লাগলো।

'কী যে ছেলেমানষি করছো!' অশান্তর করুণ, ভ্যাবাচাকা চেহারা দেখে বাসন্তী কিন্তু হাসি সামলাতে পারলেন না।

'ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও', বিপন্ন, অসহায়, কাঁদো-কাঁদো, অশান্ত চ্যাঁচাতে লাগলো।

'আগে বল্—heigho-ho! the wind and the rain—'

অশান্তর চোখে জল এসে পড়েছিলো। কান্নায় বিকৃত, হাস্যাস্পদ,

উৎকট স্বরে সে চীৎকার করে' বলে' উঠলো, 'হেঁই-হো।' তার অবস্থা দেখে মা-বাবা হো-হো করে' হেসে উঠলেন।

ছাড়া পেয়ে অশান্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সমস্ত দিনের মধ্যে সে ভয়ে-ভয়ে বাবার ঘরের কাছাকাছিই গেলো না। তবু, সারাদিন তার মনের মধ্যে চলেছে সেই সুরের গুঞ্জরণ; গুন্‌গুন্‌ করে' মাঝে-মাঝে নিজের মনে সে বলেছে—'হে ননি-নো! হে ননি-নো!'

এবং সময়-সময় বাবার প্রতি সে এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতো। ভৌতিক দেহের মত অপরিচয়ের নিরেট দেয়াল ভেদ করে' তা তার মনের মধ্যে, রক্তের মধ্যে। তাকে সে অস্বীকার করতে চাইতো, প্রতিরোধ করতে চাইতো—পারতো না। তাকে সে ঘৃণা করতো; ঘৃণা দিয়েও তাকে দমন করতে পারতো না বলে' নিজের উপর নিষ্ফল-ভাবে ক্রুদ্ধ হ'তো। কঠিন বিমুখতা, প্রবল ভয়, অস্থিগত অবিশ্বাস, কিন্তু সেই সঙ্গে, গভীর অবচেতনায় এই আকর্ষণের ঝিলিমিলি। দূর থেকে বাবাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ কখনো তাঁকে মনে হ'তো শক্তিতে আর রহস্যে মহান; মন কৌতূহলী হ'তো, স্তব্ধ হ'তো তাঁর সমীপবর্ত্তী হ'তে, দীর্ণ করতে নিষ্ক্রিয় মূকত্বকে। শক্তির উৎস সে সন্ধান করবে, উন্মুক্ত করবে সেই রহস্যকে। বইয়ের উপর আনত বাবার মুখ, কপালের উপর চুলের গোছা, দাঁতের ফাঁকে আবদ্ধ মোটা চুরুট—সব মিলে এক সংহত শক্তির চিত্র, যে-শক্তি সব সৃষ্টির মূলে। সব মিলে তার বাবা একটা বিস্ময়; অনেক অজ্ঞাত আলোয় তাঁর মুখ, তাঁর শরীর দীপ্তিময়, অনেক অবোধ্য কথা তাঁর কাঁধের সবল, স্পর্দ্ধিত ভঙ্গিতে। সেই দীপ্তি, সেই স্পর্দ্ধা অপ্রতিরোধ্যভাবে তাকে আকর্ষণ করতো। কিন্তু তা-ই তো সব নয়। মাঝরাতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্থিত সেই বিলাপ...

'বাসন্তী, এত সহজেই তুমি অস্থির হ'য়ে পড়ো কেন ?'

'চুপচাপ থেকেও তো দেখলাম।'

'কী মুস্কিল! তোমাকে বিয়ে করেছি বলে' মাঝে-মাঝে একটু ব্র্যাণ্ডিও খেতে পারবো না!'

'আমাকে যদি এতই কষ্ট দেবে, বিয়ে না-করাই তোমার উচিত ছিলো।'

'তা-ই দেখছি।'

'রাত্তিরে মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফেরা, আপিস থেকে বাড়ি না-এসে সোজা—ছি-ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে, একটু চুপ করতে পারো ?'

'আর কেউ সারা রাতও যদি জেগে থাকে, তো মা র তো ঘুমের কখনো ব্যাঘাত হয় না।'

'কী করবো ? ব্র্যাণ্ডিতে বড় ঘুম পায়।'

'আমার কথা না-হয় ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু শান্ত, মালতী—ওদের কথাও কি তোমার একবার মনে হয় না ?'

'প্রায়ই মনে হয়।'

'কী করে', কী করে' এত টাকা তুমি নষ্ট করতে পারো ?'

'খরচ করবার জন্যই তো টাকা।'

'পয়সা খরচ করে' কেউ অমন বিষ খায়!'

'ঢের লোক খায়। একবার একটু বাইরে গেলেই দেখতে পারো।'

'এ-সব টাকা থাকলে—'

'টাকা! টাকা দিয়ে কী হয় ? টাকা কেউ চিবিয়ে খায় নাকি ?'

'না, তা খায় না। তবে অনেক সময় নিজের মাথা চিবিয়ে খায়।'

(একটা অস্পষ্ট হাসি) 'মেজাজ খারাপ কোরো না, বাসন্তী।'

'উঃ, কোন্ মুখে আবার বাড়ি ফিরে আসো!'

'বাসন্তী, লক্ষ্মী মেয়ে, আর বোকো না।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না।'

'তুমিই তো আমার সঙ্গে কথা বলছো।'

'ও-সব জিনিস খেলে আবার কারো শরীর টেঁকে!'

'কারো শরীরই চিরকাল টিঁকে থাকে না।'

'যে-কোনো রাস্তার লোকের মত—কী নোঙ্‌রা! তোমার নিজের সম্মানেও একটু লাগে না?'

'লাগে না! যেটুকু বাকি থাকে, তোমার কাছে এসে একেবারে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়।'

উঃ, পাথর! পাথর! কার সঙ্গে আমি বকছি!'

'ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম।'

'তোমার কি একবারও মনে হয় না—'

'থাক্, আর কেন? এবার দয়া করে' একটু ঘুমোতে দাও।'...

রুদ্ধশ্বাস, স্তব্ধদেহ, বিছানার সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে আটকানো, অশান্ত উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। পাশ ফেরবার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। খানিক পরে সেই একইভাবে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

নিচু ইজি-চেয়ারের গভীরতা থেকে বাবা মুখ তুলে তাকালেন; তাঁর ভ্রূ জিজ্ঞাসায় কুঞ্চিত হ'লো।

অশান্ত ভয়ে-ভয়ে বললে, 'মা জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি এখন খাবে?'

'উঁ?'

অশান্ত দ্বিতীয়বার তার বার্তা ঘোষণা করলো।

'কী বলছিস ?' বাবা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন।

ভয়ে অশান্তর শরীর শক্ত হ'য়ে গেলো। ধরা গলায় সে আরম্ভ করলে : 'মা বললেন—'

'চুপ !' বাবার তীব্র, ভীতিকর দৃষ্টি সোজা অশান্তর মুখে এসে পড়লো। সাপের দৃষ্টির সামনে হরিণের মত সম্মোহিত, সে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। ভিতরে-ভিতরে তার কান্না পাচ্ছিলো, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়বে না। তারপর বাবার গম্ভীর, ভীষণ মুখ হঠাৎ অসংখ্য হাসির রেখায় ভেঙে গেলো ; তাঁর জমানো, তুষারবদ্ধ চোখ হাসির উষ্ণ দীপ্তিতে উঠলো সজীব হ'য়ে। দু' হাতে অশান্তকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে' তিনি বললেন : 'কী বললেন মা ?'

চুরুটের গন্ধময় বাবার শরীরের মধ্যে বন্দী, অশান্ত অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

'বল্ না!' বাবা তাকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। বল্, তোর নাম কী ?'

দিশেহারা, অশান্ত অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে জবাব দিলে, 'আমার নাম অশান্ত।'

'আর কী ?'

'খোকা।'

'আর ?'

'আর নেই। না—আছে। আমার নাম ছটু।'

'ছটু, ছটু! ছোট মানুষ, ছোট্ট মানুষ !

"কোথা হ'তে আসছো তুমি ছোট্ট মানুষটি,
গল্প যদি বলতে পারো বলো তো একটি।"

ছোট্ট মানুষ, তোমার গল্প বলো, শুনি।'

তার মুখের উপর আনত বাবার মুখের দিকে অশান্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো।

'ছোট্, মানুষ তুমি কোত্থেকে আসছো ?'

অশান্তর মনের মধ্যে একটা প্রত্যাশা জেগে উঠলো। সে আর পালাতে চায় না ; সে চুপ করে' শুনতে চায়।

'বলো, কোত্থেকে আসছো। বলো : আমি সেখান থেকে আসছি, যেখানে বনের অন্ধকারে বাঘের চোখ সবুজ আগুনের মত জ্বলে।'

রোমাঞ্চিত, 'বাঘ !' অশান্ত বলে' উঠলো।

'বাঘ ! বনের অন্ধকারে আগুনের মত বাঘ চলছে—

Tiger ! Tiger ! burning bright
In the forests of the night !'

'Tiger !' আনন্দে হাত-তালি দিয়ে অশান্ত বলে' উঠলো।

'বনের রাত্রি। অন্ধকার চারদিকে মিশকালো। তার মধ্যে সোনালি আর লাল বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'সোনালি বাঘ, লাল বাঘ।'

হঠাৎ বাবা তাকে দু'হাতে ধরে' সামনের টেবিলের উপর তুলে দিলেন। 'বোস্ এখানে।' আসনপিঁড়ি হ'য়ে, তার ছোট হাত দু'খানি কোলের উপর একত্র করে' অশান্ত বসলো।

'চুপটি করে' বোসো তুমি ছোট্ট মানুষটি,
এমন মজা হবে তুমি জন্মে ছাখোনি।'

বাবা মুখে-মুখে তৈরি করলেন।

'মজা হবে, বাবা ?' উত্তেজনায় অশান্তর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো।

'শক্ত করে' চক্ষু বোজো ছোট্ট মানুষটি,
অন্য কোথাও পাবে নাকো মজা এমনটি।'

ভুরু কুঁচকিয়ে অশান্ত এত জোরে চোখ বুজলো যে চোখের পাতার নিচে টাটাতে লাগলো।

একটু পরে বাবা বললেন, 'হাঁ কর্।'

পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে সে মস্ত এক হাঁ করলে। ঝাঁ করে' তার গলার মধ্যে ভীষণ জোরে আগুনের মত কী কতগুলো নেমে এলো, ফেলতে গিয়ে সে প্রবলভাবে কেশে উঠলো—খানিকটা গেলো গলার ভিতর চলে', বাকিটা নাক-মুখ দিয়ে বেয়ে পড়লো। তার গলা, বুক, পেট—সব যেন জ্বলে' গেলো, সমস্ত মুখ উঠলো লাল হ'য়ে—নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে সে মরে আর কি।

চোখের জলের ভিতর দিয়ে দৈত্যের মত হিংস্র, ভয়ঙ্কর, বাবার মূর্ত্তি সে দেখতে পেলো। তাঁর হাতে ছোট একটা গেলাস। ছেলের চোখের উপর চোখ পড়তেই হা-হা করে' তিনি হেসে উঠলেন।

'খাবার সময় হয় না?' বলতে-বলতে বাসন্তী এসে ঘরে ঢুকলেন। তারপর, ছেলের উপর চোখ পড়ামাত্র :

'এ কী! খোকা কাঁদছে কেন? ওকে কী করেছো তুমি?'

'মজা করেছি একটা।'

'কিন্তু ও কাঁদছে কেন?' তাড়াতাড়ি মা তার কাছে সরে' এলেন। দু'কাঁধের উপর তাকে ধরে' জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে রে?'

মা-কে দেখে অশান্তর চোখ দিয়ে আরো বেশি জল পড়তে লাগলো. কোনো কথা সে বলতে পারলে না।

'কী করছো তুমি?' তীব্রস্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর, তার মুখের কাছে মুখ নিতেই তিনি চমকে উঠলেন। 'তুমি কি ওকে কিছু—খাইয়েছো?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা মারাত্মকতা।

'কেমন মজা হ'লো এবার ছোট্ট মানুষটি?
—ছোট্ট আমায় বলছো কেন, ব্যাণ্ডি খেয়েছি।'

অবাধ উচ্চস্বরে বাবা বলে' উঠলেন—বলে'ই দুর্ব্বলভাবে হাসতে আরম্ভ করলেন। বাসন্তীর মুখের চেহারা দেখে অশান্তর ভয় হ'লো, তার মা বুঝি মরে' গেছেন। প্রাণপণে তাঁকে জড়িয়ে ধরে' চীৎকার করে' সে ডেকে উঠলো, 'মা, মা।'

সারারাত সে ভালো করে' ঘুমোতে পারেনি। সন্ধে থেকেই বাড়িতে একটা থমথমে ভাব; সবাই—এত লোকই বা কোত্থেকে এলো?—ফিসফাস করে' কথা বলছে, পা টিপে-টিপে চলাফেরা করছে; বাড়ির আবহাওয়া যেন জমে' গেছে, একটু জোরে কোনো শব্দ হ'লেই তা টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়বে। নিঃশব্দ দ্রুত পদে, অনেকটা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর মত করে' লোকগুলো এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে: সব যেন ছায়া, কেউ সত্যিকারের মানুষ নয়। সন্ধে হ'তেই মা তাকে আর মালতীকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে এনে বিছানায় শুয়ে সেই যে অদৃশ্য হলেন, আর তাঁকে দেখা গেলো না। অশান্ত অনেকক্ষণ চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো: পাশের ঘর থেকে ক্ষীণতম কোনো শব্দ শোনবার জন্য কানকে রাখলো তীক্ষ্ণভাবে সজাগ করে'। কিন্তু কোনো উন্মুক্ত শব্দ নেই; বাড়ি ভোরে শুধু একটা চাপা স্বরের অস্পষ্ট গুঞ্জন: যেন কণ্ঠনালীহীন কেউ কথা বলবার আপ্রাণ চেষ্টায় অবিশ্রান্ত হাঁপাচ্ছে। বারান্দায় আলো জ্বলছে—সেখানে কেউ-না-কেউ নিঃশব্দে আসছে, চলে' যাচ্ছে; ছায়ার পর ছায়া। একটা অনির্ণেয় প্রেত-ভয় অশান্তর বুকের উপর পাথরের মত ভারি। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে ডেকে একটু জল দিয়ে যেতে বলতে পারছে না; একটু জোরে কথা বললেই যেন এতক্ষণ অবরুদ্ধ সব অশুভ স্বর হঠাৎ একসঙ্গে ছাড়া পেয়ে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে' উঠবে।

শেষটায় সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু ঠিক ঘুম নয়—একটা অসম্পূর্ণ তন্দ্রা, যাতে মনের একটা অংশ সর্ব্বদা সজাগ থেকে রাত্রির মন্থর মুহূর্ত্তগুলিকে পাহারা দিচ্ছে। আর, সব সময়—সেই ছায়া আর স্বর-হীন গুঞ্জন, রাত্রির স্তব্ধ, অন্ধকার সত্তার সঙ্গে অভেদ্য। একবার ঘুম ভেঙে সে রাস্তায় একটা মোটর আসবার শব্দ পেলো—একটু পরে সিঁড়িতে, বারান্দায় জুতোর ভারি শব্দ। এতক্ষণে একটা শব্দ, যা কানে শোনা যায়। কিন্তু তা কোনো আশ্বাস আনলে না; বরং প্রতি পদশব্দের সঙ্গে যেন এতক্ষণ বিচ্ছিন্ন বহির্জগত সেই শ্বাসরোধকারী কাচ-মোহের কাছে পরাজিত হ'লো। যে-কোনো, যে-কোনো আশ্রয়ের জন্য সে মালতীকে খুঁজলো। বিছানার নিচের দিকে অনেকদূর গড়িয়ে গিয়ে মালতী অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

ভোরের দিকে অশান্ত সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো। জাগলো যখন, রোদে ঘর ভরে' গেছে। মালতী তখনও ঘুমুচ্ছে। এত বেলা হ'য়ে গেছে, অথচ কেউ তো তাদেরকে ডাকতে এলো না—আশ্চর্য্য। সুন্দর সকালবেলা—আকাশ এত নীল যে দেখলে সত্যিই মনে হয়, ওখানে স্বর্গ আছে। উজ্জ্বল সূর্য্যের নিচে রাত্রির সব গুঞ্জনকারী ছায়া গেছে মিলিয়ে; এতক্ষণে বাড়িটা সত্যি-সত্যি নীরব হ'লো।

বিছানা থেকে নেমে সে গেলো ঘরের বাইরে। কোনোখানে কাউকে দেখা গেলো না; বাড়িটার শরীর তখন হালকা হ'য়ে গেছে—বাতাস নতুন, পরিচ্ছন্ন। পাশের ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠের কাছে সে থমকে দাঁড়ালো। সেখানে বাবা নেই। বিছানা, বালিস—ও-সব কিছুই নেই। কাঠের হাড়-বা'র-করা, শূন্য খাটটা পড়ে' আছে।

ঘরের চারদিকে তাকিয়ে সব জিনিস গ্রহণ করতে তার মিনিট-খানেক সময় লাগলো। তারপর তার চোখ পড়লো, শূন্য মেঝের উপর

মা শুয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে বসে' পড়লো। বালকের হাতের মত মা-র হাত—মণিবন্ধটা একেবারে নগ্ন। না, না—কিছুতেই, কিছুতেই মা-র হাত ও-রকম হ'তে পারে না; তা অসম্ভব—তা ভাবা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না। ঝুঁকে পড়ে' সেই মণিবন্ধের উপর অসহায়ভাবে সে হাত বুলোতে লাগলো; এই নগ্নতার দৃশ্য একটা লৌহ-শলাকার মত তার আত্মায় ঢুকে গেলো।

পরে সে সেই নগ্নতাকে সহ্য করতে শিখেছিলো; ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে শিখেছিলো। বছরের পর দীর্ঘ বছর—বাল্যের, প্রথম যৌবনের সব চেয়ে প্রভাব্য সময়—সেই সাদা হাত তাকে নির্ম্মাণ করেছে; অক্ষয় ঢালের মত তাকে রক্ষা করেছে বহির্জগতের সব শক্তি থেকে। কোনো আশ্চর্য্য, মন্থরবিকাশী ফুলের মত সেই নগ্নতা তার চোখে আর মনে সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছিলো: ফুলের মত নিরাভরণ সেই হাত, ফুলের মত আত্ম-সম্পূর্ণ, জিজ্ঞাসার অতীত, আত্মসমর্পণে অকৃপণ; ফুলের মত একান্ত অনাবৃততায় উজ্জ্বল। সেই হাতের উপর, দিন থেকে দিন, অশান্তর জীবন-চরিত লেখা হ'য়ে গেছে: যে হাত ছিলো মাখনের মত সাদা আর মসৃণ, অনেক ব্যবহারে, কষ্টস্বীকারে তা খসখসে লালচে হ'য়ে গেছে; শুভ্র, নরম চামড়াকে উনুনের আঁচ কুঁকড়ে দিয়েছে, জল দিয়েছে শিটিয়ে। সে-হাতের নিটোল পরিচ্ছন্নতা কাজের বিচিত্র অঙ্কনে ঘেঁটে গেছে; প্রতি সূক্ষ্ম রেখা অশান্তর কোনো স্বাচ্ছন্দ্য, কোনো অতিরিক্ত আরামের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছে। আনন্দের সাদা নিশানের মত তার আত্মার মধ্যে সেই হাত চঞ্চল।…যদি কখনো, যদি কখনো এমন দিন আসে, যখন সে-চঞ্চলতা স্তব্ধ হ'য়ে যাবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের চিন্তায় আবৃত, অশান্ত টের পায় নি, মালতী কখন ঘরে এসে ঢুকেছে, তা'র গলার স্বরে হঠাৎ চম্‌কে উঠলো। তার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা কাঁপুনির মত নেমে গেলো—চোখ যখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে, কেউ চেঁচিয়ে নাম ধরে' ডাকলে যেমন হয়। চিন্তার গোপন গহ্বর থেকে, রীলের পর রীল্, অতীতের অসংলগ্ন, অস্পষ্ট সিনেমাটোগ্রাফ থেকে বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকে ফিরে আসতে তার একটু সময় নিলে। 'চতুরঙ্গ বইখানা কোথায় রেখেছো, দাদা?' বইয়ের শেল্‌ফের কাছে দাঁড়িয়ে মালতী জিজ্ঞেস করছিলো। মালতীর জন্য তার ভালো লাগছিলো; তার এই ছোট, অথচ মোটামুটি আরামের ঘরের জন্য তার ভালো লাগছিলো। এ যেন ডুবতে-ডুবতে মাটি ছোঁবার মত। এত সহজেই তার মন খারাপ হ'য়ে যায়! মনকে শাসন করতে হয়: মানুষের মধ্যে তা'র ইচ্ছা হচ্ছে প্রস্পারোর মত শক্তিময়—সেই ইচ্ছার স্বয়ংতন্ত্র রাজকতায় তাকে রাখতে হয় দাস করে'। সে-রকম কঠিন প্রভু পেলে মন এরিয়েলের মত আদেশ পালন করবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা উন্মুখ হ'য়ে থাকবে; কিন্তু মনের একটা দুর্দ্দমনীয় ঝোঁক আছে ফাঁকি দেবার, বিষাদের নরম কাদার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্যালিবনের মত গড়াগড়ি করবার (ব্রাউনিঙের কবিতা থেকে ছবিটা জ্বলন্ত কুশ্রীতায় তার মনে ফুটে উঠলো; সে-ছবি যদি তার মনের কোনো অবস্থার প্রতীক হয়—ভয়ানক!); তাকে

যদি উৎসাহ দেয়া যায়, আরো গভীরভাবে সে কাদার মধ্যে ডুবে যাবে; শেষটায় সেই আরামের কবর থেকে লেজের ডগা ধরে' তাকে টেনে-হিঁচড়ে বা'র করা—সে-ও এক ঝকমারি হ'তে পারে। তার সাহিত্যিক উৎসাহের ঝোঁকে অশান্ত বিচার করতে ভুলে গেলো, উপমাটা ঠিক খাপ খাচ্ছে কিনা। এবং স্বভাবতই; কারণ কলেজ সে বেশি দিন বেরোয়নি; জীবনের একটা অংশ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে, পরোক্ষভাবে বাঁচবার অভ্যেস তার এখনো হয় নি; এখন পর্য্যন্ত, ইংরেজি কাব্য তার অনেক চিন্তাকে রঙ্ দেয়, গঠন দেয়। অনেক সময়, কোন্টা যে ঠিক তার মনের কথা আর কোন্টা কবিতার প্রতিধ্বনি, তা সে বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না; সে-রকম কোনো ভেদ কর্বার দরকার আছে বলে'ও তার মনে হয় না। স্বাভাবিকমাত্র, উপমার নির্ভুল প্রয়োগের চাইতে যে তার শিল্পগত সৌন্দর্য্যই অশান্তকে বেশি আকর্ষণ করবে। মন পেট উঁচু করে' কাদায় পড়ে' গড়াচ্ছে—আর্টের দিক থেকে এ-ছবি এত সুন্দর যে কোনোরকমেই একে অস্বীকার করা যায় না। আর এ-উপমা যদি সত্যি না হয়…বেশ, সত্যি হওয়াই উচিত ছিলো, অন্তত।

তবু এটা ঠিক যে খানিকক্ষণের জন্য তার মন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিলো: মালতীর গলার স্বর সেই অন্ধকারকে এক ধাক্কা দিলে: আস্তে-আস্তে তা এখন কেটে যাচ্ছে। এখন মনে-মনে হেসে সে বল্‌ছে: 'যা-ই বলো, এ-রকম মন ভার করে' চুপচাপ বসে' থাকা—এ নেহাৎ ছেলেমানুষি।' তখন উপস্থিত মুহূর্ত্তের প্রত্যক্ষতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত, সে নিজেকে, অতীতের ভূতে-পাওয়া নিজেকে অনায়াসে ঠাট্টা করতে পারছে। যেমন শিশুকালে, একা ঘরে বসে' হয়-তো কোনো কারণে সে ভয় পেতো: যে-মুহূর্ত্তে অন্য-কেউ সে-ঘরে এসে ঢুকতো, কী

আরাম, কী স্বাচ্ছন্দ্য! তখন সে তার ভয়কে—বা ভয়ের স্মৃতিকে—মনের আনন্দে উপহাস করতো; এমন ভাণ করতো যেন ভয় সে কখনো পায়ইনি।

ঘর অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো; 'আলোটা জ্বালিয়ে দাও না', মালতীকে সে বল্‌লে।

সুইচ টিপে, 'চতুরঙ্গটা কী হ'লো, দাদা?' মালতী আবার জিজ্ঞেস করলে।

'চতুরঙ্গ! বিমল নিয়ে গেছে।' বলে' সাদা ইলেকট্রিক আলোয় অশান্ত বোনের মুখ পরীক্ষা করলে। কিন্তু কোনো চিহ্ন সেখানে জ্বলে' উঠলো না; মনের কোনো রুদ্ধ আবেগ সেখানে নিশান উড়িয়ে দিলে না। মালতীর মুখে আদৌ যদি কোনো ভাব ফুটে উঠলো, তা হচ্ছে যে-বই সে চেয়েছিলো, তা না-পাবার দরুণ বিরক্তি। নিচু হ'য়ে সে অন্য-কোনো বইয়ের জন্য শেল্‌ফ ঘাঁটতে লাগলো। একটু বিস্মিত, একটু নিরাশ, অশান্ত ভাবলে, বিমল আর মালতীর মধ্যে কি সত্যি কিছু হয়েছে? সে লক্ষ্য করেছিলো, সে আশা করেছিলো। হয়-তো কোনোদিন একটা মীমাংসার, একটা স্থায়িত্বের প্রয়োজন তারা অনুভব করতে পারে? কিন্তু—বাইরে থেকে যেটুকু বোঝা যায়—অশান্ত শুধু আশাই করতে পারে—শেষ পর্য্যন্ত হয়-তো এ-আবিষ্কার করতে যে সে ভুল করেছিলো। মুস্কিল! মালতীর এ ভারি অন্যায়: ওর মনটা—বড় বেশি বাঁকা; ওর সম্বন্ধে জোর করে' কিছুই বলা যায় না, যে-কোনো অনুমান ওর মনের মোড় ঘুরতে-ঘুরতে হারিয়ে যেতে পারে। তাকে এই দ্বিধার অনিশ্চয়তা ভোগ করাবার জন্য মালতীর উপর অশান্তর রাগ হয়; আবার, রাগ হয় বলে' নিজেরই উপর রাগ হয়। এমন সময় আসে, যখন তার মন মালতীর অস্তিত্বেরই প্রতিবাদ

করে : ওর সব দায়িত্ব কেন তাকে মেনে নিতে হবে? নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সদ্য-সচেতন, অশান্তর যুবক-মন এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মালতীকে বহন করবার পক্ষে এত ভারি মনে হয়—এমনভাবে ও তার গলা আঁকড়ে ধরে' আছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ও তাকে আস্তে-আস্তে গলা টিপে মারছে। দায়িত্ব—ঘৃণিত, অসহনীয় কথা! তার কী দায়িত্ব? মালতী আর সে একসঙ্গে শিশু ছিলো; মালতীর চাইতে মোটে দেড় বছরের বড়, কখনো, কোনোভাবে, ওর চাইতে নিজেকে বেশি মনে করবার কারণ তার ঘটেনি। কিন্তু এখন, সেই আঠারো মাসের বয়োজ্যেষ্ঠতার ওজুহাতে (না—তা-ও নয়, সে পুরুষ, এই অপরাধে—কারণ, বয়েসে ছোট হ'লেও এ-সব 'কর্ত্তব্য' তার ঘাড়েই পড়তো) মালতীর সমস্ত ভার পড়েছে তার উপর; এমন কি, মালতীর বিয়ের জন্য তাকেই নাকি পাত্র খুঁজে দিতে হবে। অসহ্য! মালতীর বিয়ে: গেলো চার বছর ধরে' অনির্দ্দিষ্ট অশান্তি মাটির নিচে গোপনে সুড়ঙ্গের মত তার মনে পথ খুঁড়ে যাচ্ছে—এতদিনে স্পষ্ট রূপ নিয়ে তা প্রায় বাইরে প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে; নীরবতার আবরণ ভেদ করে' কত সময় তার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। বেশ তো ছিলো সে, নিজের জীবন নিয়ে পরিতৃপ্ত, তার মধ্যে এ কী উৎপাত! তার পক্ষে অস্বাভাবিক এ-সব গুরুত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে, এমন তো কোনো কথা ছিলো না। তার প্রতি এটা স্থূল অবিচার; তার বয়েস বড় কম। আর, সবার উপর, তাদের এই স্থায়ী অর্থাভাব, টাকার জন্য তাকে পাট আর মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে লীডার লিখতে হওয়া! তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার শিক্ষা, রুচির প্রতি এই অপমান সহ্য করা! টাকা থাকলে—একটা থিওরি-হিসেবে সে বুঝতে পারে—অনেক আগেই মালতীর বিয়ে দেয়া সম্ভব হ'তো।

মেয়ে বিবাহোপযোগী হ'লে অনেকে, সে শুনেছে, যেমন-তেমন করে' অর্থ-সংগ্রহ করে; যে-ভাবে হোক্, কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। কিন্তু ও-সব—ও-সব তার কাজ হ'তে যাবে কেন? ও-সমস্তর সে অনেক উপরে। আইডিয়ার জগতের অধিবাসী, ও-সব জিনিস সে বুঝতে পারে না; কখনো ও-ধরণের কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হ'তে হ'লে বিমুখতায়, বিতৃষ্ণায় তার আত্মা যেন কুঞ্চিত হ'য়ে যায়। কিন্তু সে হচ্ছে গিয়ে বড় ভাই, এবং মালতীর বিয়ে দিতেই হবে। এর পক্ষপাতিত্ব, এর নির্ব্বুদ্ধিতা! যেন সপ্তাহে ছ'দিন সাত ঘণ্টা করে' গ্রেট ইণ্ডিয়া আপিসের বিড়িধূম-কলুষিত আবহাওয়ায় বসে' থাকা যথেষ্ট নয়! যেন নিজের ইচ্ছে মত পয়সা খরচ করতে না-পারা, বই পড়তে না-পারা, আলসেমি করতে না-পারা যথেষ্ট নয়! তা-ও যদি কাগজ থেকে ঠিকমত মাইনে পাওয়া যেতো। দৈনিক সাত ঘণ্টার উপরন্তু—এবং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর—কাজ হচ্ছে ম্যানেজারের কাছ থেকে মাইনে আদায় করা। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের মুখপত্র এই কাগজ; ফেলে-ছড়িয়ে তার কুড়ি হাজার কাটতি; যে-সব লক্ষপতি দেশপ্রেমিক এটা আরম্ভ করেন, কাগজের আয় থেকে তাঁদের ব্যাঙ্ক্-অ্যাকাউন্ট্ নিয়মিতরূপে স্ফীত হচ্ছে না, এ-কথা বিশ্বাস করবার নয় (কারণ তা না-হ'লে অনায়াসে তাঁরা কাগজ তুলে দিতে পারতেন); কিন্তু যাদের জন্য কাগজ চলছে, যারা রাত জেগে দেহের এবং—যা আরো গুরুতর—মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে' ক্লান্তিকর, অর্থহীন সব কাজ করে' তারা কেউ ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ মাইনে পায় না; মাসের পর মাস অংশ বাকি পড়তে-পড়তে চলে; শেষ পর্য্যন্ত, আগেকার প্রাপ্যের আশা ছেড়ে দিতে তারা বাধ্য হয়। কেলেঙ্কারি আর কাকে বলে! অথচ এতৎসত্ত্বেও ছেড়ে দেবার উপায় নেই—ছেড়ে দিয়েই বা কী হবে?

যা টাকা পাওয়া যায়, তা-ই লাভ। ছেড়ে দেয়া নিষ্ফল: এবং কাগজের কর্তৃপক্ষ তা জানেন। জেনে তার সুযোগ নেন। কেলেঙ্কারি! এই কাজ—এবং, তার উপর, যে-জন্য এই কাজের গ্লানি সহ্য করা, ন্যায়ত প্রাপ্য সেই টাকার জন্য রোজ তাগাদা করা—কী করে' মানুষ তা পারে! কিন্তু তা করতেই হয়, তাকেও করতে হয়, না-পারলে সে-জন্য ভুগতে হয়। টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে কোনোরকম আলাপ করতে হ'লে তার আত্মায় রীতিমত যন্ত্রণা হয়, সামান্য টাকার জন্য আধ ঘণ্টা ধরে' দরবার করতে লজ্জায়, অবমাননায় সে মরে' যায়; ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, সে প্রতিজ্ঞা করে, যেমন করে' হোক্, টাকা আদায় করবে, কিন্তু ম্যানেজারের ঘরে ঢুকেই সে ঘাবড়ে যায়, তার সাহসে কুলিয়ে ওঠে না—হয়-তো, যা বলতে এসেছিলো, তা না-বলে'ই বেরিয়ে আসে। এবং মনে-মনে সে বুঝতে পারে যে সে চূড়ান্ত বোকামি করে' এসেছে। সে দুর্ব্বল, সে বোকা—অন্যকে সে তাকে ঠকাতে দেয়; বলতে গেলে, ঠকানো ডেকে আনে—তাকে না-ঠকালেই তার প্রতি অন্যায় করা হবে। তখন তার সমস্ত রাগ পড়ে এসে নিজের উপর, নিজেকে সে নির্ম্মমভাবে চাবুক মারে: এবং নিজের চোখে নিজেকে তার ছোট হ'তে হচ্ছে বলে' তার রাগ প্রতিহত হ'য়ে আবার পড়ে গিয়ে কাগজওয়ালাদের উপর, ম্যানেজারের—এবং যে-সব জিনিসের সে প্রতিনিধি, সেই সবের—উপর, সমস্ত পৃথিবীর, সৃষ্টির উপর। এই অবস্থায়, প্রতি মুহূর্ত্তে অশান্ত অনুভব করে, তাকে মানায় না; এর জন্য সে উদ্দিষ্ট ছিলো না। যদি তার নিজের কিছু টাকা থাকতো! কিন্তু তার বাবা প্রচুর উপার্জ্জন করে'ও খুব বেশি কিছু রেখে যেতে পারেননি; কলেজ থেকে বেরিয়েই সে বাধ্য হয়েছে যে-কোনো একটা কাজে ঢুকে পড়তে। সেটা যথেষ্ট নয়; সংসারে টানাটানি লেগেই রয়েছে।

অভাব তার সহ্য হয় না; তাতে সে অভ্যস্ত নয়। তার বাল্যকাল সচ্ছলতায় কেটেছে; কোনো প্রয়োজন হ'লেই তার পরিপূর্ণতা ঘটে. এটা সে ধরে' নিয়েছিলো; তার ধারণা হয়েছিলো, পৃথিবীর এ-ই নিয়ম। গরিব লোকের কথা সে জানতো; যেমন, ভুগোল থেকে গ্রীনল্যাণ্ড্ নামে দেশের খবর সে পেয়েছিলো। আহা, বেচারাদের বড় কষ্ট, ওদের অবস্থার উন্নতি হওয়া বড় দরকার, কিন্তু যতদিন তা না হয়, কী আর করা। কিন্তু তাই বলে' তার নিজের কোনোরকম অভাব হবে—ভাবা যায় না! যে-টাকায় সে বই কিনতো, তা দিয়ে চাকরের মাইনে দিতে হবে—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না! হিসেব করে'-করে' টাকা খরচ করা—কী অসহ্য, অসহ্যরকম ভাল্‌গার! এর হীনতা বিষের মত: মনের সমস্ত জীবনকে তা মেরে ফেলে। তার কোনো জন্ম-গত পবিত্র অধিকার কেউ যেন পাশবিকভাবে তুচ্ছ করছে, পায়ের নিচে মাড়িয়ে যাচ্ছে। যে-সব জিনিস তার পক্ষে প্রয়োজন, না-হ'লে তার কষ্ট হয়, তা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হওয়া, নিছক শরীর-রক্ষার জন্য যে-সব জিনিস না-হ'লেই তার নয়, তারও জন্য মাঝে-মাঝে উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা—এর অকহনীয় লজ্জা, অবিশ্বাস্য হাস্যকরতা, এর আত্ম-ঘাতী অবমাননা! এবং তার উপর, এ-সবের উপর মালতী, মালতীর বিয়ে।

বিমল তাদের কাগজের নিউজ্-এডিটর; বয়েসে অশান্তর বছর পাঁচেকের বড়। গ্রেট ইণ্ডিয়ার সূত্রপাত থেকে সে ও-কাগজে আছে। অত্যন্ত কর্ম্মক্ষম, তার নিজের শান্ত ধরণে। খুব চালাক নয়; আস্তে আস্তে কথা বলে, একদিকে ঘাড় কাৎ করে' অস্বস্তিকর মনোযোগ দিয়ে অন্যের কথা শোনে। তার চোখের দৃষ্টির, সমস্ত শরীরের ভঙ্গির একান্ত স্থৈর্য্য, গম্ভীর উন্মুখতা অনেকটা বন্য পশুর মত; পিছনে, অস্পষ্ট-অনুভাব্য তার গোপন শক্তির উৎস। প্রথম যেদিন অশান্ত তার

আপিসে যায়, বহির্জীবনে অনভ্যস্ত, সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিলো। যে-কোনো রকমের প্রকাশ্যতায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়া তার স্বভাব; সে বেড়ে উঠেছে অনেকটা কাচের বাড়িতে বিদেশী ফুলের মত, মনোলোকের কায়াহীনতার মধ্যে, নিজের সত্তার পরিপূর্ণ, মুক্তা-উজ্জ্বল নির্জ্জনতায়। খবরের কাগজের অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা, অবাধ প্রকাশ্যতা, সম্মিলিত মানবতার গন্ধ তার স্নায়ুগুলোকে বিশ্রীরকম পীড়িত করে' তুলতো; এখন পর্য্যন্ত, এক বছর কাজ করবার পরও ঐ আবহাওয়ায় নিজেকে সে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। আর প্রথম দিন তার মনে হয়েছিলো, সে যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। এত লোকের মধ্যে সে—সে কোথায়? এমন কি, তার টেবিলে পর্য্যন্ত একজন অংশীদার; যে-ভদ্রলোক আদালতের রিপোর্ট এডিট্ করেন, তাঁর জায়গা, বিস্ময়ের ঘা খেয়ে সে আবিষ্কার করলো, তারই পাশে। ভদ্রলোকের মুখে অশ্লীল কথা লেগেই রয়েছে; সর্ব্বদা পান চিবোচ্ছেন আর বড়-বড় লাল দাঁত বার করে' হাসছেন। ভদ্রলোকের দিকে না-তাকাতে অশান্ত আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু মনের অশোধনীয় বিরূপতার ফলে তার চোখ বার-বার সেই দিকেই গিয়ে পড়ছিলো। কাঠের পার্টিশন-দেয়া পার্শ্ববর্ত্তী খুপ্রিগুলো থেকে অনেক উচ্চস্বর শোনা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তে কাজের ওজুহাতে আড্ডা দিতে এবং অকপটে আড্ডা দিতে নানারকম সব লোক আসছে, বেয়ারাগুলো ছুটোছুটি করতে-করতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, ঘন-ঘন টেলিফোন বাজছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই অশান্ত রীতিমত ঘেমে উঠলো। সে ঠিক করে' ফেললো, এ-কাজ তার পোষাবে না। কাল আর সে এ-জায়গায় আসবে না, এ-কথা ভাবতেই এমন মধুর আরামে তার মন ভরে' গেলো, যা এর আগে সে কখনো অনুভব করেনি। এতক্ষণে, ওদের মধ্যে তার স্থান

নয়। এই চেতনায় শক্তিমান, চোখ তুলে ঘরের আর সবার দিকে সে তাকাতে পারলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যে ভদ্রলোক কথা বলছেন, তাঁকে সে কোথায় যেন দেখেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে সে মনে করবার চেষ্টা করলো। অবিশ্যি বিমলকে সে তার আগে কখনো ছাখেনি। কিন্তু মাঝে-মাঝে ও-রকম হয়; এ-রকম লোক পাওয়া যায়, যাকে প্রথমবার দেখামাত্রই চেনা মনে হয়। বিমলের চওড়া, ভারি শরীরের মন্থর গতিবিধি অশান্তকে যেন কী-রকম আশ্বাস দিয়েছিলো; বিমলকে তার দিকে আসতে দেখে সেই শ্বাসরোধকারী অপরিচিতত্বের মধ্যেও নিজেকে তার নিরাপদ মনে হ'লো। ঐ লোকটি, অন্তত, বুঝবে।

অশান্তর কাছে এসে, 'আপনি আমাদের নতুন সব্-এডিটর?' তার মন্থর, স্পষ্ট উচ্চারণে বিমল জিজ্ঞেস করলে।

অশান্ত মাথা নাড়লে।

'আমাদের পলিটিক্ল্ প্যারাগ্রাফ যিনি লেখেন, তিনি এইমাত্র খবর পাঠিয়েছেন যে আজ তিনি আসতে পারবেন না। আপনার পক্ষে কি অস্ট্রেলিয়ান ইলেক্শনের উপর একটা প্যারাগ্রাফ লেখা সম্ভব হবে?'

'অস্ট্রেলিয়ান ইলেক্শন!' অশান্ত প্রায় চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিলো। স্তম্ভিত, সকৌতুক, 'কিন্তু ও-বিষয়ে আমি যে কিছুই জানিনে', সে ব'লে উঠলো।

'জানবার কিছু নেইও। কাগজগুলো পড়েন তো?'

'সত্যি বলতে—না। অন্তত রোজ নয়, এবং সবটা নয়।' 'ময়রার ছেলে কি সন্দেশ খায়?' সে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিলো; কিন্তু একটু ভেবে এই অসাময়িক এবং বেমানান রসিকতা করবার লোভ সামলে নিলে।

'আপনাকে গেলো চারদিনের কাগজ লাল পেন্সিলে দাগিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঐটুকু পড়লেই—'

'কিন্তু অশান্ত বাধা দিলে, 'মিছিমিছি আপনি কষ্ট করবেন—

'কষ্ট কিছু নয়। আমি এক্ষুনি—'

'কিন্তু আমি যে এ-কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

একটু সময়, বিমল কথা না-বলে' তাকিয়ে রইলো। অশান্তর চোখে হাসির ঝল্‌সানি, উদ্দামতার আলেয়া-আলো। 'কেন ছেড়ে দিচ্ছেন ?' বিমলের প্রশ্নে কোনো কৌতূহল ছিলো না।

'পারবো না।'

'চেষ্টা না-করে'ই কী করে' বুঝলেন, পারবেন না ?'

'আমি জানি, কী আমি পারিনে।'

'কিন্তু এ-কাজ যে সবাই পারে।' গম্ভীরভাবে, এমন কি, একটু ব্যাকুলভাবে বিমল বলে' উঠলো। 'সবাই পারে', সে আবার বললে, 'যে-কোনো লোক পারে।'

'তা-ই দেখছি', অশান্ত তার চারদিকে তাকালো।

কিন্তু বিমল এই ইঙ্গিত ধরতে পারলো না। 'প্রথম এসে', সে তার অভিজ্ঞ. পক্ক ধরণে বলে' চললো, 'অনেকেই ভয় পায়। অনেকেই ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু আসলে', স্বভাবতই নিম্ন তার স্বর আরো মৃদু হ'য়ে এলো, 'সোজা কাজ। খুব সোজা। যে-কোনো কাজের চেয়ে সোজা।' আর কথা বলবার ধরণ কোনো নিপুণ ব্যবসায়ীর মত; কোমল, অলক্ষিত-ভাবে শ্রোতার মনে তা পথ করে' নেয়, কখনো জোর করে না। 'শুধু, যেখানে যা-কিছু হচ্ছে, সব সময় ইন্ টচ্ থাকতে হয়—আর, circumcution জানা অবিশ্যি দরকার।'

'দুটোই ভয়ানক শক্ত। আমার পক্ষে অন্তত।'

'আপনি তা-ই মনে করছেন।'

এবার অশান্ত হেসে ফেললো।—'না, দেখুন; অস্ট্রেলিয়ার ইলেক্‌শন আর ক্যানাডার কাল্‌চার—এ-সব জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। রিজাইন করতে হ'লে কী করতে হয়?'

বিমলেরও চোখের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। 'যে-বিষয়ে কিছুমাত্র ইণ্টরেস্ট নেই, তা নিয়ে লিখতে পারাই তো জ্যর্নালিস্টের লক্ষণ।'

'সেই দুঃখেই তো জ্যর্নালিস্ট হ'লাম না।'

'কিন্তু আপনি হবেন, এখনো হবেন।' বিমল যাবার একটা ভঙ্গি করলে, 'অস্ট্রেলিয়ার ইলেক্‌শন দিয়েই আরম্ভ করা যাক্‌। আপনাকে শুধু কাল আর পরশুর ফাইল পাঠিয়ে দিচ্ছি; তা থেকে আপনি যেটুকু জানবেন, ভারতবর্ষে কেউ তার বেশি জানে না। তারপর—circumlocution।' 'Circumlocution', একটুখানি গিয়ে হঠাৎ থেমে সে আবার বললে। 'এত বড় একটা কাগজের জায়গা ভরানো চাই তো।'

অশান্ত মনে করতে পারতো, বিমল ঠাট্টা করছে; কিন্তু তার মুখ, মুখ একটু নিচু করে' চলবার ভঙ্গি দেখে কিছুতেই তা বিশ্বাস করা যায় না। এবং শেষ পর্য্যন্ত, অস্ট্রেলিয়ার ইলেক্‌শন নিয়ে অশান্ত প্যারাগ্রাফ লিখে ফেললো। আর, পরের দিন ঠিক সময়ে আপিসে এসে উপস্থিত হ'লো।

বিমলের সঙ্গে দেখা হ'তে, 'আপনি আমাদেরকে ছাড়ছেন না, তাহ'লে?' সে বললে।

অশান্ত বললে, 'On second thoughts'।

'Second thoughts are better'.

'But first thoughts are sweet'. তারপর, একটু চুপ থেকে: 'আজকে কী? মেক্সিকোর মোর‍্যালিটি?'

'যা-ই বলুন, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা এমন-কিছু তুচ্ছ নয়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সেকণ্ড্ লীডার দিয়েছে।'

'কিন্তু আমার তাতে কী? অস্ট্রেলিয়া যদি আজ লোপ পেয়ে যায়, তাতেই বা আমার কী এসে যাবে?'

'যাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, তা নিয়ে মাথা-ঘামানো—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সেটাই তো গৌরব। নিউটনের কথা ভাবুন। আপেল কেন মাটিতে পড়ে, তাতে তাঁর কী এসে যেতো?'

'বাহ্! নিউটনের জন্য কষ্ট হচ্ছে।'

'কিন্তু কথাটা সত্যি—অন্তত এর spiritটা সত্যি। ভেবে দেখুন।'

'দেখেছি। কিন্তু তফাৎ আছে যে—অসীম তফাৎ। জাপানের বাণিজ্য আর প্রকৃতির মূল রহস্যে তফাৎ আছে; ক্যালিফর্নিয়ার ডিভোর্স-আইন আর শেক্‌স্‌পিয়রের কাব্যে তফাৎ আছে।'

'তবু—মানুষ যতক্ষণ নিছক তার ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে কোনো জিনিসে উৎসাহ নেয়, তা-ই ভালো। তা যদি space-এর জ্যামিতি হয়, ওথেলো আর হ্যামলেট হয়, তাহ'লে ভালো; আর তা যদি গ্রিটা গার্বো কি ডাকটিকিট, ক্রিকেট কি দাবা হয়, তবু ভালো; এমন কি, যদি বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণ্য কি চা-পানের সর্ব্বনেশে অপকারিতাও হয়, তা হ'লেও মন্দ নয়। বিষয়ে-বিষয়ে তফাৎ থাকতে বাধ্য, কারণ মানুষে-মানুষে তফাৎ আছে।'

'ঠিক', একটু ভেবে অশান্ত সায় দিলে।

খবরের কাগজের আপিসে বেশি কাজ নেই, অথচ পুরো সময়টা থাকতে হয়—এবং সেটাই সব চেয়ে অসহ্য। সব-এডিটররা টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য আলোচনা করে; ঘণ্টায় একবার করে' ভাঙা পেয়ালা

ওকে বার্লির মত চা খায়। (বিনি পয়সায় যে-জিনিস পাওয়া যায়, তার ভালো-মন্দ বিচার করা বাঙালি জাতির সাধারণ স্বভাব নয়: সেই চা গলাধঃকরণ করবার শাস্তি থেকে আত্ম-রক্ষা করবার জন্য অশান্তকে ঘোষণা করতে হয়েছিলো যে সে চা খায় না।) রকমারি লোক আসে: বড়-চুল-ওলা কোনো পেশাদার 'কম্যুনিস্‌ট্‌', যে—অশান্ত তার নিজের কথা থেকেই সংগ্রহ করেছিলো—সকাল থেকে রাত দশটা অবধি বিভিন্ন কাগজের আপিসে ও বন্ধুদের সাহচর্য্যে, এবং রাত দশটা থেকে সকাল অবধি কোনো সস্তা গণিকালয়ে যাপন করে (অনুমান করতে হয়, পরাশ্রয়বৃত্তি, মদ্যাসক্তি ও লাম্পট্য হচ্ছে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর প্রথম শিক্ষা); কোনো পেশাদার সাহিত্য-সেবক বা সাহিত্যিক-সেবক, সিল্ক-আবৃত নধর, মসৃণ কান্তি, সুগোল গালে মোক্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধের মত ক্ষীণ, অপরূপ হাসি, যার জীবনের কাজ হচ্ছে সহরের সব ক'টা সাহিত্যিক আড্ডায় উপস্থিত থেকে, কে কার সম্বন্ধে কী রসালো উক্তি করেছে, তা সংগ্রহ ও রটনা করা; না-হয় কোনো দু'-বার জেল-খাটা হিস্‌টিরিক্‌ল্‌ দেশপ্রেমিক—'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই', এই হচ্ছে যার মন্ত্র, এবং যে তার রোগা শরীরের পক্ষে আশ্চর্য্যরকম তারস্বরে ইংরেজ-উচ্ছেদ-মূলক এমন-সব ভয়ানক কথা বলতে থাকে, যা শুনতেও গা ছম্‌ছম্‌ করে, এবং যাকে দেখলে আমাদের পরাধীনতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, অনিবার্য্য, অনপনেয় মনে হয়। কাজের চাপে সময় কেটে গেলে একরকম হ'তো, কিন্তু এত অবসর বলে'ই এত যন্ত্রণা। এত হট্টগোল, মন দিয়ে একটা বই পড়াও যায় না। সুশৃঙ্খল, নিয়মিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, বাঙালি আপিসের এই বিশৃঙ্খলা অশান্তর মনে ব্যক্তিগত অপমানের মত লাগে। কী অপব্যয়, সময়ের, উৎসাহের কী ভয়ঙ্কর অপব্যয়! আর এই-সব লোক!—সত্যি বলতে, অশান্তর গা-ঘিন্‌ঘিন্‌ করে।

পরস্পর

একদিন, সন্ধের দিকে, ঘরের বিড়িধূমাঙ্কিত আবহাওয়ায় আড্ডা চলছে, বিনা কাজে চুপচাপ বসে' অশান্ত ভাবছিলো, কোনো অছিলায় বাড়ি চলে' যাবে কিনা, বিমল এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কী রকম ?'

'Stuffy !' চোখ দিয়ে হেসে অশান্ত জবাব দিলে, 'It stinks'.

'মন্দ কী—মুখ-বদ্‌লানো হিসেবে ?'

অশান্ত মাথা নাড়লে।—'আমাকে বোধ হয় আর শোধ্‌রানো গেলো না।'

'কিন্তু আপনিই বা এত লাজুক কেন ?'

'লাজুক ? মোটেও নয়। আমি এখানে মানাই না—এই যা। একেবারেই নয়। 'বোধ হয় আমারি দোষ।'

'কেন আপনি নিজের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে থাকবেন ?' বিমল প্রশ্ন করলে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে কোনো দোষারোপ ছিলো না। 'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন।'

'দেখছি। শুধু একটা ইচ্ছা হয়—দৃষ্টিশক্তি যদি না থাকতো।'

'আপনি তাহ'লে জীবনকেই অস্বীকার করতে চান ?'

'জীবন !' অশান্ত প্রায় চেঁচিয়ে হেসে উঠলো।

'একটা অংশ তো নিশ্চয়ই।'

'আমার জীবনের নয়।'

'যা-ই বলুন, আপনি নিজেকে একটা জিনিস থেকে বঞ্চিত করছেন।

'মূল্যবান কোনো জিনিস ?'

'কী করে' জানেন, নয় ? সব অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে।'

'এবং একজন যে-অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারে, তার সীমা আছে। জীবন সংক্ষিপ্ত ; অভিজ্ঞতা বহু ও বিচিত্র। মানুষের শরীরের ও মনের—এবং একটা মানেই আর-একটা—যত রকম অভিজ্ঞতা সম্ভব,

সব এক জীবনে অর্জ্জন করতে হ'লে অসুরের দেহ ও দেবতার আত্মা নিয়ে হাজার বছর বাঁচতে হয়। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতার খাতিরে নিজের প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা যায় না।'

'অত্যাচারের ভয়ে কুনো হ'য়ে, অসম্পূর্ণ হ'য়ে থাকাও সম্ভব। Palace of Art.'

'কিন্তু গায়ের জোরে কি অভিজ্ঞতা হয়? অভিজ্ঞতার জন্য কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়বার কি দরকার? বেঁচে-থাকা—সচেতনভাবে বেঁচে-থাকাই তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।'

'অনেক সময় অতিরিক্ত আর্ট-প্রীতি জীবনের প্রতি আমাদেরকে অন্ধ করে' দিতে পারে।'

'কিন্তু আমার বেলায় তা খাটছে না। আমি অন্ধ নই—আমি জানি।'

'খানিকটা অন্ধ বইকি—ইচ্ছে করে' অন্ধ। চোখ খুলে আপনি তাকাবেনই না।'

'অভিরুচিতে অন্ধ, বলতে পারেন। তাকাতে আমি চাই না। কারণ তো আগেই বললুম।'

'কিন্তু তা-ই বা হবে কেন? "এই দুনিয়ার সকল ভালো, আসল ভালো, নকল ভালো—"'

'ও হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের কথা।'

'এবং জীবন-বিলাসীর কথা।'

'স্বীকার করবো, জীবন-সম্বন্ধে অতটা পেটুকপনা আমার নেই।'

'কিন্তু এ কি এক ধরণের অসম্পূর্ণতা নয়?'

'যদি অসম্পূর্ণতা হয়, তাহ'লে তা-ই। কিন্তু আমি যা, আমি তা না-হ'য়ে পারিনে।'

পরস্পর

বিমলের সঙ্গে কথা বলে', নিজের বিশ্বাসের জোরে তার সঙ্গে তর্ক চালালেও, অশান্তর অদ্ভুত একটা অনুভব হ'তো : বিমল যেন অত্যন্ত বাস্তব, তার পা শক্ত মাটির উপর, এবং সেই তুলনায় অশান্ত হাওয়ার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। বিমলের প্রত্যুত্তরে কথার জন্য তার আটকাতো না (সে-বিষয়ে, বরং, সে-ই সাধারণত সুবিধে করতে পারতো), কিন্তু বিমল যেন তার শরীরের নিষ্ক্রিয় ভঙ্গি দিয়েই মূকভাবে সে-সব কথা প্রত্যাখ্যান করতো। না, প্রত্যাখ্যান করতো না, তার কথা সব মেনে নিয়ে, কথার উৎস তার যে-ব্যক্তিত্ব, সেখানে একটা বর্থ্যতার চেতনা এনে দিতো : এমন মনে হ'তো, যেন বিমল তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে আছে। তার থাকাটা যেন শুধু আংশিক, সবিরাম, অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তিতায় টুকরো-টুকরো আলোর ঝল্‌সানির মত ; যেখানে বিমলেরটা হচ্ছে দৃঢ়, গভীর মূলবিস্তারী, নিরবচ্ছিন্ন। কেউ জিজ্ঞেস করলে এরকম মনে হ'বার অশান্ত কোনো কারণ দিতে পারতো না ; শুধু তার সত্তার কেন্দ্রস্থলে এটা অনুভব করতো। এবং এতে তার আত্ম-ধৃতি আঁহত হ'তো ; তার নিজের অখণ্ডতা যেন আর বজায় থাকতো না ; ভেঙে পড়বার দিকে ঝুঁকতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও—সেই কারণেই, বোধ হয়—বিমলের প্রতি সে দিন-দিন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তে লাগলো : তার ভারি শরীর আর মন্থর ধরণ-ধারণ নিয়ে লোকটি এত অদ্ভুত ; অদ্ভুতভাবে সে মনকে টানে। এমন নয় যে গোড়ায় প্রকৃতি-বৈপরীত্য-জনিত একটু বিরোধ-ভাব না ছিলো ; কিন্তু বিমল তাকে বুঝতো, বিমলকে সে বিশ্বাস করতে পারতো। এবং বিমলের সংস্পর্শে নিজেকে তার একটু নতুন মনে হ'তো ; তার শক্তিভঙ্গকারী, নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ-উদ্দীপক উপস্থিতিকে একভাবে সে কামনা করতো, উপভোগ করতো। ক্রমে দু'জনের মধ্যে একটা মূক, চাপা সহানুভূতি জন্মালো ;

কথা বলতে গেলেই মতদ্বৈধ হ'তো, কিন্তু সত্যিকারের তর্ক কখনো হ'তো না; দু'জন দু'দিক থেকে একটা জিনিসকে আক্রমণ করে' যেতো, একজনের কথা আর-একজনের প্রতিবাদ হ'তো না, হ'তো পরিপূরণ। আর, পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত, সেই গোপন, অথচ স্পষ্ট-অনুভাব্য সহানুভূতির স্রোত। আপিসে একটু সুযোগ পেলেই তারা যে-কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বন করে' কথা ফেঁদে বসতো। কিন্তু বেশি সুযোগ হ'তো না; কারণ বিমলের কাজ ছিলো দিনের বেলায়, সন্ধে সাতটার পর সে আপিসে বড় একটা থাকতো না। শেষে এমন সময় এলো, যখন বিমলকে একদিন অশান্তর বাড়িতে চায়ে না-বললেই নয়। নিমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হ'লো; সেদিন আপিসের পারিপর্শ্বিকের বাইরে প্রথমবার পরস্পরকে পেয়ে দু'জনেই একটু বিস্ময় অনুভব করলো; প্রথমবার, তারা পরস্পরের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অর্থে, সাংসরিক অর্থে কৌতূহলী হ'লো। নিমন্ত্রণের ঘন-ঘন পুনরাবৃত্তি হ'তে লাগলো, তারপর আর নিমন্ত্রণের প্রয়োজনই রইলো না। সহানুভূতি বন্ধুতায় বিকাশ লাভ করলো, কিন্তু সে-রকম অন্তরঙ্গ, সে-রকম বিনিময়-উন্মুখ, উত্তপ্ত অন্তরঙ্গতা নয়। তারা বাবু ও আপনি বলা ছেড়ে দিলে, কিন্তু মাঝখানে দূরত্ব রয়ে'ই গেলো। তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা বেশিদূর এগোলো না। সেই সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, সূক্ষ্মগতি সহানুভূতির স্রোত—তা-ই রইলো তাদের মধ্যে শেষ বন্ধন। এখনো তাদের বেশির ভাগ আলাপ চিন্তারাজ্যের। এখনো দুই ক্ষুধিত পাখির মত তারা কোনো প্রশ্নের দু'দিক ঠোকরাতে থাকে, যতক্ষণ না শাঁস বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এমন অবস্থা নয় যে অশান্ত আভাসে কি স্পষ্টভাবে মালতী সম্বন্ধে বিমলকে কোনো প্রশ্ন করতে পারে। অথচ অশান্তর নির্ভুলভাবে মনে হয়েছিলো… কী যে করছে ওরা! হাত-পা ছেড়ে সময় কেটে যেতে দিচ্ছে বোধ হয়?

বিমল কি মালতী কারো ভাবভঙ্গি দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু কেন, কেন এই দ্বিধা, যদি তাদের মনেই হয় যে··· ? অন্যান্য ব্যাপারে এত প্রয়োগ-নিপুণ, বিমলের কর্ম্মক্ষমতা এ-ক্ষেত্রেই লোপ পেয়ে গেলো নাকি? ভাবী স্বামী হিসেবে, সত্যি কথা, বিমলকে ঠিক কল্পনা করা যায় না। শান্ত, সহিষ্ণু তার ধরণে কতদিনে সে মন ঠিক করতে পারবে? আদৌ কখনো করবে কি? মালতীর অন্তত বোঝা উচিত; একদিন অশান্ত বাধ্য হ'য়ে মালতীকেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে' ফেলবে।

যেন তার মনের কথা টের পেয়ে, তার চিন্তার প্রতিধ্বনি করে' মালতী জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে কিছু বলবে, দাদা?' একখানা বই বেছে নিয়ে, ঘর থেকে চলে' যাবার আগে সে অপেক্ষা করছিলো; নীরব, আত্ম-মগ্ন অশান্তকে লক্ষ্য করছিলো চোখের কোণ থেকে। দাদার মুখের একটু ক্লিষ্ট, একটু ধাঁধাঁ-লাগা ভাব থেকে সে বুঝতে পারছিলো, কোনো বস্তুর, সাংসারিকভাবে সন্নিকট কোনো সমস্যার সঙ্গে সে সংগ্রাম করছে। এমন-কোনো জিনিস, যার প্রকৃতি, যার সম্মুখীন হবার রীতিই সে বুঝে উঠতে পারে না। বেচারা দাদা—মনে-মনে একটু হেসে সে ভাবলে—কেনই বা সে ইচ্ছে করে' অসুখী হ'তে যায়? যা হবার হবে, এই মনে করে' কেন সে শান্তিতে থাকতে পারে না? কারণ, এমন নয় যে হাজার চিন্তা-ভাবনা করে'ও কোনো-কিছুকে একটু এগিয়ে দেবার ক্ষমতা তার আছে। এ-সব বিষয়ে তার অক্ষমতা, তার নিষ্ফলতা জন্ম-গত—এবং তার তা জানা উচিত। যতদিনের কথা মালতী মনে করতে পারে, সে আন্তরিকভাবে দাদাকে অ্যাডমায়ার করেছে: তার চাতুর্য্য, যে-কোনো জিনিস শিখতে তার অনায়াস দ্রুততা, দু'বার পড়ে' আগাগোড়া একটা পদ্য আবৃত্তি করবার

ক্ষমতা—এ-সব জিনিসের জন্য শিশুকালে সে অশান্তকে অগাধ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। নিজে সে লেখাপড়ায় তুখোড় ছিলো না; তার কথা উঠলেই বাবা 'তোমার বোকা মেয়ে' বলে' তাকে উল্লেখ করতেন; এবং কোনো-কোনো বিষয়ে একটু বোকাই সে ছিলো। মুখে-মুখে বাঙলা থেকে ইংরিজি তর্জ্জমা করতে হ'লে তার মাথা গুলিয়ে যেতো; মেঘনাদ বধের শক্ত-শক্ত কথাগুলোর মানে প্রায়ই সে গোলমাল করে' ফেলতো। আর ও-সব ব্যাপারে অশান্তর ছিলো রাজত্ব; তার চোখ-মুখ দিয়ে যেন আলোর চকমকি ছুটতো। মালতীর রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে যেতো; মুগ্ধ, স্তম্ভিত, অশান্তর গৌরবে নিজের অস্তিত্ব সে ভুলে থাকতো। ছেলেমানষি বিস্ময়-বর্জ্জিত, সেই অ্যাড্‌মিরেশন এখনো তার আছে। কিন্তু এখন, কতগুলো বিষয়ে, সে তার মেয়ে-মনের প্রবৃত্তিগত গভীর জ্ঞানে অশান্তর অনেক উপরে; অশান্ত সেখানে একেবারে আনাড়ি, সে-সব নিয়ে তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখলে হাসি পায়, করুণা হয়। তার মেয়েলি আত্মস্থতা, পারিপাট্য, অশিক্ষিত, শিক্ষা-অতীত বোধশক্তির কাছে অশান্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না—তাকে এমন এলোমেলো, এমন হারানো মনে হয়। এখন, ক্লিষ্ট, অসুখী মুখে কী ভাবছে সে? তার কথা? বিমলের? বোধ হয়। অশান্তর মনে বিমলের সঙ্গে সে জড়িয়ে গেছে, মালতীর তা বুঝতে বাকি ছিলো না। কিন্তু কেন? সে, যা সে আছে, তা-ই কি যথেষ্ট নয়? এটা তার প্রতি একটা—হ্যাঁ, একটা অপমান বই কি। সে যা আছে, সে তা-ই; তা-ই থাকতে চায়, অন্য কারো সঙ্গে মিশ্রিত হ'তে চায় না। 'ও-সব ঝঞ্ঝাট' বলতে যা-কিছু বোঝায়, মালতীর মনে তা অপ্রীতিকর, অরুচিকর। কেউ এসে তাকে দখল করবে, এ-চিন্তা সে সহ্য করতে পারে না। আর, কোনো শারীরিক সংস্পর্শ সম্বন্ধে তার মনের ভাব অনেকটা

বিতৃষ্ণা-মেশানো আতঙ্কের মত : তার শরীর নিয়ে কেউ খেলা করবে—না, না, কোনোরকমেই নয়। সে মুক্ত থাকতে চায়, পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়। কারো ভালোবাসার খোঁয়াড়ে পিচ্ছিল সেন্টিমেণ্ট্যালিটির নরম কাদায় সে গড়াগড়ি যেতে পারবে না। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে, ভালোবাসা কথাটা সে সব সময় কোটেশন-মার্কার মধ্যে ভাবতো ; ওটা যেন কারো মুখ থেকে শোনা কথা, অন্য-কোনো জিনিস-জ্ঞাপক একটা ইউফেমিজম্, যেন ও-জিনিসের সত্যি-সত্যি অস্তিত্ব নেই। বিমলের আর তার মধ্যে আর যা-ই থাক, 'ভালোবাসা' নেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অথচ তাদের ছ'জনের মধ্যে যে একটা অনুরাগ গড়ে' উঠেছে, তা তো যে-কেউ বুঝতে পারে। পারুক ; সেটা গোপন করবার জন্য সে ব্যস্ত নয় ; কিন্তু তাই বলে' খামকা সব অনুমান কি করতেই হবে? বাড়ির হাওয়ায় সে সেটা টের পায় ; দাদার মুখে, এমন কি, মা-র মুখেও, দেখতে পায়। আর, ভিতরে-ভিতরে সে জ্বলে' ওঠে। কী অন্যায়, কী অন্যায়! শেষটায় এরা এমন করে' তুলবে যে বিমলকে বিয়ে না-করলে তার সম্মান থাকবে না। কিন্তু কেন, কেন? গোপন বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত, বার-বার সে প্রশ্ন করে, কেন? কেন? বিমলও তো কখনো এ-রকম কোনো ইঙ্গিত দেয়নি : শুধু তার চোখে মাঝে-মাঝে একটা নীরব, অস্পষ্ট আবেদন ফুটে উঠেছে ; তার শান্ত উপস্থিতি থেকে নিঃসৃত একটা রহস্যময় শক্তি যেন মালতীকে আবৃত করবার চেষ্টা করেছে। মাঝে-মাঝে, একটা প্রবল আকর্ষণ আঘাতের মত তার মনে এসে লাগতো। সেই আকর্ষণকে বোঝবার চেষ্টা করলে হয়-তো—কিন্তু মালতী তা বোঝবার চেষ্টা করেনি ; তাকে অস্বীকার করেছে, অবজ্ঞা করেছে। ছ'জনের মাঝখানে যে মূলগত দূরত্ব, তার উপর কোনো আক্রমণ সে হ'তে দেয়নি। ধন্য সেই দূরত্ব, যার জন্য নিজের

মধ্যে সে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে পারছে। সেই দূরত্বের অপসারণ, ভেঙে আর একজনের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়া—না, না, না। সহস্রবার না। এত সহজ এ-কথা, অথচ দাদা কেন তা বুঝতে পারে না? দাদা কেন তার নিজের সুবিধে মত মন-গড়া জিনিস ভাবছে? কারণ, অস্পষ্টভাবে এবং থিওরি-হিসেবে, অশান্ত বোঝে যে মালতীর এখন বিয়ে হওয়া দরকার। এবং থিওরি-হিসেবে ও অস্পষ্ট-ভাবে, মালতীও জানে যে কোনো-একদিন তাকে বিয়ে করতে হবে—হয়-তো। কিন্তু এখনই তার কী হয়েছে—তার যথেষ্ট সময় রয়েছে। ছেলেমানুষ দাদা—যা নিয়ে ভাবা উচিত মনে করবে, তা ভাববেই: চিন্তায় পর্য্যন্ত তার কর্ত্তব্যপরায়ণতা। মালতীকে সে তার নিজের মনে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে না, কেননা, তার যে উচিত…কী আশ্চর্য্য! আর, কী হাস্যকর! মুখে ও কখনো কিছু বলবে না—এক-এক সময় রীতিমত বিরক্ত লাগে। বলতে চায় স্পষ্টই বোঝা যায়; পেরে ওঠে না। হয়-তো এই মুহূর্ত্তেও কিছু বলতে চাইছে। তাকে সাহায্য করবার জন্য, 'আমাকে কিছু বলবে, দাদা?' মালতী ইচ্ছে করে' জিজ্ঞেস করলো।

অশান্ত মুহূর্ত্তের জন্য মালতীর মুখে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। তার মেয়ে-মনের জ্ঞানের আলোয় মালতীর চোখ কঠিন, কোনোখানে যেন ব্যঙ্গের ঝিলিমিলি। অশান্ত কেমন-যেন ভয় পেয়ে গেলো; তাড়াতাড়ি বললে, 'না।'

না, সে কিছু বলবে না। সে কেন কিছু বলতে যাবে? মালতী আর বিমলের মধ্যে যা-কিছু হোক, সে কেন অনধিকারপ্রবেশ করতে যাবে? প্রগল্‌ভ, অযাচিত, কেন ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবে? প্রেমের গতি বিচিত্র: ওরা যেমন করে' পারে যে-কোনো রকম মীমাংসায় উপনীত

হোক্, তাকে নিজের মনঃপূতরূপে গঠন করবার চেষ্টা—না, অশান্তকে তা মানায় না। প্রেমের পথ এক নয়, বহু; মানুষ থেকে মানুষে তার অন্তহীন বৈচিত্র্য। বৃষ্টির জল মাটির নিচে পথ খুঁজে নেয়; অগণ্য সূক্ষ্ম স্রোতে এঁকে-বেঁকে চলে, ভূমি-গর্ভের অন্ধকারে, পৃথিবীর কেন্দ্রের উদ্দেশে। তার গতি কে নির্ণীত করবে, তার উপর নিজের ইচ্ছা খাটাতে যাবার হাস্যকর দুঃসাহস কা'র আছে? প্রেম মুক্ত, প্রেম সর্ব্বজয়ী; বাতাসের মত, আগুনের মত—যে-বাতাস সমুদ্র থেকে দূর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, যে-আগুন সমস্ত বস্তুর বাধা ধ্বংস করে' ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে উঠবে। আগুন, মুক্ত-স্বচ্ছ, দীপ্ত-লাল, অবাধ, উদ্দাম আগুন; মর্ম্মান্তিকরূপে সজীব—এবং সে-জীবন স্নায়ু-কোষের স্থূলতায় আবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট নয়: জীবনের যে-প্রাণীগত রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, অনেক উচ্চস্তরে বিবর্ত্তিত, জীবনের ব্যঞ্জনা, আগুন। আর-একবার, এবং তার স্বভাব-অনুযায়ী, কথার মোহ অশান্তকে অভিভূত করলো। অসাধারণরূপে বিকশিত তার কল্পনাশক্তি, এবং কথার জন্য তার অনুভূতি সময়-সময় একটা ব্যাধির সামিল হয়ে দাঁড়াতো। এতদূর, যে কোনো বিষয় সে যুক্তির প্রণালীতে, স্থিরভাবে বেশিক্ষণ ভাবতে পারতো না; কোনো কথার উপর হোঁচট খেতো; তারপর—কোথায় যেতো তার মূল বিষয়, যা নিয়ে সে আরম্ভ করেছিলো—সেই কথাকে ঘিরে তার কল্পনা বিচরণ করতো অবাস্তব থেকে রঙিন অবাস্তবে। অবাস্তব—চলিত অর্থে, ইন্দ্রিয় দিয়ে সেটা অনুভাব্য নয়—এই অর্থে; কিন্তু অশান্তর কাছে পৃথিবীর অনেক জিনিসের চাইতেই বাস্তব, প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণরূপে সজীব। আদিম অরণ্যের অন্ধকারে বর্ব্বর মানুষ একদা তার প্রাত্যহিক ব্যবহার-বস্তুর প্রতিকৃতি এঁকেছিলো; শতাব্দীর পর বিস্মৃত শতাব্দী ধরে' সেই-সব

চিত্র বিবর্তিত হয়েছে, বিকশিত হ'য়ে সৃষ্টি করেছে মানুষের বর্ণমালা। সেই বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরের পরস্পর-সংযোজনায়—কী জাদু, কী রহস্য! কাগজের উপর অযত্নে লিখিত, অলসভাবে মুখে উচ্চারিত একটা কথা: শুধু কোনো বস্তু বা ভাবের তা প্রতিনিধি নয়, তার যেন আলাদা, নিজস্ব কোনো প্রাণ আছে, অর্থ-স্বাধীন, অশেষভাবে প্রসারণীয় কোনো রূপ আছে; অভিধানে তা যে-জিনিসের শাব্দিক প্রতীক, তা অতিক্রম করে' আভাসে ইঙ্গিতে উদ্দীপনায় বহুদূর বিস্তৃত, সেই কথা চিত্রের পর উজ্জ্বল চিত্রে স্বতন্ত্র কোনো পৃথিবী সৃষ্টি করছে। আশ্চর্য্য—এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কী হ'তে পারে?' প্রকৃতিতে অশান্ত হচ্ছে যাকে বলে গিয়ে visualizer; ছেলেবেলায় সে সংখ্যাগুলোকে প্রকাণ্ড, জ্বলন্ত-সাদা অক্ষরে শূন্যের গায়ে লেখা দেখতে পেতো; এক থেকে দশ পর্য্যন্ত খুব পরিষ্কার, তারপর একটু-একটু করে' অস্পষ্ট, ঘন-সন্নিবেশিত এবং আকারে ছোট (দূর থেকে দেখা রেল লাইনের পাশে টেলিগ্রাফ-পোষ্টের সারির মত) হ'য়ে আসতে-আসতে একশোর পর মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে যেতো। অশান্ত ভেবে দেখেছিলো, সংখ্যা অন্তহীন, কিন্তু সেই সাদা মিছিলে একশোর পর আর নেই; আবার নতুন করে' আরম্ভ। এক আর একশো-একের স্থান, তাই, একই জায়গায়। এখন পর্য্যন্ত, কোনো সংখ্যা ভাবতে হ'লে অচেতন, অদমনীয়রূপে তার মনে পড়ে শূন্যের গায়ে সেই সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট স্থান; নির্দ্দিষ্ট স্থানে এখনো সাদা অক্ষরে তাকে দেখতে পেয়ে তবে সেই সংখ্যাকে সে চিনতে পারে। কথাও, তেমনি। বিশেষ-কোনো সময়ে বিশেষ-কোনো কথা জীবন্ত, জ্বলন্ত চিত্রের বাহন হ'য়ে তার মনে ঘা দেয়: আলাদিনের গুহার মুখে আশ্চর্য্য মায়াবী এসে দাঁড়ায়। জাদু-মন্ত্র উচ্চারিত হ'লো; অন্ধকার গুহা তার অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য্যরাশি

উন্মুক্ত করে' দিয়েছে। এক-একটা কথা যেন আলোর মত, অন্ধকারে লাল মশালের মত ; কথার সমাবেশ একটা দীপান্বিতা। কথার সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে অসাধারণরূপে সচেতন অশান্তর মন সেই দীপ্তিতে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে : চিন্তা দিয়ে কোনো জিনিসকে অনুসরণ করতে-করতে হঠাৎ সেই আলো হয়-তো জ্বলে' উঠলো ; রঙিন পরদার মত, আগুনের স্তম্ভের মত চিন্তনীয় বিষয়কে তার মন থেকে দিলে আড়াল করে'। আগুন, বিমল আর মালতী আর তাদের সংশয়-জটিলতাকে ভুলে' গিয়ে অশান্ত ভাবতে লাগলো, আগুন লাল, আগুন দ্রুত, আগুন ঊর্দ্ধগামী, আগুন মানবাত্মার অভীপ্সার প্রতীক। আগুন দুর্জ্জয়, আগুন সর্ব্বব্যাপী, অপ্রতিরোধ্য শক্তি, সূর্য্যরূপী আগুন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ-শক্তির উৎস। আগুন সৌন্দর্য্য, প্রবল বন্যা, মানুষের মনে সৌন্দর্য্য-প্রণোদিত আবেগ-বন্যা। আর হঠাৎ, আপাতত অকারণে, যেন কোনো বাজিকরের ভেল্কিতে শূন্য থেকে নিষ্কাবিত, লতা সমাদ্দারের মূর্ত্তি তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সেই মূর্ত্তিকে স্পষ্ট, নির্ভুল, সমস্ত অবান্তরতা থেকে মুক্ত করে' দেখবার জন্য অশান্ত মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুজলো। বোজা চোখের রঙিন গোধূলি-রাজ্যে লতার সাদা, ম্লান মুখের উপর কাকের পাখার মত কুচকুচে কালো একমাথা চুল ঝলসে উঠলো। অমন আশ্চর্য্য চুল অশান্ত কখনো ছাখেনি।

'Alas, Lord, surely thou art great and fair.
But lo her wonderfully woven hair !
And thou didst heal us with thy piteons kiss ;
But see now, Lord ; her mouth is lovelier.'

মৃদুস্বরে, তার স্মরণশক্তি বৃহৎ কাব্য-ভাণ্ডার থেকে, অশান্ত আবৃত্তি করলে। বাল্যকাল থেকে অশান্ত কবিতায় লালিত হয়েছে।

জীবনকে সে দেখতে শিখেছে কবিতার ভিতর দিয়ে; জীবনের যে-কোনো জিনিসের প্রতি তার আবেগ কবিতার প্রতি তার আবেগের সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত, জড়িত হ'য়ে পড়ে যে অনেক সময় সে নিজেই বুঝতে পারে না, কোন্‌টা আসল, প্রাথমিক, আর কোন্‌টা গৌণ, প্রতিফলিত রূপ। এ কি লতা সমাদ্দারের কালো চুল, যা তাকে মুগ্ধ করেছে, এবং তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সুইন্‌বর্ণের কবিতা? না কি, সুইন্‌বর্ণের কবিতাকেই সে প্রথমে ভালোবেসেছিলো, এবং তা-ই থেকে, তারই দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি-রূপে লতা সমাদ্দারের চুল সে ভালোবেসেছে? অশান্ত ঠিক বুঝতে পারে না; অতটা ভেবেও ত্যাখে না, আপাতত যেটা মনে হয়, সেটাই সত্যি বলে' গ্রহণ করে। আপাতরূপে, লতার চুলই তার মনকে আবিষ্ট করে' তুলছে, লতাকেই সে ভালোবেসেছে। ভালোবাসা আর স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে সে সবই জানে, কাব্য থেকে, সাহিত্য থেকে যতটা জানা যায়। কবিতার ভিতর দিয়ে প্রণয়-অভিজ্ঞতার সমস্ত স্তর সে অতিক্রম করেছে। কবিতায় প্রকাশিত হৃদয়াবেগ সে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে—যে-কবিরা ও-সব লিখে গেছেন, তাঁদের মতই আন্তরিকভাবে, এবং তাঁদের চাইতে কম প্রবলভাবে নিশ্চয়ই নয়। কখনো-কখনো কোনো মেয়ের সামান্য সংস্পর্শে এসে সে কল্পনা করেছে যে সে প্রেমে পড়েছে, শুধু এই আবিষ্কার করতে যে আসলে সে প্রেমে পড়েছে তার পক্ষে নব-আবিষ্কৃত কোনো কবির সঙ্গে; মেয়েটি বাহুল্য, অবাস্তব; সে না-থাকলেও সবগুলো ইমোশনই সে পরিপূর্ণ মাত্রায় অনুভব করতে পারতো। সাধারণভাবে, নৈর্ব্যক্তিভাবে মেয়েরা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে; অপরাহ্ণ-আলোয় উজ্জ্বল কোনো সোনার ফসলের মত তার মনে বাসনা ফলে' ওঠে। কিন্তু কবিতা যে-বাসনাকে উদ্দীপিত করে, তার চরিতার্থতাও আসে কবিতা থেকে; মেয়েদের জন্য

তার সম্ভাব্য ভালোবাসা কবিতার জন্য তার প্রত্যক্ষ ভালোবাসা থেকে জাত হ'য়ে আবার তাতেই লীন হ'য়ে যায়। বিশেষ করে', ইংরেজ প্রির্যাফেলাইট কবিদের মধ্যে সে বেঁচেছে: রঙিন জানলা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় উদ্ভাসিত গথিক গির্জ্জার অভ্যন্তরের মত তাঁদের আশ্চর্য্য বর্ণ-ঐশ্বর্য্য, তাঁদের সূক্ষ্ম, সযত্ন কারুকার্য্য তার দৃশ্য-লোভী মনকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে ; তাঁদের ইন্দ্রিয়-বিলাসের সৌগন্ধ্যে তার চোখে জল এসে গেছে। ঐ সব নাট্যের অগণ্য পুনরভিনয় সে দেখেছে : গুইনিভিয়ার তার সামনে দাঁড়িয়ে আত্ম-সমর্থন করেছে—লাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তার বুক উত্থিত, তার অঞ্জলিবদ্ধ হাতের মধ্যে স্বর্ণ-পাত্রে মদের মত ছায়া ; হেলেন তার নিজের বুকের ছাঁচে গড়া সোনার বাটি নিয়ে ভিনাসের মন্দিরে প্রার্থনা করেছে ; ফেনিল সমুদ্রের মাথায় পা দিয়ে রাণীর মত আফ্রোদিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা যে এত বেশি ভালোবাসতে চাই, অশান্ত নিজের মনে ভেবেছে, আমরা যে এত বেশি ভালোবাসতে পারি, তা শুধু কবিতা পড়বার জন্য, তা না-হ'লে কী করে' আমরা তার মধ্যে এত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করতে পারতাম, কী করে' আমাদের মন এত সূক্ষ্মভাবে সচেতন হ'তো? কবিতা পড়া হচ্ছে আমাদের প্রেমের জন্য প্রস্তুতি, প্রেমাভিনয়ের একরকম পরোক্ষ রিহার্সেল। 'তোমার কি মনে হয়', একদিন বিমলকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'যে-লোক কখনো কবিতা পড়ে না, সে প্রেম করতে পারে?'

বিমল হেসেছিলো। যেন ইচ্ছে করে', তাকে জব্দ করবার জন্যই বলেছিলো, 'ঐ একটামাত্র জিনিস আছে, যার জন্য একেবারেই কোনো শিক্ষার দরকার হয় না। যে-লোক জন্ম-হাবা, তাকে বিয়ে দিলে তারও ছেলে হবে।'

অশান্তর সমস্ত মুখ লাল আর গরম হ'য়ে গিয়েছিলো।—'তুমি জানো আমি ও-কথা বলিনি।'

'না, তা বলোনি', বিমল তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে' নিয়েছিলো, 'তুমি বলেছিলে আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, অতি-সভ্য, আধুনিক মেয়ে-পুরুষের দীর্ঘকাল ধরে' বিস্তৃত, নানা সূক্ষ্মতায় জটিল প্রেমের ব্যাপারের কথা। কিন্তু তার জন্য তো কবিতা না-পড়লেও চলে; প্রচুর টাকা আর প্রচুর অবসর থাকলেই হ'লো।'

'তা-ও নয়', অসহিষ্ণুভাবে মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে অশান্ত বলে' উঠেছিলো, 'কিন্তু তুমি জানো, আমি কী বলতে চাইছি।' 'ইমোশন—'

'ইমোশন!' বিমল তাকে কথা শেষ করতে দেয়নি, 'তোমার মুস্কিল কী জানো, অশান্ত? তোমার সব ইমোশনই হচ্ছে literary। অন্য-কোনো রকম ইমোশন তুমি বোঝো না।'

অশান্ত প্রতিবাদ করেছিলো, তর্ক করেছিলো, কিন্তু—পরে সে ভেবে দেখেছিলো—বিমলের কথা সত্যি। অন্তত আংশিকরূপে। সাহিত্যের খাদের ভিতর দিয়ে ইমোশনগুলো তার মনে এসে পৌঁছয়—অন্তত স্ত্রী-পুরুষ-সম্পর্কিত, প্রেম-সম্পর্কিত ব্যাপারে। প্রেমের যে একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি থাকতে পারে, সাহিত্যের কাঁধে ভর না করে' প্রেম যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—এবং চলতে পারে, অশান্ত এ-পর্য্যন্ত তার পরিচয় পায়নি। আর-একবার তার মনে হ'লো, সুইনবর্ণের কবিতার জন্যেই কি লতা সমাদ্দারের চুল…

সে যা-ই হোক্, লতার মূর্ত্তি তার চোখের সামনে—তাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না, দূর করা যাচ্ছে না। এখনকার মত লতাই সত্য। লতার সঙ্গে কি তার শিগগির আবার দেখা হবে? দেখা হ'লেই বা কী? লতাকে কখনো একা পাওয়া যায় না; সে যেখানে আছে, সেখানেই

জনতা, সেখানেই উচ্চহাস্য, অবিশ্রান্ত কথা। কিন্তু, নিজেকে যেন কোনো অপরাধী চিন্তায় ধরে' ফেলে অশান্ত নিজের কাছেই বিস্মিত হ'লো, লজ্জিত হ'লো—কিন্তু কেনই বা সে লতাকে একা পেতে চায়? প্রথম কথা, লতার জগতে সবই প্রকাশ্য, সবই সদর; যদি বা সে কখনো একা থাকে (যদিও অশান্ত তাকে কখনো তার দলের মধ্যে ছাড়া ত্মাখেনি), তার একাকীত্বে সম্ভবত কোনো গোপনতা নেই, একাকীত্বও তার অন্তঃপুর নয়। তা ছাড়া, অশান্তরই বা তাকে এমন-কী বলবার থাকতে পারে, সবার সামনে যা বলা যায় না? কিছু নয়, একটু অতিরিক্ত প্রবলতা নিয়ে নিজের মনে অশান্ত বলে' উঠলো, কিছু নয়। প্রকাশ্যতার উগ্র আলোয় ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতি, তার নির্দ্দিষ্ট পারিপার্শ্বিকের বাইরে তাকে ঠিক কল্পনা করাও যায় না। পাখার ঝল্‌সানিতে চোখ কেড়ে নেবার জন্যই প্রজাপতি—অন্ধকারে কোথায় তার স্থান? তবু, সেই ভিড়, বিরামহীন কথা আর হাসি—বিশ্রী, সমস্ত মন দিয়ে অশান্ত তা অপছন্দ করে। যথাসম্ভব সে তা থেকে দূরে-দূরে থাকতে চায়। কিন্তু সেই তার সমস্ত অপ্রীতির প্রান্তদেশে লতার কালো চুল কাকের পাখার মত কুচ্‌কুচ্‌ করছে; সব কলরবের সীমানায় লতার মর্ম্মর-ম্লান, সাদা মুখ। অশান্তর মন সেদিকে ঝুঁকে পড়ে—প্রবলভাবে; আবার সে-আকর্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্র প্রবলতরো বিতৃষ্ণায় সেদিক থেকে সরে' আসে। লতার সঙ্গে তার আলাপ বেশিদিনের নয়; এ-পর্য্যন্ত, তাদের তিনবার মাত্র দেখা হয়েছে। বিকাশ মৈত্র বলে' এক ছেলে, যার সঙ্গে অশান্ত কলেজে দু' বছর পড়েছিলো—সেই ধরণের লোক, একবার যার সঙ্গে আলাপ হ'লে আর ঝেড়ে ফেলা যায় না, অথচ যার খুব কাছাকাছি কোনোকালেই আসা যায় না (সে-হাঙ্গাম করবার মত কিছু থাকেও না বোধ হয়),

রাস্তায় আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলে যে আপনার কাঁধে সম্ভাষণসূচক এক চড় মারবেই, গোপন করবার কিছু নেই বলে' অত্যন্ত অকপট, সুতরাং অতিভাষী, চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই বলে' সব সময় প্রফুল্ল, স্বভাবত উষ্ণ-হৃদয় এবং—মোটের উপর—ভালো, এবং সব ভালোত্ব নিয়ে একটু বোকা-বোকা; সবসুদ্ধ, যাকে এড়ানো মুস্কিল, অপছন্দ করা মুস্কিল, সহ্য করা মুস্কিল—বিকাশ মৈত্র তাকে মাস দুই আগে একদিন নিয়ে যায় লতা সমাদ্দারের বাড়িতে। তার অনিচ্ছায়, বলা বাহুল্য। সে আপত্তি করাতে, এতক্ষণ বিস্মৃত কোনো কাজ উল্লেখ করাতে, 'Now, none of your swanking!' বিকাশ তার ফিল্ম থেকে সংগৃহীত স্ল্যাঙ্গে ফিল্মেরই কোনো অভিনেতার স্বচ্ছন্দ, লঘু ধরণ, অনুকরণ করবার চেষ্টা করে' বলে' উঠেছিলো, 'I'll jolly well punch your silly head if you don't come.' দলের মধ্যে বিকাশ তার ইংরিজি স্ল্যাঙ্গ-বুলির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো; এবং সে-বিষয়ে তার নিজের মনের গর্ব্বও সে গোপন করতে পারতো না; যে-ভাবে সে একজনের কাঁধে হাত দিয়ে 'হ্যালো, ওল্ড্ বয়!' বলতো, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যেতো যে সে বাহবার জন্য রীতিমত হাত পাতছে। মনে-মনে তাকে বাহবা দেবার জন্য অশান্তকে একটু সময় দিয়ে, 'Oh, do come', ফিল্ম-অভিনেতার সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজয়ী ধরণে হেসে সে বলেছিলো, "do, *do* come!' বলে' একরকম জোর করে'ই তাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়েছিলো।

'তোমাদের ওখানে কী হয়?' যেতে-যেতে অশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

'Fun', ইঙ্গিতময় সংক্ষিপ্ততায় বিকাশ জবাব দিলে, 'চলোই না। তোমার মনে হবে—Hell!' একপাল ছাগল রাস্তা পার হচ্ছিলো; উচ্চ শপথ-বুলি সহযোগে বিকাশ ব্রেইক কষে' দিলে। 'How awful!

ছাগলের জন্য আটকে থাকা!' শেষ ছাগলটা দ্রুত, অনিশ্চিত গতিতে অগ্রবর্ত্তী সঙ্গীদের অনুসরণ করে' গেলো। 'তোমার মনে হবে', পায়ের নিচে অ্যাক্সিলারেটর চাপতে-চাপতে বিকাশ তার কথা শেষ করলো, 'স্বর্গে এসেছো।'

সত্যি বলতে, লতার সেই জনবহুল, দেয়ালের ধূসরের সঙ্গে আসবাবপত্রের লাল রঙের বিরোধে সমুজ্জ্বল লতার সেই বসবার ঘরে ঢুকে অশান্তর প্রথমটায় মনে হয়েছিলো, সে চিড়িয়াখানায় পাখিদের ঘরে এসেছে—মেয়েদের সাড়ির এত রকম রঙ্ আর এমন কিচিরমিচির! অপরিচিত তাকে দেখে একটু সময়ের জন্য কিচির-মিচির থেমেছিলো, কিন্তু পরিচয়ের পালা শেষ হ'তেই তা আবার সুরু হ'লো; তাকে বিশেষ লক্ষ্য না-করে', প্রায় অবজ্ঞা করে' মুহূর্ত্তের জন্য বাধাপ্রাপ্ত ওদের আলাপ ওরা চালিয়ে নিতে লাগলো। বিকাশ তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মধ্যে; দেরি করে' আসার প্রায়শ্চিত্ত-রূপে অন্য সবার চাইতে বেশি উৎসাহ দেখালো; তার মুখ থেকে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে ইংরেজি স্ল্যাঙের সব দুর্লভতম মণি ঝলসাতে লাগলো। এক কোণে চুপচাপ বসে' অশান্তর শুধু মনে হ'তে লাগলো সে একজন বাইরের লোক, এই আবহাওয়ায় কিছুতেই মানাবে না, কখনোই নয়। সাধারণ কথাবার্ত্তার কিছু-কিছু তার কানে ঢুকছিলো, এবং সেই থেকে সে সংগ্রহ করলে যে এই জগত হচ্ছে সখের সাহিত্য-চর্চ্চা আর সোডা-ফাউন্টেনের, কোনো কাজ করতে না-হবার আর জ্যানেট গেনরের, অপরিণত মনের সিনিসিজ্‌ম্ আর অজস্র খরচ করবার ক্ষমতার। না; নিশ্চিতরূপে, নির্ভুল-রূপে, তার স্থান এখানে নয়। সে খবরের কাগজে কাজ করে শুনে, 'আপনার কি মনে হয় না খবরের কাগজ জিনিসটাই

একেবারে বৃথা?' হীরের চুলের আকস্মিক ঝলক তুলে উচ্চ, কাঁপা-কাঁপা স্বরে একটি মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'খবরের কাগজ তো আর আর্ট নয়!' অশান্ত চমকে উঠেছিলো, লাল হ'য়ে উঠেছিলো, বোকার মত হেসে কী-যেন বিড়বিড় করেছিলো। এবং সেই সন্ধ্যার মত, প্রায় ঐটুকু আলাপের ব্যবস্থাই নিজের জন্য সে করতে পেরেছিলো। খানিক পরে, চা আর ফিরপোর উৎকৃষ্ট কেইক গলাধঃকরণ করে' সে বিদায় নিয়েছিলো। বেঁচেছিলো বাইরে এসে। তার রীতিমত ইচ্ছে করছিলো তার আপিসে যেতে—মুখ বদলাতে। কিন্তু সেদিন কী উপলক্ষ্যে যেন তার আপিস ছুটি ছিলো; বিকাশকে সারা রাস্তা শাপতে-শাপতে সে বাড়ি ফিরে এসেছিলো।

সব অবাস্তব: ওদের কথার আর রঙের ছড়াছড়ি, ওদের ঝলমলানি আর আর্ট-উপাসনা। যেন রঙিন ধোঁয়ার একটা পরদা—এমনিতে খুব সুন্দর, কিন্তু একটু জোরে হাওয়া বইলেই ভেঙে যাবে, মিলিয়ে যাবে। ওদের উদ্দেশ্যে অশান্তর হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো; এবং সেই সঙ্গে মনে হ'লো, কেউ যেন তাকে অবমানিত করেছে। ওদের অবাস্তবতা যেন তার প্রতি একটা ব্যক্তিগত অপমান। তার মনের প্রতিক্রিয়ায় সেই রঙিন ধোঁয়ার পর্দা বহু অসংলগ্ন শব্দে আর দৃশ্যে বিভক্ত হ'য়ে পড়লো; কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী মুক্ত হ'য়ে, এদিক-ওদিক ভাসতে-ভাসতে শেষ পর্য্যন্ত অসীমে বিলীন হ'য়ে গেলো। তবু সেই শূন্যের গায়ে ফুটে রইলো কুচকুচে কালো চুলের নিচে লতা সমাদ্দারের ম্লান, সাদা মুখ। সে-মুখ যেন মাংসের চাইতে সূক্ষ্ম কোনো পদার্থে তৈরি; সে-মুখ যেন অবয়ব নয়, একটা আইডিয়া। অশান্তর অন্তত সেই রকম মনে হ'তে লাগলো। সে-মুখ কবিতার স্মারক, অনেক অস্পষ্ট, অবচেতন স্মৃতির উদ্দীপক। সে-মুখ অর্দ্ধজাগরণে দেখা স্বপ্নের মত, গভীর রাত্রে দূর-থেকে-

শোনা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দের মত। এত সুন্দর সে-মুখ, কোনো-এক অদ্ভুত যুক্তিতে—বা যুক্তিহীনতায়—অশান্ত ভাবলে, তা ভালো না-হ'য়ে যায় না। তখন পর্য্যন্ত, তার মনের সৌন্দর্য্য-পূজা ছিলো সাধারণত প্লেটোনিক।

বিকাশ তাদের পাড়াতেই থাকে; তার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে ঢুকে পড়ে, খানিকক্ষণ থেকে এটা-ওটা গল্প করে' যায়। তাকে কোনো উৎসাহ দেবার দরকার করে না; এমন কি, তার কথার উত্তর না-দিলেও চলে, চুপচাপ বসে' শোনবার ভাণ করলেই যথেষ্ট, নিজের মনের আনন্দে সে তার নিজের কথা বলে' হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে চলে যায়। এর পর যেদিন অশান্তর সঙ্গে তার দেখা হ'লো, 'লতার ওখানে তোমার কেমন লাগলো?' ফিল্ম-নায়কের হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে' সে জিজ্ঞেস করলো। তারপর, অশান্তকে কোনো জবাব দেবার সময় না-দিয়েই: 'রিপিং, নয়?'

হ্যাঁ, রিপিং, অশান্ত স্বীকার করলে।

'কিন্তু অত শিগগির তুমি চলে' এলে কেন?' অশান্ত মনে-মনে একটা কারণ তৈরি করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার দরকার হ'লো না। 'তুমি চলে' যাবার পর', বিকাশের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেলো, 'লতা কী বললে, জানো?' 'জানো?' বিকাশ পুনরাবৃত্তি করলে, যেন কোনো-ক্রমে অশান্তর তা জানবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, যেন সে-ই অশান্তর কাছ থেকে তা জানতে চায়। 'জানো?' তাকে তা জানাবার জন্য এবার বিকাশ অশান্তকে রীতিমত মিনতি করলে। 'বললে', একটা জমকালো, একটা ভীষণ ঘোষণা করবার আগে বিকাশ মানানসইভাবে একটু চুপ করলে। 'বললে', অসহিষ্ণু কৌতূহলে, অদম্য আগ্রহে বিকাশ নিজেই প্রায় ফেটে পড়ছিলো, 'বললে, "ছেলেটির মুখ কিন্তু ঠিক

এঞ্জেলের মত !"' দৈববাণী ঘোষিত হ'লো, আত্ম-তৃপ্তিতে, গর্ব্বে, বিজয়ের ভঙ্গিতে বিকাশের ঠোঁটের এক কোণ উপরের দিকে উত্থিত হ'লো। 'ঠিক এঞ্জেলের মত !' অত্যন্ত মৃদু, স্বল্পস্থায়ী একটু হেসে বিকাশ আবার বললে ; ভাবখানা এই যেন এই পরমাশ্চর্য্য উক্তির জন্য সে নিজেও আংশিকরূপে দায়ী। বিকাশের কথা শেষ হ'লো, কিন্তু তার মুখের হাসি মিলোলো না, শিশুদের বইয়ে হাস্যরত চাঁদের ছবির মত তার মুখ অশান্তর দিকে সন্নিবদ্ধ করে' সে তার মন্তব্য শোনবার জন্য অপেক্ষা করলে।

'জানতুম না', অশান্ত বললে, 'লতা সমাদ্দার এঞ্জেলদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ।'

'কিন্তু তা-ই যে!' ঠাট্টাকে একটা অন্যরকম মোচড় দিয়ে বিকাশ বলে' উঠলো, 'She's an angel herself. Absolutely an one. তোমাকে আর-একদিন যেতে হবে।'

অশান্ত মাথা নাড়লে।—'তুমি তো জানো—'

'জানি, জানি', বিকাশ তাকে কথা শেষ করতে দিলে না। 'কিন্তু লতা যে বলেছে তোমাকে আর-একদিন নিয়ে আসতে। "তোমার বন্ধু এত লাজুক কেন?" লতা আমাকে জিজ্ঞেস করলে। সত্যি, তুমি এত লাজুক কেন?'

অশান্ত বললে, 'হুঁ।'

সন্ধেবেলায় অশান্তর থাকতে হয় আপিসে, না-যাবার তার একটা চমৎকার অছিলা ছিলো। বিকাশ আরো দু' একদিন এসে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে ; অশান্ত গেছে চুপ করে' এড়িয়ে। বিকাশ জোর করেছে ; আহ্লাদি ধরণের হেসে বলেছে, 'আপিস! ওঃ, তোমার আপিস! একদিন না-গেলে কী হয়?'

পরস্পর

'কেনই বা যাবো না?'

'এ-কথা বোলো না যে ইচ্ছে করলে, তুমি একদিনও না-গিয়ে পারো না!'

'দুঃখিত। কাজ হচ্ছে গিয়ে কাজ।'

'কাজের জন্য তোমার ভালোবাসা রীতিমত অশ্লীল হ'য়ে উঠছে, প্রশান্ত', বিকাশ লতার কথা উদ্ধৃত করলো—বলতে গেলে নিজেরই অজান্তে। বিধাতা তার বুদ্ধির অভাব স্মরণশক্তি দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছিলেন —যে-শক্তি সে ব্যবহার করতো অন্যের মুখ থেকে শোনা কোনো চমক-লাগানো কি চতুর কথা মনে রাখতে। এত সহজে এবং এমন স্থায়ীভাবে সে মনে রাখতে পারতো যে সে ভুলে'ই যেতো কথাটার উৎপত্তি, তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কথাটা নিজের বলে' চালাবার সময় তারও ঠিক খেয়াল থাকতো না যে এ তার নিজের কথা নয়। মাঝে-মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। কথাটা যার কাছ থেকে শুনেছিলো, তার কাছেই আবার বলতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এই তো সেদিন, সমসাময়িক সাহিত্য-প্রসঙ্গে কোনো লেখক-বিশেষের কথা উঠতে সে বলেছিলো, 'ওঁর বইগুলো এমন যে একখানা পড়লে সমস্ত বাঙালিজাতির জন্য লজ্জিত হ'তে হয়।' লতা তৎক্ষণাৎ বলেছিলো, 'হ্যাঁ, সেদিন আমিই তো তোমাকে এ-কথা বলছিলাম।' দলের আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলো, বিকাশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলো। কিন্তু আর-কেউ ব্যাপারটা গ্রাহ্য করেছে বলে' মনে হ'লো না। এ-রকম দুর্ঘটনা অবিশ্যি বিরল; কারণ, লোকে সাধারণত একটা কথা বলে'ই ভুলে' যায়, আর-একজনের মুখ থেকে তার পুনরাবৃত্তি শুনলেও বুঝতে পারে না। বিকাশ, তাই, অনেকটা নিরাপদে, নির্ভয়ে তার স্মৃতিশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। ক'দিন আগে ওরা অশ্লীলতা আলোচনা করছিলো।

'আমি যদ্দূর বুঝতে পারি', লতা বলেছিলো, 'পৃথিবীর একমাত্র অশ্লীল জিনিস হচ্ছে কাজ। ঐ একমাত্র জিনিস, সভ্যতার সঙ্গে যা একেবারেই মানায়-না।' কথাটা যথাযোগ্যভাবে বিকাশের স্মৃতির ভাণ্ডারে পথ করে' গিয়েছিলো, সেখানে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে, যতদিন না ঠিক সময় বুঝে তা বেরিয়ে আসতে পারে। যেন তার প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, অচেতনভাবে, বিকাশের মুখ দিয়ে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বেরিয়ে আসে। 'কাজের জন্য', একটু পরিবর্ত্তিত, এবং সেইজন্য আরো বেশি নিজের বলে' কল্পনীয়, লতার কথা সে অশান্তকে উপহার দিলে, 'কাজের জন্য তোমার ভালোবাসা রীতিমত অশ্লীল হ'য়ে উঠেছে।'

বিকাশ কৃতকার্য্য হ'লো; অশান্ত হেসে উঠলো। 'সেইজন্যই তো এ-ভালোবাসা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।'

'রোববার তাহ'লে—কী বলো?'

'দেখি।'

অশান্ত চায় না, লতার সঙ্গে তার আর দেখা হয়। বৃথা: বৈপরীত্যের ঠোকাঠুকি ছাড়া দু'জনের মধ্যে আর কিছু হ'তে পারে না। সত্য, লতা তাকে আকর্ষণ করেছিলো, লতার কালো চুল তার মনে মুহূর্ত্তের মোহ সঞ্চার করেছিলো। কিন্তু সেই জন্যই। সেই মোহের একটা নিজস্ব সুর আছে, স্বাধীন একটা অস্তিত্ব আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিপূর্ণ, সার্থক, তা শেষ হ'য়ে গেছে। আর দরকার নেই।

বিকাশকে এড়ানো গিয়েছিলো, দৈব এড়ানো গেলো না। এক শনিবার কোনো থিয়েটারের এক নতুন পালার প্রথম অভিনয়ে তাকে যেতে হয়েছিলো। (গ্রেট ইণ্ডিয়ায় অশান্তর পদের নাম হচ্ছে লিট্রেরি এডিটর; কিন্তু তাকে কাজ করতে হয় গ্রন্থ-সমালোচকের, অপেক্ষাকৃত নিরীহ রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয় নিয়ে সেকেণ্ড লীডার লেখকের,

পরস্পর

'চিঠি-বিভাগের সম্পাদকের' নাট্য-সমালোচকের এবং, উপলক্ষ ঘটলে ছবির একজিবিশন সম্বন্ধে মন্তব্য-লেখকের : ফ্রী ইণ্ডিয়ার আপিসে অশান্তকুমার গুহ ছিলো কাল্‌চারের প্রতিনিধি। আর সত্যি, এত রকমের বিষয়ে যে তার এত জ্ঞান ছিলো তা সে কখনো সন্দেহ করেনি। সব সে মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু গেলো বড়দিনের সময় যখন তাকে যামিনী রায়ের একজিবিশনের একটা রিপোর্ট লিখতে বলা হ'লো, তখন সে বেঁকে বসলো। কথা দিয়ে যে-ছবি আঁকা হয়, এ-পর্য্যন্ত সে তারই চর্চ্চা করেছে; রঙে রেখায় আঁকা ছবি ছিলো তার এলাকার বাইরে। না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না; সবটারই একটা সীমা আছে। কিন্তু সীমা নেই শুধু—নিজের কষ্টের মূল্যে যা তাকে উপলব্ধি করতে হ'লো—দৈনিকের সব-এডিটরের জ্ঞানের। 'কেন, যাও না?' বিমল বললে, 'কলমখানেক লিখে দেবে—তা আর এমন কী?'

'পাগল! যামিনী রায়কে প্রশংসা করবার অধিকারও আমার নেই।'

'প্রশংসা করবার অধিকার সকলেরই আছে।'

'কিন্তু কতগুলো কথা লিখতে হবে তো? কী লিখবো? আমি কিছুই বুঝিনে।'

'পলিটিক্সও তো তুমি কিছুই বুঝতে না।'

'এখনো বুঝিনে।'

'কিন্তু লিখছো তো!'

'কিন্তু ছবি তো পলিটিক্স্ নয়। পলিটিক্স্ নিয়ে যা-তা করা যায়, ছবি নিয়ে যায় না। পলিটিক্সে একফোঁটা এসে যায় না, ছবিতে যে অনেকখানি যায় আসে।'

'তুমি তা-ই মনে করো। এমন অনেক লোক আছে, যাদের মত ঠিক উল্টো।'

'জানি। কিন্তু তাই বলে' আমি নিজেকে বোকা বানাতে পারিনে।'

'ভয় নেই ; কেউ তা বুঝবে না।'

'আমি তো বুঝবো।'

'তুমি যদি না যাও', বিমল তার শেষ অমোঘ যুক্তি প্রয়োগ করলে. 'তাহ'লে আপিসের অন্য-কেউ যাবে : এবং তখন একবার ভাবো তোমার যামিনী রায়ের অবস্থা।'

অশান্ত হেসে উঠলো। 'নাঃ, হার মানালে, দেখছি।' শেষ পর্য্যন্ত গেলো, এবং লিখলো সমালোচনা। নিজের উপর শ্রদ্ধা তার অনেকগুণ বেড়ে গেলো। পেটের দায়ে, নিজেকে সে সান্ত্বনা দিলে, কত রকম বিশ্রী কাজই তো মানুষকে করতে হয়, আর এ তো শুধু একজন কৃতী শিল্পীকে ভুল কারণে ভুল ধরণে প্রশংসা করা। কিন্তু পেটের দায়েও থিয়েটারে যাবার কথা সে ভাবতে পারতো না, আমাদের থিয়েটারের যা অবস্থা, তা বিবেচনা করে'। এবং, তার কর্ত্তব্যের এ-অংশ তার হ'য়ে সম্পাদন করবার লোকের অভাব আপিসে কখনো হ'তো না বলে' সে বেঁচেও যেতো। কিন্তু সেদিন ছিলো বিশেষরকম জমকালো একটা নতুন নাটক, এ-কে-জি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ না-হ'লে নাকি যার প্রতি সুবিচার করা হয় না। তা ছাড়া, সম্পূর্ণ আগের সপ্তাহটা সেই থিয়েটার রোজ পূরো আধ কলম জায়গা নিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ; খোদ ম্যানেজার বলে' পাঠিয়েছিলেন, অশান্ত নিজেই যেন নাটকটা দেখে আসে। কমপ্লিমেণ্টারি দর্শক, তাকে বসতে হয়েছিলো একেবারে প্রথম সারিতে—তার একদিকে এক পয়সা দামের কোনো থিয়েটারি সাপ্তাহিকের সম্পাদক, অন্যদিকে একজন বিখ্যাত আধুনিক ঔপন্যাসিক—যেখান থেকে বিগতযৌবনা অভিনেত্রীদেরকে রঙের পুরু প্রলেপের জন্য বীভৎস দেখায়, দু'জন মাইনর চরিত্র পার্ট বলবার অবসরে নিজেদের মধ্যে

গল্প করলে টের পাওয়া যায়। সম্পাদক আর ঔপন্যাসিক তাকে অতিক্রম করে' গলা বাড়িয়ে গল্প করছিলেন; জায়গা বদ্‌লানো যায় কিনা ভেবে অশান্ত একবার পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো দু'সার পিছনে লতা সমদ্দারকে। দলের কয়েকজনের সঙ্গে সে শুধু সেই মুহূর্ত্তে এসে বসবার আয়োজন করছে। লতার ভুরু উত্থিত হ'লো, অস্পষ্ট একটু হাসি তার ঠোঁট ছুঁয়ে গেলো, ডানহাতের এক সুন্দর, মৃদু ভঙ্গি করে' সে পরিচয় স্বীকার করলে। প্রত্যভিবাদন করে' অশান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলে; যবনিকা উঠতে আরম্ভ করেছিলো।

প্রথম অঙ্ক শেষ হ'তে একটা সাধারণ নড়াচড়া সুরু হ'লো সম্পাদক আর ঔপন্যাসিক থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চলে' গেলেন। কথাবার্ত্তার গুঞ্জন। দেশলাই জ্বালবার শব্দ। প্রেক্ষাগৃহের উপর সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে অশান্তর চোখ লতার চোখে পড়লো। মধ্যবর্ত্তী সারি অনেকটা খালি হ'য়ে গিয়েছিলো; তার সামনের শূন্য চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে' লতা বললে, 'এখানে আসুন না।'

অশান্ত উঠে সেই দলের সঙ্গে যোগ দিলে।—'কেমন লাগছে?' স্বভাবতই, এ-ই হচ্ছে প্রথম কথা, যা বলা যায়।

'কী? এই নাটক? কান্না পাচ্ছে।'

কান্না সত্যি বলতে, অশান্তরও পাচ্ছিলো; কিন্তু লতা ও-কথা বলেছে বলে'ই সে প্রতিবাদ করা দরকার মনে করলো। 'কেন? আমার তো বেশ ভালোই লাগছে।'

লতার মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত, দ্রুত একটু হাসি নির্গত হ'লো। 'কেন আপনি আমাদেরকে এত অবজ্ঞা করেন?' হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো।

অশান্ত ঘাবড়ে গেলো, একটু লাল হ'য়ে উঠলো, টুকরো-টুকরো কথায় প্রতিবাদ করলো। 'কিন্তু না', লতা তার ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখলো, 'আমি জানি।'

'কী করে' জানেন ?' সঙ্গে-সঙ্গে অশান্তর মনে হ'লো, ছি-ছি, এটা কী বললাম !

'সেদিন আমাদের ওখানে গিয়ে আপনি যে-ভাবে বসেছিলেন, তা-ই থেকেই—'

'আমার বসবার ধরণ আপনার পছন্দ হয়নি বলে'', অশান্ত হেসে উঠলো, 'দুঃখিত।'

যেন একটা অননুপভোগ্য বিস্ময়ে লতার চোখ বিস্ফারিত হ'লো। 'কিন্তু আপনি আসেন না কেন ?' অন্তরঙ্গ অভিযোগের সুরে লতা বলে' উঠলো।

'সত্যি, কেন ?' লতার পার্শ্বোপবিষ্ট যুবক প্রতিধ্বনি করলে।

'বলুন, কেন', সেদিন যে-মেয়েটি আর্ট নয় বলে' খবরের কাগজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলো, গম্ভীর, একটু চিন্তিত মুখ তুলে অশান্তর দিকে তাকিয়ে সে বললে। যেন এই সমস্যা মনে-মনে অনেকদিন ধরে' সে জল্পনা করছে, যেন এর সমাধানের উপর কত যে গুরুতর ব্যাপার নির্ভর করছে।

'অবিশ্যি আসেন না যখন', লতা বললে, 'স্পষ্টই বোঝা যায়, আপনার ভালো লাগে না।'

'কেননা', যুবকটি বললে, 'আমাদের যা ভালো লাগে, তাই আমরা করি।'

'যদিও', অন্য মেয়েটি গূঢ় মন্তব্য করলে, 'মাঝে-মাঝে ঠিক উল্টোটাও করি। খুব বেশি যখন ভালো লাগে, তখনই।'

পরস্পর

এ যেন এক রকমের খেলা, কথার খেলা, কথার জন্যেই কথা; বৃষ্টির সন্ধ্যার জন্য ছেলেদের কাগজগুলো যে-সব খেলা উদ্ভাবন করে, তারই একটু সাবালক একটা সংস্করণ। মুখ থেকে মুখে, তিনজনের মধ্যে আবদ্ধ এই খেলা, যেন এক ম্যাজিশিয়ান-পার্টি আশ্চর্য্য কোনো বাজি দেখাচ্ছে, গোপন জ্ঞানের অংশ-গ্রহণে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। ম্যাজিশিয়ানের কাছে বোকা-বনে'-যাওয়া দর্শকের মত, বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে, নিজের সম্ভ্রম-হানির পীড়নে অশান্ত কিছু বলতে পারলে না। সে অদীক্ষিত, সে বাইরের; এই খেলার মর্ম্মে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য। সমবেতভাবে, মাকড়শার মত এরা নিজেদেরকে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে; এরা যেখানেই যায়, সেই জাল বহন করে নিজেদের সঙ্গে: অত্যন্ত সভ্য একটা মাকড়শা আত্ম-সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য জালের মধ্যে কিল্‌বিল্‌, কিল্‌বিল্‌ করছে!

'আপনি মনে-মনে যে-সব আশ্চর্য্য কথা ভাবছেন, তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখছেন কেন?' ম্যাজিশিয়ান তার অপ্রস্তুতির উপর করুণা করে' বলছে: 'আপনার ঘড়ি যে ফেরৎ পাবেন, তা তো ঠিকই। কেন অত ভাবছেন?' আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে এই পিঠ-চাপড়ানো সহানুভূতির পালাই সব চেয়ে খারাপ।

'বোধ হয় সে-সব কথা এতই আশ্চর্য্য', চেয়ারে হেলান দিয়ে অলস, মৃদুস্বরে অন্য মেয়েটি বললে, এতই আশ্চর্য্য যে তা বলা যায় না?'

'অন্তত, আমাদের কাছে?' তার পূর্ব্ববর্তীর কথার সুর অক্ষত রেখে যুবকটি ক্ষীণভাবে প্রশ্ন-চিহ্নের উচ্চারণ করলে।

এবং আবার তা সুরু হ'লো: হাত থেকে হাতে বল-ছোড়াছুঁড়ি, তাকে মাটিতে পড়তে দেয়া নেই। অশান্তকে নির্ব্বোধ, একটা ফাঁকা হাসি বজায় রাখতে হ'লো, যেন সে খেলাটা উপভোগ করছে;

নিষ্ক্রিয়ভাবে, কাল্পনিকভাবে তাতে যোগ দিচ্ছে পর্যন্ত। 'আচ্ছা—বিড়্‌বিড়্‌ করে' সে বিদায়-প্রার্থনা করলে।

'কিন্তু', লতা বললে, 'আপনি তো এখানেও বসতে পারেন। টুল্‌টুলের পাশের চেয়ারটা খালি আছে।'

অশান্ত ধন্যবাদ জানালো, দুঃখপ্রকাশ করলো; তারপর তার সম্পাদক আর ঔপন্যাসিকের মাঝখানে ফিরে এলো। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'তেই সে উঠে বাইরে চলে' গেলো।

কিন্তু তৃতীয় অঙ্কটা, দেখা গেলো, স্রেফ একটা যন্ত্রণা। প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলবামাত্র নিছক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে অশান্তকে উঠতে হ'লো; নেহাৎই তৃতীয় অঙ্কের ছাপ মন থেকে দূর করবার জন্য, তৃতীয় অঙ্ক দেখতে বাধ্য হবার প্রতিশোধ অন্য-কারো উপর নেবার জন্য লতাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হ'লো, 'কেমন?'

'চমৎকার!' লতার হাসি একটা দীপ্তি।

'কিন্তু জীবনও যে ঠিক এই রকম!' জীবনের উপলব্ধিতে গম্ভীর, চুলের উপর একবার হাত বুলিয়ে ট্র্যাজিক কণ্ঠস্বরে যুবকটি বললে।

'জীবন', লতা তৎক্ষণাৎ বল্‌টা লুফে নিলে, '…আ, জীবন! এ-বিষয়ে আপনার কী মনে হয়, অশান্তবাবু?' একটু অনিপুণভাবে লতা বলটা অশান্তর দিকে ছুঁড়ে মারলো।

অশান্ত সেটাকে মাটিতে পড়তে দিলে। 'আপনাদেরকে এখানে দেখতে আশা করিনি।'

লতার মুখের ভাব বিষণ্ন, করুণ হ'য়ে উঠলো: 'কিন্তু জীবন যে বড় একঘেয়ে। অসহ্যরকম। বৈচিত্র্য দরকার।'

'বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্য চাই।' টুল্‌টুল্‌ এমন সুরে কথাটা বললে যেন বৈচিত্র্য দোকানের জানালায় দেখা একটা নতুন রকমের সাড়ি, যার

উপর তার মন পড়েছে, এবং যা পেলে সে অন্তত তখনকার মত সুখী হবে।

'বাঙালি থিয়েটারে আর যে-জিনিসেরই অভাব থাক্', অশান্ত বললে, 'বৈচিত্র্যের নেই। একেবারে নব-রস একসঙ্গে। বীভৎসও বাদ নেই। বরং, সেটাই প্রধান। কী করে' যেন, অন্য রসগুলোও ওতে পরিণত হ'য়ে উঠতে চায়।'

'অথচ, মৃণাল', লতা তার পার্শ্বোপবিষ্ট যুবককে সম্বোধন করলে, 'তুমি তো আসতে চাওনি। এর চেয়ে মজার জিনিস কোথায় আর পেতে ?'

'মজা—খানিকক্ষণের জন্য।' মৃণাল দীর্ঘশ্বাস ফেললে, 'তারপর—ওঃ !'

'মৃণাল, তুমি একবার আফিং চেষ্টা করে' ছাখো না', টুল্‌টুল্ পরামর্শ দিলে।

'কিম্বা তোমাকে—কী বলো ?'

মেয়ে দু'টি একসঙ্গে হেসে উঠলো ; কিন্তু এ-ধরণের কথাবার্ত্তায় অনভ্যস্ত, অশান্ত তার মুখের রক্তিমা গোপন করবার জন্য মেঝেতে তাকালো।

'আপনার কি মনে হয় না, তার চিন্তামগ্ন, তার বিষণ্ন ধরণে লতা বললে, 'বেঁচে-থাকা একটা ভয়ানক ব্যাপার ? এমন ঝকমারি ! এমন ক্লান্তি !'

'যাকে করে' খেতে হয়, তার পক্ষে নয়।' অশান্ত হেসে উঠলো।

'তা-ই', একটু চুপ করে' থেকে লতা যেন মনে-মনে কথাটা জল্পনা করলো, 'তা-ই। কাজই হচ্ছে সুখ। শুধু, কাজ করতে ইচ্ছে করে না—এই যা।'

'আর যা ইচ্ছে করে না, তা তে আর করা যায় না', টুল্‌টুল্ সিদ্ধান্ত করলে।

'কিন্তু আমার যে দরকার!' হঠাৎ ব্যাকুলভাবে মৃণাল বলে উঠলো 'আমার যে ভালোবাসা দরকার! কেউ কি আমাকে ভালোবাসবে না?'

'আঃ, চুপ করো!' একটা আঙুল তুলে টুল্‌টুল্ শাসন করলে।

'ভালোবাসা যে আমার চাই', ছোট ছেলে যেমন করে' লজঞ্চুষের জন্য বায়না ধরে, মৃণাল বলতে লাগলো, 'আমার চাই-ই যে।'

'টুল্‌টুল্', লতা বললে, 'ওর মুখের ভিতর একটা রুমাল ঢুকিয়ে দাও তো।'

'কে আমাকে ভালোবাসবে? কে···' মৃণাল কোনো প্রকাশ্য স্থানে পাগল কি মাতালের মত ব্যবহার করে' সব সময় আনন্দ পেতো।

'বাড়ি চলো, খোকা', টুল্‌টুল্ মৃণালের ঘাড়ের উপর আস্তে দু'বার টোকা দিলে, 'তোমাকে অনেক, অনেক ভালোবাসা দেবো।'

'আঃ, টুল্‌টুল্!' অশান্তর ভয় হ'লো, মৃণাল এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে, 'যদি জানতে! যদি জানতে!'

'জানি, জানি। এখন চুপ করো তো, লক্ষ্মী।'

অসাধারণরকম দীর্ঘ এবং সশব্দ এক নিঃশ্বাস ফেলে মৃণাল চুপ করলো। এটা হচ্ছে অন্য একরকম খেলা, ম্যাজিশিয়ানদের দুই নম্বর বাজি। অশান্তর প্রায় হাত-তালি দেবার লোভ হ'লো।

চতুর্থ অঙ্কের পর অশান্ত আর সহ্য করতে পারলো না। যথেষ্ট হয়েছে—তার প্রবন্ধ লেখবার পক্ষে। সত্যি বলতে, এতক্ষণ না-থাকলেও চলতো।

'সে কী? যাচ্ছেন?' বিস্মিত, রীতিমত আহতস্বরে লতা বলে' উঠলো, 'এখনই?'

'না, না', টুল্‌টুল বললে, 'আপনাকে থাকতেই হবে। মৃত্যুশয্যায় স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনের দৃশ্যটা না-দেখে যাবেন কী করে'? আপনার কি হৃদয় নেই?'

'এখন পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু এত করুণ রসে গলে' গিয়ে আর না-থাকতে পারে। সেইজন্যই চলে' যাচ্ছি।'

'আর সেই চাকরটা—আশেপাশে কেউ না-থাকলেই যে হাত-পা ছুঁড়ে গান করে—'

'ওটা হচ্ছে হাস্যরস।'

'—Isn't he too perfect?'

'Heavenly!' তার দুঃখের গভীরতা থেকে মৃণাল অস্পষ্ট উচ্চারণ করলে।

'হাস্যরস', কারো কাছে মনের খানিকটা বিষ বার করে' দিতে পেরে অশান্ত খুসি হ'লো, 'হাস্যরস plus গান ঢোকাবার উপলক্ষ। Plus প্রধান অভিনেতাদের চা খাবার, পরের দৃশ্য সাজাবার সময়। কুলিয়ে না-উঠলে ম্যানেজার অডিটোরিয়মে একজন লোক পাঠিয়ে দেয়—সে "এঙ্কোর, এঙ্কোর!" বলে। Perfect stage-craft!'

'কিন্তু বাকিটা দেখেই যান না—please!' লতার স্বর অনুনয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো। 'Please!' অশান্তর মুখের উপর লতার চোখ ঘনকৃষ্ণ তমিস্রায় ঝলসে উঠলো।

সেই দৃষ্টি তার অন্তরে প্রবিষ্ট হ'তে অনুভব করে', 'অসম্ভব', অশান্ত বলে' উঠলো।

টুল্‌টুল্ বললে, 'কিন্তু অসম্ভব বলে' যে কিছু নেই।'

'যদি না', মৃণাল বললে 'অবিশ্যি কিছু থেকে থাকে।'

লতা উঠে দাঁড়ালো। জনাকীর্ণ, বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে কালো চুলের

নিচে ম্লান-সাদা তার মুখ। যেন অসময়ে, অস্থানে একটা ফুল ফুটে উঠেছে। তীব্র একটা কেয়ার গন্ধ অশান্তর চেতনাকে দীর্ণ করলে।

'আপনি আমাদের দিকেই তো থাকেন। চলুন না একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

'আমি এখন বাড়ি যাচ্ছিনে।'

'কোথায় তবে ?'

'আপিসে।'

'এখন ?'

'নাটকের সমালোচনা লিখতে হবে না ?' অশান্ত হেসে উঠলো। 'কালকের কাগজেই যে বেরুনো চাই।'

'না লিখলে কী হয় ? কালকেই না-বেরুলে কী হয় ?'

অশান্ত কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে।

'যা-ই হোক, কর্ত্তব্যের পথ থেকে আপনাকে ভ্রষ্ট করতে চাইনে। কিন্তু বলে' যান, আবার কবে আপনার দেখা পাবো। বলুন ?' যেন প্রার্থনায়, লতার মুখ একটু উত্থিত হ'লো, কোনো আশ্চর্য্য, বিদেশী ফুলের মত অশান্তর দিকে উত্থিত হ'লো। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ অস্পষ্ট হ'য়ে আসতে-আসতে মিলিয়ে গেলো; অন্ধকার আকাশের নিচে বর্ষা-সন্ধ্যা এলায়িত—কোথায় কেয়া ফুটেছে। অশান্ত কী বলবে, বুঝতে পারলে না। 'কিন্তু আমার যে ইচ্ছা আপনি মাঝে-মাঝে আসেন।' লতার কণ্ঠস্বর মিনতিতে তরল হ'য়ে এলো, প্রার্থনায় উন্নত তার মুখে রক্তবর্ণ-অঙ্কিত ঠোঁট দু'টি কোনো দেবতার উদ্দেশে লাল ফুলের অঞ্জলির মত। 'সত্যি।'

আর সত্যিও তা-ই। সত্যি তার ইচ্ছা, অশান্ত মাঝে-মাঝে আসে সে চায়, অশান্ত তার আরো কাছে আসুক। সে তার পক্ষে চমৎকার

হাওয়া-বদল। তার অরুচি-ধরা মুখে নতুন রকমের স্বাদ। অবিশ্যি একেবারে ছেলেমানুষ, কাঁচা মাল, কিন্তু…কেন নয়? যদি তার ভালো লাগে? সত্যি, কেন নয়? আমার যা ভালো লাগে, এমন কি, ভালো যদি না-ও লাগে, যাতে আমি মজা পাই, তা করবো না কেন? তা ছাড়া, ছেলেটি দেখতে বেশ। এবং ওর মধ্যে যা সব চেয়ে বড় আকর্ষণ, তা এই যে ও একেবারে সহজ, পরিষ্কার, জলের মত স্বচ্ছ; মুখের দিকে তাকালেই মনের ভাব বোঝা যায়। কথায়-কথায় ওর উচ্চহাসি—হঠাৎ যা তোমাকে চমক লাগিয়ে দেয়—তার মধ্যে ও যেন নিজেকে সম্পূর্ণ করে' ধরা দেয়, কিছু হাতে রাখে না, কিছু গোপন করে না। কী অদ্ভুত হাসি! আধুনিক কালের কোনো সভ্য লোক ও-রকম করে' হাসে! যেন নিতান্তই খুসি হ'য়ে হাসছে, ভালো লাগছে বলে'ই হাসছে। একটু বোকা-বোকা অবিশ্যি, কিন্তু সেটাই তো মজা। মজা লাগবে ওকে নষ্ট করে' দিতে। অবিশ্যি ওকে নিজেদের একজন করে' নেয়ার কথা ভাবা যায় না; ওর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক, তা সাময়িক, সংক্ষিপ্ত হ'তে বাধ্য। সে তো আরো ভালো। সেইজন্যেই আরো বেশি উপভোগ্য। নিজের জগৎ থেকে স্বেচ্ছা-পলাতক, অন্য-এক আলোয়, অন্য-এক উষ্ণতায় নিখুঁত অবকাশ-যাপন। যতদিন না ক্লান্তি আসে, স্বাদের নতুনত্বর ধার ক্ষয়ে' না যায়। মন্দ কী? লতার কাছে এই সম্ভাবনা রীতিমত লোভনীয় হ'য়ে দেখা দিলো।

'এমনিতে তো আর আসবেন না', অশান্তর নীরবতা অতিক্রম করে' লতা বললে, 'সুতরাং নিমন্ত্রণ করছি। সামনের বিষ্যুৎবার সন্ধেবেলা—মেলিনিতে।'

'কোথায়?'

'মেলিনি—পার্ক ষ্ট্রিটে', লতা যথানুযায়ী নির্দেশ দিলে, 'কেউ নাম

শোনেনি, কিন্তু ভারি সুন্দর, ছোট্ট জায়গা। মেলিনি—যেখানে আমাদের মিলন হয়। আসবেন? দয়া করে' বলবেন না যে, 'আপিস আছে।' 'আসবেন তো?' একটু চুপ থেকে, আড়ভাবে অশান্তর দিকে তাকিয়ে লতা আবার জিজ্ঞেস করলে।

না, সে বরং যাবে না, বরং নয়। এই ব্যাপারটা সে মোটেও পছন্দ করতে পারছিলো না, এই নিমন্ত্রণ। এর মানে একটা বাধকতা, একটা দায়িত্ব—যা লাঘব করবার, মোচন করবার সাধ্য তার নেই। সে বড়লোক নয়; এবং অনায়াসে অজস্র পয়সা ব্যয় করবার ক্ষমতা না-থাকলে এদের সঙ্গে মেশা যায় না। তাকে লজ্জা পেতে হবে, পরোক্ষ-ভাবে অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে, পদে-পদে তার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। না, দরকার নেই। বরং নয়, বরং নয়। তার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো। এদের সঙ্গে আল্‌গাভাবে মেশা, বাইরে থেকে এদের লক্ষ্য করা—তা একরকম চলতে পারে, কিন্তু এদের সঙ্গে মিশে-যাওয়া—তা একেবারে আলাদা ব্যাপার, তাতে অনেক বিপদ। এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা মানেই তাদেরকে—যতই ক্ষীণভাবে, যতই অস্থায়ীভাবে হোক—স্বীকার করা, তাদেরকে আমলে আনা। সেটা অশান্ত চায় না।

তবু, লতার সেই তরল দৃষ্টির সামনে, যেন ব্যাকুলতায়, যেন আগ্রহে কম্পিত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত 'আসবেন তো?' এই প্রশ্নের উপর একেবারে না বলে' ফেলা শক্ত। অশান্ত মনে-মনে ইতস্তত করলো, কথা খুঁজলো, তারপর সে কী বলছে, তা না-বুঝেই বলে' ফেললো, 'হ্যাঁ, যাবো।'

মেলিনিতে লতার পার্টি যে-রকম সে আশা করেছিলো, তা থেকে কিছু অন্যরকম হ'লো না। দু'দিকে দু'টি মেয়ে নিয়ে বসে' এক ভদ্রলোক ইতালীয় ও ইংরেজ মেয়েদের শারীরিক অবয়বের তুলনামূলক সমালোচনা করছিলেন। (প্রসঙ্গক্রমে জানা গেলো যে তিনি গোল টেবিল বৈঠকের

এক সদস্যের প্রাইভেট সেক্রেটারি হ'য়ে বিলেতে গিয়ে একমাস ছিলেন, এবং দেশে ফেরবার সময় ইটালি ছুঁয়ে এসেছিলেন।) অসময়ে টাক-পড়া ছুঁচলো-মুখ এক ভদ্রলোক মাঝে-মাঝে ইংরেজি হাসির গান গেয়ে সবাইকে হাসাচ্ছিলেন। এক কোণে টুল্‌টুলের পাশে বিকাশ—স্বর্গীয় দীপ্তিতে তার মুখ উদ্ভাসিত—টুল্‌টুলই সব কথা বলছে, আর সে মুরগি-রোস্‌ট্‌ মুখে দিচ্ছে, হাসছে, কেশে উঠছে, আর সময় পেলে বলছে, 'Oh it's damned good, it's damned good!' মৃণালের মন ভালো নেই; সে চুপচাপ বসে' আছে, আর খাবার ভুলে' গিয়ে অবিশ্রান্ত সিগ্রেট ফুঁকছে। অশান্তর উল্টো দিকে একটি মেয়ে নিচু হ'য়ে পাতে মশলা ঢাল্‌ছে, তার পাশের যুবকটি সেই ফাঁকে তার কানে দিলে চিমটি কেটে। মুখ তুলে মেয়েটি যুবকের গালে—আস্তে, অবিশ্যি—বসিয়ে দিলে এক চড়। তারপর দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। হাতা-ছাড়া ব্লাউজ-পরা এক মেয়ে গল্প করলো: 'সেদিন ভারি এক মজা হ'য়ে গেছে। ভারি, ভারি, মজা।' এইটুকু বলে'ই হাসতে-হাসতে এমনভাবে লুটিয়ে পড়তে লাগলো যে অশান্তর সন্দেহ হ'লো যে মজাটা অন্য-কারো জানবার সুযোগই হবে না। 'কী মজা, কী ভয়ানক মজা!' হাতের ছুরিকাঁটা রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে দুর্ব্বলভাবে, অসহায়ভাবে, হতাশভাবে সে হাসতে লাগলো। 'সেদিন এক বৃদ্ধা মহিলা', বীরতুল্য চেষ্টায় হাসি দমন করে' সে আবার আরম্ভ করলো, 'এসেছিলেন আমাদের বাড়ি বেড়াতে। কী-রকম যেন একটু সম্পর্ক আছে আমাদের সঙ্গে। ভালো করে' চোখে দেখেন না। সুতরাং যার সঙ্গেই দেখা হয়, গায়ে হাত বুলিয়ে সেটা পুষিয়ে নেন।' এখানে হাসির আর-একটা আক্রমণ এলো; দু'হাত একত্র করে' টেবিলের উপর মাথা রেখে প্রায় নিঃশব্দে সে খানিকক্ষণ হেসে নিলে—তার

দু'কাঁধ হাসির ধাক্কায় প্রবলভাবে আন্দোলিত হ'তে লাগলো। মুখ যখন তুললো, তার চোখে জল এসে গেছে। 'আমাকে দেখে', চোখ মুছে সে বলতে লাগলো, 'বৃদ্ধা খুব বেশি খুসি হলেন মনে হ'লো, অনেকক্ষণ ধরে' আমার গায়ে হাত বুলোলেন।' এখানে আবার একটা আক্রমণ আশঙ্কা করা যেতো, কিন্তু এ-ফাঁড়া যা হোক সে কাটিয়ে উঠলো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁট কামড়ে সে হাসি আটকাতে লাগলো, তার গলার স্বর গেলো বিকৃত হ'য়ে—জিজ্ঞেস করলেন—উহুহু—জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার—তোমার—" মেয়েটির মুখের পেশীগুলোর উৎকট বিকৃতি হ'তে লাগলো, "তোমার বয়েস হয়েছে কত, মা?" এক নিঃশ্বাসে এইটুকু বলে' ফেলে' সে একটু বিশ্রাম নিলে; তারপর হঠাৎ চীৎকার করে' একেবারে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ এক স্বরে বলে' উঠলো, "তেরো?"' এতক্ষণ অবরুদ্ধ স্রোত আর বাধা মানলো না; হাত-পা এলিয়ে দিয়ে অদমনীয়, অসহনীয় তার সেই হাসি দেখতেও কষ্ট হয়। আর এ-সবের মাঝখানে রাণীর মত, দেবীর মত লতা—সে আদেশ করছে, শাসন করছে, নিজের ইচ্ছামত সব জিনিস নিয়ন্ত্রিত করছে। সব জড়িয়ে ব্যাপারটা খুবই সোল্লাস এবং একটু উন্মাদ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশান্তর মাথা ধরে' গেলো। আহার-সমাপন করে'ই সে বিদায় নিলে, অন্য কেউ তাকে প্রায় লক্ষ্যই করলো না। শুধু লতা তার সঙ্গে এলো রেস্তোরাঁর দরজা অবধি। সে যখন রাস্তায় বেরুলো, তার মস্তিষ্কের মধ্যে তখনো কেয়ার তীব্র গন্ধ ঘুরছে।...

সেই গন্ধ এখন আবার তার মনকে হানা দিচ্ছে। তার বোজা চোখের রঙিন অন্ধকারে এখন কুচ্কুচে কালো চুলের নিচে লতার ম্লান-সাদা মুখ।

ভাইয়ের অবস্থাও ভালো নয়। লিখেছে, ওখানে যদি রাণীর একটা স্থিতি হয়, তা'হ'লে আমিও যাবো। তখন, বাসন্তী, তখন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। শোন্, কাল তুই ষ্টেশনে গিয়ে রাণীকে নিয়ে আসিস—চারটে পঞ্চাশে গাড়ি। বড় হ'য়ে ও এই প্রথম কলকাতায় আসছে—প্রথম আমাদের এখানে এসেই তো উঠুক, তারপর সুবিধে মত ওর হস্টেলে যাবে। আমরা এখানে আছি, ওর মা-র এটা কত বড় জোর। মনে থাকে যেন।'

'থাকবে।'

'আশ্চর্য্য—সেই রাণী, এক ফোঁটা মেয়ে, সে আজ ইস্কুলের চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসছে। আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে। একবার সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে-গড়াতে দোতলা থেকে একেবারে নিচে পড়ে' গিয়েছিলো —এ তো সেদিনের কথা।'

কোনো কথা না-বলে' অশান্ত মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কী সুন্দর, কী সুন্দর এ-মুখ ; জীবনের সূক্ষ্মরেখাঙ্কিত, জীবনের দীর্ঘ উত্তাপে পরিপক্ক, অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে আর্দ্র, সহিষ্ণু, কোমল। এ-মুখ একটা ইতিহাস, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা কাব্য। এ-মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখা গড়ে' তুলতে কত আত্ম-বিরোধ, কত ব্যর্থতা, কত বিক্ষোভই যে লেগেছে—কত বিনিদ্র রাত্রি, কত অশ্রুজল, কত কঠিন প্রতিজ্ঞা, আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী জীবনের কত অপরাজেয় শক্তি! কত দুঃখে, সংগ্রামে, কত আনন্দে, জয়োল্লাসে, কত শান্ত পরিপূর্ণতার মুহূর্ত্তে, কত অসহ্য বাঁচায় এই মুখ তৈরি হয়েছে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, প্রতি হৃৎস্পন্দন এই মুখের উপর অদৃশ্য ছায়া ফেলেছে ; বছরের পর দীর্ঘ বছরের সংযোজনায় এই-সব রেখায় তা আজ দৃশ্যমান হ'য়ে উঠেছে। এ-ই তো সৌন্দর্য্য ; যৌবনে মানুষের মুখে যখন পর্য্যন্ত জীবনের ছায়া

পড়ে না, তখন কী করে' তা সুন্দর হ'তে পারে? মাংসের দৃঢ়ত্ব আর চামড়ার উজ্জ্বলতা নিয়ে যৌবনের মুখ শূন্য, সাদা একটা খাতা, যাতে কবিতা লেখা হবে; আকৃতিহীন এক খণ্ড মর্ম্মর, যা কেটে মূর্ত্তি তৈরি হবে। কী করে' তা সুন্দর হ'তে পারে, স্মৃতি এখনো যাকে ঐশ্বর্য্যময় করেনি? হঠাৎ, আকস্মিক, অপ্রতিরোধ্য, অশান্তর আবার লতার মুখ মনে পড়ে' গেলো। 'ছাখো, দেবতা, তার চুল যে আরো সুন্দর!' অনেক, অনেক বেশি সুন্দর: তুলনা হয় না! সে-মুখ জীবনের স্মরণ-চিহ্নে সুন্দর নয়, কিন্তু লতার যৌবনই যে তার সৌন্দর্য্য, লতার ঐশ্বর্য্য তার যৌবন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'আর দেখুন', মৃদু হাস্য করে' মনোরঞ্জন বললে, 'একবিংশ পরিচ্ছেদে যে সমুদ্রের বর্ণনাটা আছে, সেটা লক্ষ্য করতে ভুলবেন না।'

মনোরঞ্জন মল্লিক আজকালকার একজন কৃতী ঔপন্যাসিক; একখানা বই লিখেই খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙলাদেশের জে, বি, প্রিস্ট্লি, বাঙলা কথা-সাহিত্যকে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের দূষিত অবরোধ থেকে মুক্ত করে' সে নিয়ে গেছে টাট্‌কা হাওয়ায়, খোলা আকাশের নিচে; মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মপথ গোলক-ধাঁধা থেকে পিকারেস্‌ক্‌-এর অবাধ মাঠে। বাঙলা উপন্যাসের নিজস্ব, বিশিষ্ট ধারা সে ফিরিয়ে এনেছে: তার লেখা খাঁটি, যাত্রাগান কবিগান খেউড়গানের মত খাঁটি, বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম, দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ আছে। গ্রামের, এমন কি, গ্রাম্যতার সে ভক্ত; সে প্রকৃতির উপাসক। সহরের লোকের চোখে, বছরে একবার যারা এক সপ্তাহের জন্য দেশে যায়, কি তা-ও যায় না, তাদের চোখে গ্রাম সর্ব্বদাই সুন্দর, রোম্যান্টিকভাবে সুন্দর, গাছ-পালা আকাশ আর সহজ, সরল, প্রবৃত্তি-পরিচালিত মানুষ নিয়ে পৃথিবীর স্বর্গ। সেই প্রবৃত্তি-পরিচালিত, সহজ, সরল মানুষ—তাদের মধ্যে যদি বাস করতে পারতাম! সেই নির্জ্জনতা, সেই প্রসার, উদয়াস্ত আকাশে রঙের খেলা! সন্ধে থেকে রাত এগারোটা অবধি অবিচ্ছিন্ন আড্ডায় একটু ক্লান্ত, একটু বিশ্রামেচ্ছু হ'য়ে, ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো শক্ত লেন-দেনে প্রতিপক্ষের কাছে হেরে গিয়ে,

দীর্ঘশ্বাস ফেলে' সহরের লোক ভাবে। মনোরঞ্জনের বই তারা, তাই, গোগ্রাসে গিললো—আহা, কী সুন্দর! কী সুন্দর! এবং কত ভাগ্যের বিষয়, গ্রামে তাদেরকে বাস করতে হয় না—নাগরিকের কল্পনায় অন্তত, বাঙলার পল্লী সুন্দর থাক্। সন্দেহ নেই, মনোরঞ্জন বাঙলা সাহিত্যের ত্রাতা; তার নিজের, অন্তত, নেই। সম্প্রতি, তার দ্বিতীয় বই বেরিয়েছে; গ্রেট ইণ্ডিয়ায় তার সমালোচনা-প্রসঙ্গে সে অশান্তর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। সমালোচকগুলো আবার সব গোরু; তার উপর, অনেক সময় না-পড়ে'ই লেখে; কী লিখতে হবে তা, তাই, বলে' দেয়া ভালো। অশান্ত যাতে তার গোরুত্ব জাহির করে' না-বসে, অশান্ত যাতে বুদ্ধিমান সমালোচনা লিখে তার ও তার কাগজের মান বজায় রাখতে পারে, সেইজন্য, অশান্ত এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ারই মঙ্গলের জন্য সে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে এক প্রীতি-সভার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে' কষ্ট করে' এসেছে গ্রেট ইণ্ডিয়ার আপিসে। 'সমুদ্রের বর্ণনাটা', (ওঃ, এই-সব সমালোচকরূপী গাধা! এদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে না-নিলেও নয়, আবার, তা করাও এক হাঙ্গাম!) 'লক্ষ্য করতে ভুলবেন না।'

অশান্ত আশ্বাস দিলে যে তার মনে থাকবে।

'বুঝলেন?' এমন সুরে মনোরঞ্জন কথাটা আরম্ভ করলে, যেন সে যা বলতে যাচ্ছে, তা খুব শক্ত ব্যাপার, অবহিত হ'য়ে সমস্ত বুদ্ধি একত্র করে' না-শুনলে তা বোঝা যাবে না, 'বুঝলেন, সেবার ওয়াল্ট্যায়ারে গিয়েছিলুম—কী অপূর্ব্ব রূপ দেখলুম সমুদ্রের! বিশ্বাস করবেন?—রোজ ভোর চারটের সময় উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে' থাকতুম—কখন রাত কেটে সমুদ্রের উপর ভোর হবে, তা দেখবার জন্য।'

'তাই নাকি?'

'কী আনন্দে যে আমার মন ভরে' যেতো, তা আমি নিজেই ভালো

করে' বুঝতাম না।' মনোরঞ্জনের মুখের ভাষা একটু সাড়ম্বর, সালঙ্কার। "কী আনন্দ! আমার ভিতরে এক নিরবচ্ছিন্ন উৎসব চলছে।' তার কথা বলার ধরণ একটু নাটকীয়, শিশির ভাদুড়ীর প্যারডি গোছের। 'সে-সব অভিজ্ঞতা আমি এ-বইয়ে দিয়েছি।'

'খুব ইণ্টরেস্টিং তো।'

'লেখা তো আর সহজে হয় না, মশাই, সহজে হয় না। এ তো ছেলেখেলা নয় যে কলম নিয়ে বসলেই হ'লো। দু' চারটে কথার চকমকি ঠুকে তাক তাকিয়ে দেয়া—তা কে না পারে? কিন্তু লেখা যেখানে শুধু একটা সৌখিন আর্ট নয়, যেখানে মন-প্রাণ দিয়ে, সমস্ত জীবন দিয়ে লিখতে হয়, লেখা যেখানে তপস্যার মত', শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণে, হঠাৎ স্বর নামিয়ে দিয়ে মনোরঞ্জন তার বক্তব্য শেষ করলে, 'সেখানে ও-সব ফাঁকি চলবে কেন?'

'সে তো ঠিকই।' ঠিকই, অশান্ত ভাবলে, কিন্তু মনোরঞ্জনের মুখ থেকে ঠিক শোনাচ্ছে না কেন? শুধু ঠিক কথা বললেই হয় না, ঠিকভাবেও বলা চাই। ভুলভাবে উক্ত হ'য়ে অনেক সত্য অর্থহীন—এমন কি, হাস্যকর শোনাতে পারে। ভুল লোকের নায়কত্বে অনেক যুদ্ধে সত্যের হার হ'য়ে থাকে। সত্য কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তার যোগ্য আশ্রয় চাই। নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে, মনোরঞ্জন যা বলছে, তা সত্য ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু অশান্তর কেন হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে, অস্বীকার করতে, প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে?

'আমার লেখায়, মশাই, ও-সব ফাঁকি পাবেন না', মনোরঞ্জন বলতে লাগলো, 'আমার লেখায় কোনো ক্ল্যাপট্র্যাপ নেই।' 'ক্ল্যাপট্র্যাপ নেই', গম্ভীরভাবে, যেন অশান্তর মনের মধ্যে কথাটা বসিয়ে দেবার জন্য সে আবার বললে। 'কত ভেবে-চিন্তে, মাথা ঘামিয়ে একটি লাইন আমি

লিখি! তা-ও কি একবার? অনেকে শুনেছি, একবারে যা লেখেন, তা-ই ছাপতে দেন। অবাক লাগে শুনে। কী করে' পারেন? আমি? আমি দু'বার, তিন বার, চার বার পর্য্যন্ত লিখি। কুঁড়েমি করে' নিজেকে এতটুকু রেয়াৎ করিনে। এত পরিশ্রমে, এত কষ্টে এই রকম প্রকাণ্ড একখানা বই তৈরি হয়। ভাবতে পারেন?'

অশান্ত ভাবতে চেষ্টা করলো; খুব কৃতকার্য্য হ'লো না।

'মহিম কাঞ্জিলালকে চেনেন?' হঠাৎ মনোরঞ্জন প্রশ্ন করলো।

অশান্ত একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। 'না—কেন?'

'চেনেন না? ইউনাভার্সিটিতে ইংরিজির প্রফেসর। চমৎকার লোক —যেমন অগাধ বিদ্যা, তেমনি নির্ভুল রসবোধ। চমৎকার লোক। সেদিন তিনি বলছিলেন যে আমার "স্বর্গের পথ" ইয়োরোপের কোনো ভাষায় লেখা হ'লে এতদিনে নিশ্চয়ই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতো।'

অশান্ত বললে, 'হুঁ।' মুখের কৌতূহল-উদ্দীপিত হাসি দিয়ে সে চেষ্টা করলো বাকস্বল্পতার ক্ষতিপূরণ করতে।

'মহিমবাবু বলেছেন, বইখানা ইংরিজিতে তর্জ্জমা করবার ব্যবস্থা তিনি করবেনই। তর্জ্জমা আরম্ভ হ'লে', অশান্তকে সে উপদেশ দিলে, 'খবরটা আপনাদের কাগজে একটু ছেপে দেবেন।'

'আচ্ছা।'

মহিমবাবু আরো বলেছেন, ইংরিজি সংস্করণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ধরে' ইয়েট্‌স্ কি বার্নার্ড শকে দিয়ে একটা ভূমিকা লিখিয়ে নেবেন। কে ভূমিকা লিখলে, আপনার মনে হয়, বেশি কাজ হবে। ইয়েট্‌স্, না বার্নার্ড শ?'

অশান্ত বললে, 'কী করে' বলি?'

'দু'জনের মধ্যে বড় লেখক কে?'

এবার অশান্ত হেসে উঠলো।—'আপনার মহিমবাবুকেই জিজ্ঞেস করবেন। লেখকদের মাপবার নিখুঁত যন্ত্র অধ্যাপকদের হাতেই থাকে।'

লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়—মনোরঞ্জন মনে-মনে ভাবলে—এটুকু ছেলে, এখনো গা থেকে কলেজের গন্ধ যায়নি, সে কিনা মহিম কাঞ্জিলালকে ঠাট্টা করে! সে যদি শুধু একবার মহিমবাবুকে রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর উৎপত্তি-সম্বন্ধে বলতে শুনতো! কী বিদ্যা! কী চিন্তাশক্তি! ছেলেটাকে পটাপট মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে দেবে? নতুন পাখা গজিয়েছে, মনে হচ্ছে; একটু শাসন করা দরকার। কিন্তু এই বাচাল, দুর্বিনীত নাবালকই যে গ্রেট ইণ্ডিয়ার গ্রন্থ-সমালোচকরূপে অধিষ্ঠিত! ধরো, সে যদি চটে' যায়! হীন বিদ্বেষে যদি তার বইটার সর্ব্বনাশ করে' দেয়? তাহ'লে যে সাধারণভাবে বাঙলা সাহিত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হ'বে, সত্যের অবমাননা হবে। সত্যের অবমাননা সে কেন হ'তে দেবে? না, না, সে-কথা ভাবা যায় না। বরং, সে না-হয় মনের ভাব একটু গোপন করে'ই রাখলো, না-হয় এই ডেঁপো ছোঁড়াকে একটু প্রশ্রয়ই দিলে। সত্য, সত্য সবার আগে। বাইরে গিয়ে অন্য লোকের কাছে মন খুলে এর শোধ নিলেই হবে। সম্প্রতি···অশান্তর হাসির উত্তরে শুষ্ক, কৃত্রিমভাবে একটু হেসে সে বললে, 'হ্যাঁ' অধ্যাপকরা অবিশ্যি··· !' সে কথা শেষ করেনি; কেউ বলতে পারবে না সে মহিমবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলেছে। 'দেখেছেন', আবার গম্ভীর, আবার অশান্তর স্বেচ্ছা-শিক্ষক, সে বললে, 'দেখেছেন দীপ্তি পত্রিকা কী লিখেছে?'

'না তো!'

'দেখেননি? অবিশ্যি লেখাটা পারফেক্ট হয়েছে, বলবো না, কিন্তু দুটো-একটা পয়েণ্ট আছে···' মনোরঞ্জন চিন্তিত মুখে পকেটে হাত দিলে, 'দেখছি, একটা কপি তো ছিলো সঙ্গে—আমার বন্ধু রমেশের ওখানে

থেকে আসছি কিনা—সে দিয়ে দিলে—এই যে, রয়েছে।' পকেটের গহ্বর থেকে মনোরঞ্জন ছোট সাইজের, ভয়ানকরকম হাই-ব্রাউ চেহারার একখানা পত্রিকা বা'র করলে। তার জামার পকেটগুলো সাধারণভাবে ড্রয়ারের কাজ করতো—চিঠির ও বিবিধ কাগজপত্রের স্তূপে সেগুলো ঠাসা থাকতো ;—কারণ, কখন্ কোন্ প্রশংসামূলক চিঠি কি পত্রিকার কাটিং-এর দরকার হয়, বলা যায় না। 'এই যে।' পত্রিকাটা বা'র করতে গিয়ে আরো কতগুলো কাগজপত্র পকেট থেকে বেরিয়ে মেঝেয় পড়ে' গেলো ; নিচু হ'য়ে একহাতে সেগুলো তুলতে-তুলতে অন্য হাতে তিনি অশান্তর দিকে পত্রিকাটা এগিয়ে দিলেন। 'দেখুন।' অশান্ত দেখলো ; মলাটে সূচীপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে গেলো। 'পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ', 'বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র', 'সোভিয়েট নাট্যকলা', 'বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক সমস্যা', 'কাব্যের ভবিষ্যৎ', তারপর লাল-পেন্সিল-চিহ্নিত 'সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যে মনোরঞ্জনের স্থান'। তার মুখোমুখি বসে' মনোরঞ্জন তার চোখের গতি লক্ষ্য করছিলো ; নির্দ্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত জায়গায় তার দৃষ্টি আবদ্ধ হ'তে লক্ষ্য করে' বললে, 'পড়ুন ; ওটা আপনার কাজে লাগতে পারে।' অশান্ত পাতা উল্টিয়ে সেই প্রবন্ধে এলো। 'মনোরঞ্জন বাঙালি', সে পড়লো, 'আজকাল বাঙলা ভাষায় যাঁরা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মনোরঞ্জনই বাঙালি। এবং তিনি যে বাঙালি, এ-ই তাঁর গৌরব।' ছাপার পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে অশান্ত মনোরঞ্জনের দিকে তাকালো। 'কিন্তু বাঙালি না-হ'লে যে আপনি অ্যাদ্দিনে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতেন!' বলে' সে হেসে উঠলো।

* * *

'বিয়ে তুলে দাও!' ঘরের অন্য কোণে এক টেবিলে উপবিষ্ট, প্রবল

বাহুভঙ্গি-সহযোগে, চীৎকার করে' নীলকান্ত কর বললে, 'গৃহ তুলে দাও!' তার দীর্ঘ কম্যুনিস্টিক চুলের ঝাঁকড়া আবেগে দুলে উঠলো। 'পরিবার তুলে দাও!'

'ও-তিনটি জিনিসের একটিও না-থাকলে আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না—এখনো হচ্ছে না—কিন্তু আমাদের কথা একবার ভাবুন।' চার্চ্চিল-সাহেবের এক বক্তৃতার উপর প্যারাগ্রাফ লিখতে-লিখতে অর্দ্ধেন্দু মন্তব্য না করে' পারলে না। ছেলেটি নতুন বিয়ে করেছে, এ-সব বিষয়ে তার নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট মতামত ছিলো।

'কচু!' রাইকমল সরকার নীলকান্তর উদ্দেশে হিংস্রমুখভঙ্গিতে দন্ত প্রদর্শন করলে, 'হাতী!' দ্বিতীয়বার জেল থেকে বেরোবার পর ইস্কুলের ছেলের মত কথায়-কথায় শপথ-বুলি উচ্চারণ করবার তার অভ্যেস প্রায় একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, 'বিয়ে আর গৃহ আর পরিবার—সাপ ব্যাঙ্ মাছ! দেশ যতদিন স্বাধীন না হয়—'

'দেশ! দেশ!' তার মস্তিষ্কে নিরবিচ্ছিন্ন সুরা-আচ্ছন্নতা থেকে নীলকান্ত বলে' উঠলো। 'দেশ মানে কী? দেশ মানে কী? দেশ মানে তো মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য—'

অর্দ্ধেন্দুর পাশে বসে' পরমেশ কথা বলার একটা সুযোগ খুঁজছিলো। চাঁদের মত গোল তার মুখে ঠোঁটের বাঁ কোণ থেকে ইঞ্চি-খানেক উপরের দিকে উত্থিত আত্ম-সচেতন, আত্ম-প্রসন্ন হাসি। অর্দ্ধেন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে, প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে' সে আরম্ভ করলো, 'সেদিন আমাদের সাহিত্য-সভার অধিবেশনে—'

'কিন্তু', পরমেশের ক্ষীণস্বর নীলকান্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, 'কিন্তু মানুষের মুক্তি—সেটাই তো আসল কথা। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

'মাকড়শা!' রাইকমল তার ঘৃণা ও অবজ্ঞা সূচনা করবার জন্য

প্রাণীজগত থেকে প্রচুরভাবে আহরণ করে' থাকে, 'দেশে যদি মানুষ থাকতো, যদি থাকতো—'

'কিন্তু এই কৃত্রিমতা!' নীলকান্ত আর রাইকমলে রীতিমত একটা চীৎকার-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'লো. 'মিথ্যা আচারে মানুষের প্রকৃতিকে চাপা দিয়ে রাখা! এ-ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহ'লে পৃথিবীর তো শেষ হ'লো বলে'!

শূন্যের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত রাইকমল গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করলো, 'তা-ই হবে।'

পরমেশ আর-একবার চেষ্টা করলো, 'সেই অধিবেশনে কথা হচ্ছিলো—'

'স্ত্রী-পুত্র, সমাজ-সংসার, ঈশ্বর-স্বর্গ। কী বন্ধন! কী অন্ধতা! হাজার-হাজার বছর ধরে' মানুষকে এরা মেরে রেখেছে। কিন্তু আর নয়। সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! দেশ যদি স্বাধীনই না-হ'লো, তবে—'

'মরতে-মরতেও মানুষ মরে না', নীলকান্ত টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটা বিড়ি ধরালো। 'আজ এত সহস্র বছর পর নতুন করে' তার উত্থান, পৃথিবীর ইতিহাসের সব চেয়ে গৌরবের পরিচ্ছেদ তৈরি হচ্ছে।'

'কথা হচ্ছিলো—'

'আমার দেশ, আমার দেশ! সবাই মিলে তাকে নষ্ট করে' দিলে, ছারখার করে' দিলে! চ্ছ্যাঃ!' স্বদেশপ্রেমের আতিশয্য সহ্য করতে না-পেরে রাইকমল তার দু'পায়ের ফাঁকে একগাদা থুতু ফেলে জুতো দিয়ে সেটা মেঝের উপর লেপে দিলে।

'কথা হচ্ছিলো শরৎচন্দ্রের—' পরমেশ একটু স্বর চড়িয়ে দিলে।

'অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয় না, অর্দ্ধেন্দুবাবু', নিবে-যাওয়া বিড়িটা

আবার ধরিয়ে নীলকান্ত মনে করিয়ে দিলে। অর্দ্ধেন্দু প্রাণপণে বেল্ বাজালো। 'ওতে হবে না', রাইকমল বললে; তারপর, 'তারা, এই তারা!' তার মর্ম্মভেদী চীৎকারে মনোরঞ্জনের কথার অনুধাবনের মাঝখানে অশান্ত চম্‌কে উঠলো।

*　　*　　*

'সমালোচকের কাজে', টেবিলের উপর কনুই, হাতের উপর গাল, মনোরঞ্জন মল্লিক অশান্তকে বোঝাচ্ছিলেন, 'সমালোচকের কাজে দায়িত্বের অন্ত নেই। প্রথম বিপদ হচ্ছে, বাজে বইকে লোকের চোখে তুলে ধরা, কিন্তু যে-বিপদ তার চেয়েও বড়, তা হচ্ছে ভালো বইয়ের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' অশান্ত বললে।

'সমালোচকের উপলব্ধি করা দরকার', অন্য টেবিলের গোলমালের মাঝখানে মনোরঞ্জনের নাটকীয়, নকল-ভাদুড়ীয় বক্তৃতা বেজে চললো, 'তার দায়িত্ব কত বড়। সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার কাজ তার হাতে।'

'ঠিকই', অশান্ত বললে।

'কিন্তু', চিন্তাশীলভাবে, যেন খানিকটা হতাশভাবে মনোরঞ্জন বললে, 'আমাদের দেশের সমালোচনার অবস্থা একবার ভাবুন।'

আদিষ্ট, অশান্ত তা-ই ভাবলে।

'আমাদের দেশে সমালোচনা বলে' যা চলে—কী? ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে প্রশংসা, ঈর্ষাপ্রণোদিত নিন্দা। ভাবতে পারেন—ভাবতে পারেন অশান্তবাবু', মনোরঞ্জনের কণ্ঠস্বরে একটা চমৎকার ভাদুড়ীয় প্যাঁচ খেলে' গেলো, 'আমাদের দেশে বন্ধু বন্ধুর বইয়ের স্তুতিমূলক সমালোচনা করছে; এবং সে-আচরণের প্রতিবাদ কেউ

করছে না, বরং অনেকেই তা সীরিয়াস্‌লি নিচ্ছে! এমন কি অনেক লেখক, শুনেছি, কাগজের আপিসে ঘুরে-ঘুরে—'

'এ কী!' অশান্ত চমকে বলে' উঠলো। হঠাৎ তার ঘড়ির উপর চোখ পড়েছিলো—চারটে আঠারো। রাণীকে আনতে ষ্টেশনে যাবার কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলো। আর এক মিনিটও দেরি করা যায় না। 'Excuse me', বলতে-বলতে অশান্ত উঠে দাঁড়ালো, আমাকে এক্ষুনি একটু বেরুতে হচ্ছে। বিশেষ কাজ।'

'এক্ষুনি?' স্পষ্ট বোঝা গেলো, মনোরঞ্জনের বক্তব্য তখনো নিঃশেষ হয়নি।

'এক্ষুনি। মনে কিছু করবেন না।' অশান্ত বাইরে যাবার দরজার দিকে যেতে আরম্ভ করলো।

মনোরঞ্জনও উঠে দাঁড়ালো। অশান্তর পিছনে চীৎকার করে' বললে, 'দীপ্তিটা তাহ'লে আপনার এখানে রেখে যাবো?'

'রেখে যান', অশান্ত ফিরে চ্যাঁচালো।

হ্যারিসন রোড থেকে অশান্ত বাস্ ধরলো। সর্ব্বনাশ—আর-একটু হ'লেই সে গাড়ি ফেল করেছিলো আর কি। আর মেয়েটি নাকি কলকাতায় নতুন—কী বিশ্রী ব্যাপার হ'তো তাহ'লে! যা-ই হোক, এখন সে ঠিক সময়েই পৌঁছতে পারবে, আশা করা যায়। ভাগ্যিস তার ঘড়ির উপর ঠিক সময়ে চোখ পড়েছিলো। একটু পরে-পরেই সে তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো। চারটে পঞ্চাশ—চারটে পঞ্চাশ তো? তার ঠিক মনে আছে তো? অশান্তর মনের এক অংশ যতই দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলো, তার ঠিকই মনে আছে, ততই অন্য অংশ সন্দিহান হ'য়ে উঠতে লাগলো। তার দ্বিধা রীতিমত শারীরিক অস্বস্তিতে অনুভাব্য হ'তে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে

পড়ে' সে প্রায় তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো—রাণীকে সে চিনবে কী করে'? মা শুধু বলে' দিলেন, রাণী আসবে, আর সে-ও—এমন বোকা!—সে-কথাই মেনে নিলে, আর-কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার বোধ করলো না। গাড়ি থেকে কত লোকই তো নামবে—তার মধ্যে কে সেই রাণী, যার বাবা তাকে শিশিতে-শিশিতে লজঞ্চুষ দিতেন, এবং তিন দিনের জ্বরে যিনি মারা যান, সে ছাড়া যার মা-র আর-কেউ নেই, যে অশান্তর পিরাম্বুলেটর চড়ে' বেড়াতো, এবং যার সঙ্গে সে খেলা করতো···কুড়ি বছর আগে? অশান্ত রাণীকে মনে করবার চেষ্টা করলো: সবুজ একটা ফ্রক, ঝাঁকড়া চুল। গাড়ি থেকে যে-মেয়ে নামবে—সে কেমন? অশান্ত কল্পনা করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই সবুজ ফ্রকের ছবিকে মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলো না; সমসাময়িক রাণীকে মনের মধ্যে ঠিক উপলব্ধি করতে পারলো না! তবু এক অজ্ঞাত কারণে তার কেবলি মনে হ'তে লাগলো যে রাণীকে সে দেখলেই চিনতে পারবে; কোনো অসুবিধে হবে না। তার ধরণ-ধারণেই একটা-কিছু থাকবে, যাতে চেনা যাবে, অস্পষ্টভাবে অশান্ত ভাবলে। দু'জনে দু'জনকে খুঁজছে, অথচ আগে কখনো দেখেনি বলে'ই চিনতে পারবে না—না, সে অসম্ভব; তা মনে করতেই হাসি পায়।

চারটে চল্লিশে অশান্ত হাওড়া ষ্টেশনের বাইরে বাস্ থেকে নাবলো। যাক্—ঢের সময় আছে; খামকাই সে অত ভয় পেয়েছিলো। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে সে এগিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম? ওঃ, কিছুতেই কেন তার এ-সব কথা আগে মনে হয় না? একটা কাজের ভার নেবার সময় কেন সে তখনই উপলব্ধি করতে পারে না ঠিক কী কাজের ভার নিচ্ছে? এখন

সে কী করে? বাঃ, সে-ও যেমন! এন্‌কোয়ারি-আপিস রয়েছে কী করতে? যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো, সেখান থেকেই বড়-বড় অক্ষরে 'Enquiries' কথাটা লেখা দেখতে পাচ্ছিলো। কুলি, হকার, অপেক্ষমান থার্ডক্লাসের যাত্রী ও নানারকম বর্ণনাহীন লোকের ভিড়ের ভিতর দিয়ে সে পথ করে' নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। গাড়িটার নামও সে জানেনা; মিনিটখানেক তার দিক থেকে অত্যন্ত কষ্টকর আলাপের পর সে প্ল্যাটফর্মের নম্বরটা সংগ্রহ করতে পারলো। কিন্তু কোথায় চার নম্বর? অশান্ত ব্যাকুলভাবে একবার ষ্টেশন-ইয়ার্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চোখ বুলিয়ে গেলো। যাক্, ঐ যে। সেদিকে সে ছুটতে যাবে; মনে পড়লো, প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কাটা বাকি। নাঃ, মানুষের জীবন সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে অসহ্য করে' তুলতে সভ্যতার মত কিছু নয়। একটা অত্যন্ত সহজ কাজ সম্পন্ন করতে নানারকম জটিলতার বাধা—এ-ই তো সভ্যতা! অশান্ত জোরে একবার বুকের ভিতর নিঃশ্বাস টেনে নিলে। উঃ, এই হাওড়া ষ্টেশন! এই অরণ্য! এখানে কী করে' কেউ কোনো জিনিস খুঁজে বার করতে পারে? পৃথিবীর মধ্যে অন্য-এক পৃথিবী, এখানে ঢুকলেই আত্ম-হারা হ'য়ে পড়তে হয়। এই বুঝি একটা স্লট-মেশিন! ওঃ, যন্ত্র-দেবতাকে ধন্যবাদ, এর জন্য খোপের পিছনস্থ সেই ভয়ঙ্কর-দর্শন কোনো নারী-জাতীয়ার সম্মুখীন হ'তে হ'লে আর রক্ষে ছিলো না। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকে একটা পাখার নিচে দাঁড়িয়ে সে কপালের ঘাম মুছলো। তার মনে হ'তে লাগলো, যেন এইমাত্র সে কোনো যুদ্ধ-জয় করে' এসেছে।

অশান্তর যা মনে হ'লো দারুণবেগে (এবং আসলে যা গাড়ির নিম্নতম গতি) দীর্ঘ মেইল-ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। কামরার পর কামরা তার চোখের সামনা দিয়ে ছুটে গেলো—জানলায় অস্পষ্ট সব মুখ। আর

হঠাৎ, প্ল্যাটফর্ম জনতায় আর কোলাহলে ভরে' গেলো; অশান্তর চারদিকে দ্রুত-সচল লোক: ভারতীয় ভিড়ের অভ্যস্ত বিশৃঙ্খলা ও সরবতা। এরই মধ্যে কত লোক প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে: ট্যাক্সি নিচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে' তার সেই আত্মহারা ভাব ফিরে এলো; তার হৃৎপিণ্ড যেন ডুবে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় সে রাণীকে খুঁজবে? কী করে' খুঁজতে হয়, তা-ও সে জানে না। সেই এলোমেলো ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে তার একেবারে অসহায় মনে হ'লো; সেখানেই দাঁড়িয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার চারদিকে তাকাতে লাগলো। ভিড় পাৎলা হ'য়ে আসছে, রাণী হয়-তো আগেই বেরিয়ে গেছে— কোথায় গেছে? ছি-ছি—এই সামান্য কাজও যদি তাকে নিয়ে না হয়…? আর-একটু অপেক্ষা করে' চলে' যাওয়া ছাড়া তো আর উপায় দেখছে না। শেষ হতাশ চেষ্টায় তার চোখ প্ল্যাটফর্মের ক্ষীণায়মান ভিড়ের প্রত্যেকটি মুখ পরীক্ষা করে' যেতে লাগলো। তার পিছনের দিকে, একটু দূরে দাঁড়ানো একটি মেয়ের পিছন তার চোখে পড়লো। মেয়েটির হাতে একটা অ্যাটাশে-কেইস, পায়ের কাছে স্যুটকেইস আর বিছানা নাবানো; সামনে দাঁড়িয়ে একটা কুলি প্রবল অঙ্গভঙ্গি-সহকারে কী-যেন বলছে। অশান্ত মেয়েটির পিছন ভালো করে' লক্ষ্য করছে, এমন সময় মেয়েটি সন্ধানী দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো, ঠিক অশান্তর মুখের উপর এসে পড়লো তাঁর চোখ। একটু সময় মূক পরিচয়-প্রশ্নে দু'জনেই তাকিয়ে রইলো। তারপর অশান্ত গেলো তাড়াতাড়ি এগিয়ে।— "আপনি লক্ষ্ণৌ থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

ডুবতে-ডুবতে অশান্তর পায়ের নিচে মাটি ঠেকলো। তবু, একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি—রাণী তো?'

'হ্যাঁ, আমার নাম রাণী।'

মেয়েটির গলার স্বরে একটা অনির্দেশ্য আকর্ষণ: অকপট, নরম; যার উপর দিয়ে অনেক দুঃখ গেছে, তার আত্মস্থতায়, তার প্রফুল্লতায় সজীব। তার গায়ের রঙ সুন্দর; ভ্রমণজনিত কালিমা-সত্ত্বেও—অশান্ত লক্ষ্য করলে—তার মুখের উষ্ণ আভা টের পাওয়া যায়।

'তবু ভাগ্যিস আপনাকে পাওয়া গেলো', অশান্ত মনে-মনে যা ভাবছিলো, সেটা মুখে বলে' ফেললে, 'আপনি কি আগাগোড়া এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন?'

রাণী মাথা নাড়লো।—'জানতুম কেউ আসবে।'

'চলুন, আর দেরি করে' লাভ কী?' তার এতক্ষণকার অপটুত্বের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অশান্ত হঠাৎ ভয়ানক নিপুণ হ'য়ে উঠলো। কুলির মাথায় জিনিষপত্র চাপানো হ'লো। প্ল্যাটফর্ম পার হ'য়ে ট্যাক্সির দিকে যেতে-যেতে, 'পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?' মামুলিভাবে সে জিজ্ঞেস করলে।

'না, বিশেষ নয়।'

এবং তারপর আর কেউ বলবার মত কোনো কথা খুঁজে পেলো না। ট্যাক্সিতে দু'জনে চুপচাপ বসে' রইলো। দু'জনের মাঝখানে পরিচিত অপরিচয়ের ব্যবধান: যার সম্বন্ধে অনেক-কিছু শুনেছি, অথচ এই প্রথম সাক্ষাত হ'লো, তার সঙ্গে আলাপ জমানো মুস্কিল: ভদ্রতার প্রথানুযায়ী যে-সব কথা জিজ্ঞেস করা যায়, তা সবই জানি; আর তার বাইরে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। অশান্ত অনুভব করছিলো, তার কিছু বলা উচিত; সত্যি, কী-ই বা বলা যেতে পারে? সে আলাপ-নিপুণ নয়; দরকার নেই চেষ্টা করে'। রাণী, এদিকে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে রাস্তার দু'দিকে তাকিয়ে তার পক্ষে নতুন এই সহর দেখে নিতে ব্যস্ত ছিলো।

ইডেন গার্ডেন পিছনে ফেলে গাড়ি রেড রোড দিয়ে সোজা দক্ষিণ-দিকে চললো। সুন্দর রাস্তা রেড রোড—দু'দিকে বিস্তৃত মাঠ নিয়ে অবাধ, নিরবচ্ছিন্ন চলে' গেছে—কলকাতার সব চেয়ে সুন্দর রাস্তা। ট্যাক্সিগুলো গতি বাড়িয়ে দিলে; আপাতত অন্তহীন, যানবিরল, পথিক-হীন রাস্তা—অশান্তর নিজেরই মনে হ'তে লাগলো যেন সে অন্য-কোনো সহরে এসেছে। অপরাহ্ণের উজ্জ্বল আলোয় কঠিন-নীল চৈত্র-আকাশ উদ্ভাসিত; কোনো মায়াবী যেন সমস্ত সহরের উপর তার জাদুদণ্ড বুলিয়ে গেছে: দূরবর্ত্তী সব বাড়ি, মাঠ, রাস্তা, গাছের সারি, যেখানে চোখ পড়ে, ছবির মত, স্বপ্নের মত, কল্পনার মত সব সুন্দর। চারদিকে অপার শান্তি: সমস্ত সৃষ্টির মূলগত যে-শান্তি, অপরাহ্ণের এই অজস্র আলোয় তা যেন সুরের মত স্পষ্ট-অনুভাব্য হ'য়ে উঠেছে; ট্যাক্সির মিটারটাও যেন সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হচ্ছে। অশান্ত তাকালো, তাকালো, তবু যেন তার যথেষ্ট দেখা হ'লো না। 'সুন্দর সহর তো কলকাতা!' সেই অপরিসীম শান্তির ভিতর থেকে হঠাৎ রাণী বলে' উঠলো।

'আপনার তা মনে হচ্ছে, খুসি হ'লাম।'

এবং রাস্তায় এর বেশি আলাপ আর তাদের হ'লো না। রাণীকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়েই অশান্ত আবার আপিসে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাবার একটা অছিলা পেয়ে সে খুসি হ'লো; বাড়ি থাকলেই তার উপর অন্তত আংশিকরূপে অতিথি-আপ্যায়নের ভার পড়তো—এবং পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত্তগুলো অত্যন্ত অকোয়ার্ড, অস্বস্তিকর, তা এড়াতে পেরে সে বাঁচলো। ও-সব হাঙ্গাম তার মা-র উপর দিয়েই যাক্, স্বচ্ছন্দে তাঁর উপর নির্ভর করে' থাকা যায়। সে যখন আপিস থেকে ফিরে এলো, রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে। মা-র কাছে শুনলো, কাল বিকেলের মধ্যেই তাকে'

হস্টেলে উঠে যেতে হবে ; পরশু তার কাজ আরম্ভ করবার তারিখ।

'কাল আপিসে যাবার সময়, বাসন্তী বললেন, 'ওকে পৌঁছিয়ে দিতে পারবি ?'

'পারতেই হবে', অশান্ত বললে।

সে-রাত্তিরে যতক্ষণ সে না ঘুমোলো, বাড়িতে রাণীর উপস্থিতি সম্বন্ধে অশান্ত অদ্ভুতভাবে সচেতন থাকলো। খানিকটা উত্তেজনা, খানিকটা অস্বস্তি—যেন একটা নির্দ্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীর মধ্যে কোনো অসমঞ্জস বহির্বস্তু প্রবেশ করেছে। সে-অনুভূতির জন্য অশান্ত বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমোতে পারলো না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে অশান্তকে যখন তার মা এসে ধাক্কা দিলেন, সে তার অভ্যেস-মত মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখ খুলে পাশ ফিরে আবার চোখ বুজলো। দেরি করে'—যতটা সম্ভব দেরি করে'—সে ঘুম থেকে ওঠে: সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে উঠতে তার কিছুতেই ইচ্ছে করে না। সে জেগে-জেগে ঘুমোয়, মনের খুসিতে গড়া অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখে—যতক্ষণ না মা-র ডাকাডাকি সত্যি-সত্যি অসহ্য হ'য়ে ওঠে। পাশ ফিরে, তাই, সে আবার চোখ বুজলো; সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে দেখতে পেলো তার আপিসের টেবিলে বসে', তার উল্টোদিকে উপবেশিত মনোরঞ্জন মল্লিক নাটকীয় সুরে বলছে, 'সমুদ্রের বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা!' আর তার পরেই, হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে। পরের মুহূর্ত্তেই তার মনের জাগ্রত অংশে রাণীর আগমনের সংবাদ গৃহীত হ'লো। ছুটে গেলো তার ঘুম; তড়াক করে' বিছানা থেকে সে নেমে পড়লো।

পাশের ঘরে—তার মা-র ঘরে—মালতী আর রাণী বসে' মৃদুস্বরে গল্প করছিলো। অন্য মেয়েটি রাণী না হ'য়ে যায় না, সুতরাং সে রাণী: না-হয়, অশান্ত তাকে ঠিক চিনতে পেরেছিলো, বলা যায় না। প্রথম-টায়, রাণী বলে' যাকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তাকে দেখে সে রীতিমত চমকে উঠেছিলো: তার যে-ছবি অশান্তর মনে ছিলো, তার সঙ্গে তা যেন কিছুই মেলে না। কিন্তু এর আগে অশান্ত তাকে কতটুকুই বা দেখেছে

পরস্পর

—হাওড়া ষ্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বই তো নয়। আর, তখন তার মুখে আঠারো ঘণ্টা রেল-ভ্রমণের ক্লান্তি; প্ল্যাটফর্মের আলো ধূসর, জনতার পশ্চাৎপট একটা কলঙ্ক-লেখা। রাত্রির ঘুমের পর উজ্জীবিত, রাণী এইমাত্র এসেছে স্নান করে'; ঘরটি পূব দিকের এবং সকালের আলোয় হাস্যময়। অশান্ত তার মুখের দিকে তাকালো: এখনো, তাকে ফর্সা বলে' ভুল হয়, কিন্তু তার নরম, উষ্ণ গাত্রবর্ণের দীপ্তি এমন-একটা জিনিস, স্পর্শের মত যা শরীরে এসে লাগে, একটু তাকিয়ে থাকলে মাংসের মধ্যে যাকে অনুভব করা যায়।

আর অশান্তর নিজেকে আকর্ষিত বোধ হ'লো—এক অদ্ভুত, এক আশ্চর্য্যভাবে। সেই যৌন আকর্ষণ—হ্যাঁ, তা তো বটেই। যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে আমরা আজকাল সবাই সব জেনে ফেলেছি; তাতে আর কোনো বিস্ময় নেই, রহস্য নেই, বিজ্ঞানের সব নির্ভুল তীরক্ষেপ তাকে ঝাঁজরা করে' দিয়েছে, তার সব জারিজুরি আমরা ধরে' ফেলেছি। সেই পুরোনো, সেই ক্লান্তিকর অথচ অপরাজেয় যৌন আকর্ষণ—যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো সময়ে বাসনার কণ্ডূয়ন-উদ্রেক, আমাদের সব আকস্মিক, প্রস্তুতিহীন, মুহূর্ত্ত-পরে বিস্মৃত সঙ্গমক্রিয়া—আমাদের ধৈর্য্য-হীনতা, অপেক্ষা করতে অস্বীকার করা, শান্ত, অনুত্তেজিতভাবে মুহূর্ত্তের মধু-লুণ্ঠন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব আমরা জেনেছি, ও-ব্যাপারে যা-কিছু জানবার আছে। এ-ই তো বৈজ্ঞানিক মনোভাব, এ-ই তো ফ্রয়েড। জয় হোক ফ্রয়েডের—যতক্ষণ আমরা নোঙরামিতে গড়াগড়ি খেতে পারি, যতক্ষণ আমরা মুহূর্ত্তের এবং মুহূর্ত্ত-পরে বিস্মৃত সব সঙ্গমক্রিয়া পরিচালিত করতে পারি—পরে আর মনে না-রাখবার, মনে পড়লে একটু লজ্জিত হবার, আমাদের নোঙরা, ছোটখাট, বিজ্ঞান-অনুমোদিত, ছাগ-অনুরূপ সব সঙ্গমক্রিয়া। জয় হোক আমাদের, আমাদের মনে আর কোনো

কুসংস্কার, কোনো কৃত্রিম বাধা নেই, বর্ব্বরের মত আমরা বিচার করিনে, নির্ব্বাচন করিনে, অপেক্ষা করে’ সময় নষ্ট করিনে! আমাদের নিষ্কণ্টক, সুসভ্য যৌনক্রিয়া—একটু গোপন, একটু লজ্জাকর—কিন্তু নিরাপদ, কী মধুরভাবে আরামের!—নোঙরামি, তার জয় হোক।

কিন্তু নিছক যৌন আকর্ষণের চাইতে তা একটু বেশি, অশান্ত যা অনুভব করলো, তা একটু আলাদা। তার মন সমীপতা চাইছিলো না; কোনো কৌতূহল—অনেক সময় কামনার যা প্রথম অবস্থা—তাকে চঞ্চল করে’ তুলছিলো না। শুধু, রাণীর উপস্থিতি-সম্বন্ধে একটা অর্দ্ধ-সচেতন, অবিস্মরণীয় জ্ঞান; রক্তের মধ্যে একটা অনির্ণেয়, সংজ্ঞাতীত সহানুভূতি। প্রকৃত অর্থে তা আকর্ষণই নয়; তা টানে না, চাঁদ যে-ভাবে সমুদ্রকে টানে। বেশ বুঝতে পারছি, আকাশে কোথাও চাঁদ উঠেছে, বাইরে তাকিয়ে অস্পষ্ট আলো দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু ঘরের মধ্যে যেখানে বসে’ আছি, সেখান থেকে চাঁদ দেখা যায় না। দেখবার আমি চেষ্টাও করিনে, চুপচাপ ঘরের অন্ধকারে বসে’ থাকি; কোনোখানে চাঁদ আছে, সমস্ত সত্তায় এই অনুভব, এবং আমার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। চাঁদ যে উঠেছে, তা জানতে পেরেছি, এবং এর বেশি কিছু চাইনে। অনেকটা এই রকম, রাণীর সম্পর্কে অশান্ত যা অনুভব করলো। তার আত্ম-সম্পূর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে সে চায় না; রাণীকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য নিজেকে সে বাড়িয়ে দেবে না; নিষ্ক্রিয়, তার চেতনার গভীরতায় সেই অবিস্মরণীয় জ্ঞান—এবং তার বেশি কিছু নয়।

‘আমার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছো নাকি?’ অশান্ত মালতীকে সম্বোধন করলে, ‘চা খাওনি এখনো?’ তারপর রাণীকে কিছু বলা দরকার মনে করে’ ইংরিজি ধরণে ভদ্রতা করলে, ‘আপনার ভালো ঘুম হয়েছিলো, আশা করি?’

'খুব।'

'আপনি ঢের রাতে আপিস থেকে ফেরেন বুঝি?' চায়ে বসে' রাণী জিজ্ঞেস করলে।

'বারোটা হয়।'

'এতে আপনার অসুবিধে লাগে না?'

'সয়ে' যায়।'

'অত রাত অবধি কাজ করা—আমি তো ভাবতেও পারিনে।'

'কিন্তু আমাদের সভ্যতা চলা চাই। খবরের কাগজের নাইট-এডিটরদের কথা ভাবুন। আপনার সকালবেলার চায়ের সঙ্গে পৃথিবীর সব খবর পরিবেষিত হবে, সে-জন্য কত লোককে জীবন ভরে' সারা রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। এ-ই তো সভ্যতা।'

'এবং সেই কাগজ পড়বার বিদ্যা যাতে সব লোকের হ'তে পারে', মালতী বললে, 'সে-জন্য বৃহৎভাবে চলছে অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা। সে-জন্যই, রাণী, তুমি আজ এখানে।'

'তারপর', তার নিজের কথার জের টেনে অশান্ত বললে, 'কারখানার নাইট-শিফ্‌ট্ তো রয়েইছে। সহরে মুহূর্ত্তের জন্য ইলেকট্রিসিটি কি টেলিফোন থামতে পারবে না। আমি যখন শুতে যাই, কর্পোরেশনের লোক আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় জল দিয়ে যায়। আমরা যখন ঘুমুচ্ছি, সমস্ত ভারতবর্ষ ভরে' দিগ্বিদিকে মেইল-ট্রেন ছুটছে। এ-সমস্ত অনিয়ম—আধুনিক সভ্যতায় তা-ই নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক সাহায্যই সভ্যতার ভিত্তি।'

'কিন্তু আমরা', মালতী প্রশ্ন করলে, 'আমরা কী করছি—উপরে বসে' অন্যের সেবা গ্রহণ করা ছাড়া?'

'কিন্তু তা-ই যে আমাদের কাজ। দৈবাৎ আমরা উপরে জন্মেছি—

আর উপরেই আমরা থাকবো—যতক্ষণ সম্ভব এবং যে-ভাবেই হোক্। অসংখ্য লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফল ভোগ করবার জন্য আছি আমরা—আর তার জন্য জেনে কি না-জেনে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি। উপরের দিকে যদি টিঁকে থাকতে না-পারো—তোমার পক্ষে ব্যাপারটা মোটেও আরামের হবে না। সুতরাং সাবধান।'

'সাবধান হবার কিছু নেই', মালতী বললে। 'সভ্যতার শো-কেইসে আমরা হচ্ছি ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল পণ্য ; আমরা হচ্ছি অলঙ্কার। আর্ট আর সৌন্দর্য্য। আমাদেরকে ওরা ফেলতে পারবে না।'

'যদি বা ফেলতে চায়', অশান্ত হাসলো, 'নিজের সমর্থনে আমার অন্তত এটুকু বলবার থাকবে যে গ্রেট ইণ্ডিয়ার জন্য চীন-জাপানের যুদ্ধ আর আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীনতম পার্লিমেণ্ট সম্বন্ধে প্যারাগ্রাফ লিখে আমি সভ্যতাকে সাহায্য করেছি।'

'আর কতগুলো মেয়ের যাতে আপনার প্যারাগ্রাফগুলো পড়বার মত বিদ্যে হ'তে পারে', রাণী বললে, 'সেইজন্য সভ্যতার রক্ষকরা আমাকে নিয়োজিত করেছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আমি অন্তত আপত্তি করতে পারছিনে।'

'হ্যাঁ, নিজেকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রয়োজনীয় করা ভালো।' অশান্ত আর রাণী একসঙ্গে হেসে উঠলো। কিন্তু মালতী ওদের কৌতুকে যোগ দিতে পারলে না। 'নিজেকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রয়োজনীয় করা ভালো।' অশান্ত হাসলো বটে ; কিন্তু ঠিক কথাই তো, তা-ই তো ভালো। একটা নিষ্ফলতার চেতনা মালতীকে প্রায়ই পীড়ন করতো, পরিহাস-ছলে বলা দাদার কথায় সেটা তার মনে তীব্র, কষ্টকররূপে জেগে উঠলো। সে কী করছে, সে তার জীবন নিয়ে কী করছে? সে শুধু একটা বোঝা ; সুন্দর, পরাশ্রিত একটা লতা। এর শূন্যতা, তার জন্য

দাদার, মা-র ভালোবাসার, উৎকণ্ঠার অসহনীয়তা! শুধু অন্যের ভালো-বাসার, উৎকণ্ঠার পাত্র হ'য়ে জীবন কাটানো—কী ভয়ানক! তার কোনো অভাব নেই, কোনো কষ্ট নেই, এবং সেটাই সব চেয়ে খারাপ। নিশ্চিন্ত, সুখী, রুদ্ধতার প্রশান্তিতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে বন্ধ্যা, সে নিষ্ফল। অন্যের ভালোবাসা অদৃশ্য দেয়ালের মত চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে। যে-কোনো উপায়ে সে যদি পালিয়ে যেতে পারতো, ভেঙে ফেলতে পারতো এই দেয়াল—যদি সে হ'তে পারতো, করতে পারতো! তার মনের মধ্যে চাপা বিদ্রোহ গুমরে মরে। 'নিজেকে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রয়োজনীয় করা ভালো।' তাই তো রাণী আজ কলকাতায়। রাণীকে দেখে, রাণীর সবল, স্বচ্ছন্দ আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে অজ্ঞাতে নিজের তুলনা করে' তার নিষ্ফলতার চেতনা আরো বেশি প্রখর হ'য়ে উঠেছিলো। সে যদি হ'তে পারতো, যদি হ'তে পারতো! কিন্তু বাধা অনেক ; সব চেয়ে বড় বাধা তার মা-র, তার দাদার ভালোবাসা। বাইরে থেকে দেখতে গেলে সে মুক্ত ; আইনের চোখে সে বয়ঃপ্রাপ্ত ; তার কোনো আইনসঙ্গত ইচ্ছায় কি আচরণে কেউ বাধা দিতে আসবে না। সরকারিভাবে, তার যা খুসি, তা-ই সে করতে পারে। কিন্তু সেই ভালোবাসার অদৃশ্য দেয়াল তাকে চেপে ধরে, তাকে রাখে কোণঠাসা করে', নিষ্কাষিত করে' নেয় তার জীবন। শুধু যদি তার কোনো কাজ করবার থাকতো। কিন্তু কোনো কাজই তার করবার উপযুক্ত নয়, কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মায়নি। সে সভ্যতার শো-কেইসে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল আভরণ, কিন্তু সত্যিকারের কোনো ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কাজের জন্য যে-জন্মগত প্রতিভা দরকার, তা তার নেই। এমন কি, ইস্কুলে পড়াবার যোগ্যতাও তার নেই ; সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেনি। বাবা যখন মারা যান, সে তখনো ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়নি ; এবং

তার পরে এমন ঘটলো যে তাকে আর ইস্কুলে পাঠানো হ'লো না; নিজের ইচ্ছে-মত, আত্ম-পরিচালিত, এলোমেলো পড়াশুনো করতে-করতে সে বড় হ'লো। শিশু-পাঠ্য বই সে বলতে গেলে কখনো পড়েনি; বাবার আলমারিতে যে-সব বই ছিলো—বিষবৃক্ষ আর সধবার একাদশী, টম জোন্স, ডন্-এর সার্মন্স, ইংরিজি তর্জমায় মাদ্‌মোয়াজেল ছ মোপ্যাঁ, হ্যামলেট আর টুয়েল্‌ফ্‌স্ নাইট, বাঁধানো জন্মভূমি আর পুরোনো প্রবাসী—এই-সব পড়বার চেষ্টা করে', না-বুঝে পড়ে', এবং শেষটায় পড়তে-পড়তে অস্পষ্টভাবে এবং অনেক জায়গাতেই ভুল বুঝে সে সেই বয়েস কাটালো, যে-বয়েসে আমরা রামায়ণের, পশুপাখির, পরী-দানোব গল্প পড়ি আর আর্কিমিডিস নিউটন এডিসনের গল্প। ফলে তার মন অকালে পরিণত হ'লো; তথাকথিত 'ভালোবাসা' সম্বন্ধে সব তথ্য বাল্যকালেই সে জেনে ফেললো। এবং তারই ফলে বয়ঃসন্ধির সঙ্কটময় সময়টা সে একেবারে নিরাপদে উৎরোলো, 'ভালোবাসা' সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল নেই—সবই সে জানে; ভায়োলার আর হ্যামলেটের মুখ থেকে, মাদ্‌মোয়াজেল ছ মোপ্যাঁর স্বীকারোক্তিতে, বজ্র-স্বরে উচ্চারিত ডন্-এর উপদেশ-বাণী থেকে টুক্‌রো-টুক্‌রোভাবে (কিন্তু তাই বলে' কিছু কম নির্ভুলভাবে নয়) 'ভালোবাসা'-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ সে সংগ্রহ করেছে। প্রথম যৌবনেও, তাই, ও-সব ব্যাপার তাকে আর আকর্ষণ করলো না; একটু দূর, একটু বিচ্ছিন্ন, শীতস্বভাব, সে যৌবনে প্রবেশ করলে। সে 'হ'তে' চায়; কিন্তু 'হবার' এই প্রথম সুযোগ সে নিতে পারলে না। দ্বিতীয় সুযোগ এসেছিলো ১৯৩০-এর জাতীয়তা আন্দোলনের সঙ্গে; লবণ উপলক্ষ করে' গান্ধি যখন তাঁর নিরস্ত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় এবং দারুণতরো স্তরে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় মালতীর বয়েস ছিলো দশ; স্বাদেশিকতার

দুর্ব্বার উচ্ছ্বাসে সে প্রতিজ্ঞা করলে খদ্দর ছাড়া কিছু স্পর্শ করবে না। কিন্তু খদ্দর মোটা, খদ্দর পরে' থাকা কষ্টকর, খদ্দর দেখতে সুন্দর নয়। কয়েকমাস পরেই সে ফিরে এলো তার সিল্কের ফ্রকে—দেখতে যা সুন্দর, ছুঁতে যা নরম। এখন পর্য্যন্ত, ভালো কাপড়-চোপড়ের প্রতি দুর্ব্বলতা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি; মিলের চাইতে তাঁতের সাড়ি পরতে পারলেই সে খুসি হয়। ঢেউয়ের পরে ঢেউ, ক্ষুব্ধ দেশ উত্তেজনার সংঘাতে ফেনিল হ'য়ে উঠলো: চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টরি ছাড়লেন, চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন, তাঁর দেহ নিয়ে সেই অতুলনীয় জনযাত্রা মালতী নিজ চোখে দেখলো। কিন্তু তার দশ বছর বয়েসের সেই উন্মাদনা আর ফিরে এলো না; কী যেন, কিছুই তাকে সে-রকমভাবে স্পর্শ করছে না। না করুক—মনে-মনে সে বললে—স্বধর্ম্মে নিধনো শ্রেয়ঃ। কিন্তু কী তার স্বধর্ম্ম—কিসের জন্য সে? পরাশ্রিত লতা, সে জানে না, সে কিসের জন্য। নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে শুধু নিষ্ফলতার চেতনা আরো উৎপীড়ক, আরো অসহ্য হ'য়ে উঠে। বিশেষ-কোনো কাজের জন্য সে উদ্দিষ্ট নয়, বাইরের কোনো প্রভাবও তাকে টেনে নিতে পারে না; সে দূর, সে বিচ্ছিন্ন। 'ভালোবাসা' সম্বন্ধে যেমন, স্বাদেশিকতা সম্বন্ধেও তার চেয়ে কম নয়। তা-ই দেখা গেলো। ১৯৩০-এ বিরল সুযোগ এসেছিলো, সুখী নিশ্চিন্ততার অবরুদ্ধ আবহাওয়া থেকে ছুটে পালাবার, সুযোগ এসেছিলো 'হবার'। সে নিশ্চেতন ছিলো না, সে তা বুঝতে পেরেছিলো। তারই পরিচিত কত মেয়ে প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড়লো, আইন-ভঙ্গ করে' জেলে গেলো, দু'একজনকে অর্ডিন্যান্সেও ধরলো। সে লক্ষ্য করলো, সে ভাবলো, মনে-মনে সে সন্দেহ করলো, তর্ক করলো। কী লাভ? এ-সব হৈ-চৈ করে' কী লাভ? আর কারো না হোক্, তার নিজের অন্তত লাভ হ'তো—অদৃশ্য দেয়ালের

পরিবেষ্টন থেকে যে-কোনো মুক্তি, যে-কোনো পরিবর্ত্তন—তা-ই লাভ। উপলক্ষটায় কিছুই এসে যায় না, যতক্ষণ সে বাঁচতো, সে 'হ'তে' পারতো। আর, সেটাই তো আসল। কিন্তু নিছক উত্তেজনার স্রোতে ভেসে যাবার চরম স্থূলভতা, জেলে যেতে হবার গ্লানি, অবমাননা, শারীরিক কষ্ট, সাধারণ উন্মত্ত জনসঙ্ঘ থেকে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়া—না, না, তা অসম্ভব। তবু—সে যদি কিছু করতে পারতো! কিন্তু কী করে' কিছু করা যায়, যখন, যা-কিছু করতে যাবে, তা-ই এমন অকহনীয়রূপে শস্তা, সাধারণ, এবং কিছু করতে গেলেই জেলে ধরে' নিয়ে যাবে? না, না, মালতী যতক্ষণ মনে-মনে বিচার করলো, সময় গেলো কেটে। যেখানে ছিলো, সেইখানেই সে রয়ে' গেলো। এর পর? এর পর কী? কী আর, কোনো পুরুষ আসবে ভালোবাসা নিয়ে, এসে বলবে, 'আমাকে বিয়ে করো।' ভাবতেই মালতীর আতঙ্কের মত হয়—কিন্তু এ ছাড়া, এর বেশি তার ভবিষ্যৎ আর কী-ই বা হ'তে পারে? সে হবে তার মা-র দাদার আনন্দের দিন। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' ঈশ্বর, ঈশ্বর, আরো ভালোবাসা থেকে সে যেন রক্ষা পায়। এমনিতেই, সে যথেষ্ট ভালোবাসা পাচ্ছে, যথেষ্টরও বেশি। ভালোবাসায় সে রীতিমত মরে' যাচ্ছে। এর উপরে, কেউ এসে তাকে মিঠে কথা বলবে, গায়ে হাত বুলোবে—সে যেন একটা পোষা বেড়াল, লক্ষ্মী মিনি, যার সঙ্গে খেলা করে' দস্তুরমত আধঘণ্টা সময় নষ্ট করা যায়। না, না, ওতে তার দরকার নেই। ভাবতেও যেন সে ক্ষীণ হুঙ্কার অনুভব করে।

'শুধু ভালো হ'লে অতটা এসে যেতো না', রাণী বলছিলো, 'কিন্তু তার উপর, সেটা লাভকর। আপনি সে-জন্য পয়সা পান্।'

'কিন্তু কত কষ্টে! আপনার কাজ আপনার ভালো লাগবে, মনে হয়?'

'আশা তো করি।'

'কিন্তু, সত্যি বলতে, কাজ কি কারো ভালো লাগতে পারে? অন্তত, পয়সার জন্য যে-কাজ করতে হয়? বই পড়ে' আর গল্প করে' সময় কাটাতে পারলে আমরা কে না খুসি হই?'

'তুমি বই পড়বে তো?' মালতী বললে। 'কিন্তু একখানা বই তৈরি করতে লেখক থেকে দপ্তরি পর্য্যন্ত কত লোককে কাজ করতে হয়, ভেবে ছাখো। ছাপাখানার সরঞ্জাম, কাগজের, কাপড়ের মিল—'

'জানি, জানি। ওরা সবাই কাজ করছে, করুক; আমাকে কেন করতে হবে?'

'ঠিক কথা', রাণী বললে। 'আমাকে কেন করতে হবে? আমরা সবাই তা-ই মনে করি। কিন্তু আপাতত তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, মনে-মনে কাজের মহিমাই জল্পনা করা যাক। স্মাইল্‌স্ আর হেন্‌রি ফোর্ড। আপাতত আমাকে যখন ইস্কুলের কাজে যেতেই হচ্ছে—'

'আজকেই যাচ্ছেন, শুনলাম?' আলাপটা ব্যক্তিগত স্তরে নেমে পড়লো।

'হ্যাঁ, আজকেই।'

তারপর খানিকক্ষণ সাংসারিক আলাপ হ'লো: কলকাতায় থাকবার কী-কী সুবিধে, ভারতবর্ষের অন্য যে-কোনো বড় সহরের চাইতে কলকাতা যে অনেক শস্তা, কোথায় কী জিনিস কিনতে পাওয়া যায়—এই-সব। কথায়-কথায় রাণী বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, কলকাতা আমার খুব ভালো লাগবে।'

'শুনে খুসি হ'লাম', অশান্ত বললে।

চা শেষ হ'লো, বেলা বাড়লো। কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে বলে' রাণী উঠে গেলো। সারাদিন আর বিশেষ-কোনো কথাবার্ত্তা হ'লো

না। বিকেলের দিকে রাণী যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ; বাসন্তী বললেন, 'শনিবার চলে' আসিস কিন্তু।'

'আসবো বই কি, মাসীমা ; সুবিধে করতে পারলে, আগেই আসবো।'

'তোর যখন যা দরকার—আমরা আছি, মনে রাখিস।'

'হ্যাঁ', রাণী একটু হাসলো, 'আপনারা আছেন বলে'ই তো মা এখানে আসতে দিলেন।'

'আশ্চর্য্য!' ট্যাক্সিতে উঠে অশান্ত বললে।

'কী ?'

কথাটা অশান্ত অনেকটা নিজের মনে বলেছিলো ; রাণীর শোনবার জন্য তা উদ্দিষ্ট ছিলো না। সে যখন শুনেই ফেললো, তখন তার না-বলে' উপায় রইলো না : 'এতদিনের কথা মানুষ মনে করে' রাখে !'

'বাস্তবিক', রাণী বললে, 'আমার কাছেও এটা আশ্চর্য্য লেগেছে।'

'সেই কবেকার আলাপ—এখন পর্য্যন্ত—'

ঈষৎ মাথা নেড়ে রাণী হাসলো। অদ্ভুত তার সেই ক্ষীণ, পলাতক হাসি, হঠাৎ সমস্ত মুখের আলো হ'য়ে ওঠা—ভিতর থেকে কেউ যেন একটা সুইচ টিপে দিলে। সেই কবেকার আলাপ—সেও ভাবছিলো, অথচ যৌবনকালের সেই সখীর উপর এখনো তার মা-র কী আস্থা ! 'তোর কোনো ভাবনা নেই, বাসন্তী ওখানে আছে।' যেন বাসন্তীর সঙ্গে দু'দিন আগে তাঁর দেখা হয়েছে। মানুষ যতই বুড়ো হ'য়ে আসে, তার ভবিষ্যৎ যতই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসতে থাকে, ততই সে স্মৃতির উপর নির্ভর করে, স্মৃতিগুলো তার মনে ততই জীবন্ত, ততই বাস্তব হ'য়ে উঠতে থাকে। স্মৃতিতে কালক্ষেপের চেতনা অস্পষ্ট হ'য়ে যায় ; দূরের জিনিস মনে হয় কাছে, সময়ের দীর্ঘতা কোনো মানসিক রসায়নের ফলে খর্ব্ব হ'য়ে দেখা যায়, জলের ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন

গেলাসের তলায় অবস্থিত কোনো জিনিস কাছে উঠে আসে, ছবিতে যেমন সামনের দিকে বিস্তৃত জিনিস পুরঃসংক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে। কুড়ি বছর আগে যা ঘটেছিলো, মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। তার মা-র মনে হয়-তো কুড়ি বছর আগেকার সেই বাসন্তীর ছবিই রয়েছে, সেই—মাসীমা তখন কেমন ছিলেন দেখতে? কল্পনা করা শক্ত। এখন যদি তিনি বাসন্তীকে দেখেন—ধূসরকেশ এই প্রৌঢ় মহিলাকে—তিনি কি তা'হলে চমকে উঠবেন না? আর, তাঁর দিক থেকে মাসীমাও···অদ্ভুত, অদ্ভুত লাগে ভাবতে।

রাণীর যেখানে থাকা ঠিক হয়েছিলো, গড়পারে তার ইস্কুলের কাছেই গলির মধ্যে দোতলা এক বাড়ি। ঠিক হস্‌টেল নয়; ইস্কুলের কয়েকজন মাষ্টারনি মিলে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষই তার থাকবার এই ব্যবস্থা করে' দিয়েছিলেন, তার ঘর প্রস্তুত ছিলো। নিচে একটি বসবার ঘর গোছের; সেখানে পুরুষ-বন্ধু কি আত্মীয়কে আপ্যায়ন করা যায়। সেই ঘরে অশান্ত অপেক্ষা করলো, রাণী যতক্ষণ উপরে গেলো চাকরের হাতে তার জিনিসপত্র দিয়ে।

'কেমন ঘর আপনার?'

'আছে একরকম।'

'আর সঙ্গীরা?'

'এখনই কী করে' বলি? একজনের সঙ্গে মোটে দেখা হ'লো—তাকে তো বেশ ভালোই মনে হ'লো।'

অশান্ত একবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে মন্তব্য করলে, 'বাড়িটির যা হোক দক্ষিণ খোলা; হাওয়া পবেন।

রাণী বললে, 'হুঁ।'

আলাপ জমছিলো না; এই অপরিচিত, চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার

সম্বলিত ঘরে দু'জনেরই কেমন আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত লাগছিলো। শিক্ষয়িত্রী-নিবাসের বসবার ঘর একজনের সঙ্গে আলাপ করবার জায়গা নিশ্চয়ই নয়। তাহ'লে দন্তচিকিৎসকের অপেক্ষাগৃহে বসে' গল্প করবার কথাও ভাবা যায়।

অশান্ত উঠে দাঁড়ালো।—'শনিবার আসছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। আপনিও মাঝখানে একবার আসতে পারেন ইচ্ছে করলে।"

'আচ্ছা—চেষ্টা করবো। আপনার সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? কোনো দরকার নেই?'

'না।'

রাণী তা-ই বললে বটে, কিন্তু অশান্ত চলে' যাবার পর উপরে তার ঘরে গিয়ে জিনিস গোছাতে বসে' দেখলো, তার দরকার অনেক জিনিসেই। এমন অনেক জিনিস আছে, যাতে আমরা এত অভ্যস্ত যে তাদের অস্তিত্ব আমরা চিন্তাহীনভাবে ধরে' নিই, তাদের অভাব কখনো কল্পনা করতে পারিনে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য কত তুচ্ছ, ছোটখাটো জিনিসে যে আমাদের অনিবার্য্য প্রয়োজন, তা একবার নতুন কোনো ঘরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না-করলে বোঝা যায় না। জলের জন্য একটি কুঁজো ও গেলাস অবিলম্বে চাই; জামা-কাপড় রাখবার কোনো ব্যবস্থা নেই, একটা ব্র্যাকেট কি কিছু কিনতে হবে। চেয়ারটা বড় শক্ত, একটা কুশান হ'লে ভালো হয়। একটা বিছানার ঢাকনা আনতে মনে নেই—ভয়ানক ভুল হ'য়ে গেছে। অ্যাটাশে-কেইস খুলে দেখা গেলো, ঠিক সময় বুঝে সাবান ফুরিয়েছে। এখন কী করবে, কোন্ অভাবের প্রতিকার আগে করবে, রাণী বুঝে উঠতে পারলো না। সেই এলোমেলো, সহানুভূতিহীন,

ব্যক্তিত্বের পরিবেষ্টনী-বর্জ্জিত ঘরে চুপচাপ সে বসে' রইলো। এতক্ষণে নিজেকে তার একা মনে হ'তে লাগলো। লক্ষ্ণৌ ছাড়বার পর থেকে এ-পর্য্যন্ত সত্যি-সত্যি তার মন কখনো খারাপ হয়নি; অন্তত, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক জীবনকে আবিষ্কার করতে যাচ্ছে, এই উত্তেজনায় তা টের পায়নি। একটু আগেও ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে—গতির প্রভাবেই বোধ হয়—নিজেকে তার অত্যন্ত প্রফুল্ল, সাহসী মনে হচ্ছিলো; কিন্তু দপ্ করে' সব আলো গেছে নিবে, এখন তার একা লাগছে, মা-কে তার মনে পড়ছে। মা-কে ছেড়ে সে তো সত্যি কখনো থাকেনি; এই বাড়িটার মধ্যেই যেন একটা অশুভত্ব, ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকেই, এখন সে ভেবে দেখলো, তার মন-খারাপ হ'য়ে গেছে। তার ঘরের সন্ত-চুনকাম-করা, নগ্ন, কঠিন-সাদা দেয়ালগুলো যেন শূন্যতার দৃশ্যমান ছবি। ছোট একটি লোহার খাট, জানলার ধারে ছোট একটি টেবিল—যে-চেয়ারে বসে' আছে, তা ছাড়া এ-ই হচ্ছে ঘরের আসবাব। চেয়ারটা শুধু যে শক্ত, তা নয়; তার উপর অত্যন্ত পাৎলা, এবং দু'এক জায়গায় ভাঙা। সবই যেন তার মনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখছে। (এমনি আমরা ভাবি, আসলে যখন বাইরের জিনিসের মধ্যে নিজের মানসিক অবস্থারই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই।) অশান্তদের ওখানে যতক্ষণ ছিলো, সে আশা করেছিলো, সবই তার ভালো লাগবে; ততক্ষণ, এখন সে বুঝতে পারলো, তার সত্যি ভালো লেগেওছে। ওদের কাউকে সে আগে কখনো দেখেনি; কিন্তু ওদের সম্বন্ধে তার মনে একটা পশ্চাৎপট তৈরি হ'য়ে ছিলো, ওদের মধ্যে নিজেকে তার হারানো মনে হয়নি, এখন যেমন হচ্ছে। ভুল হ'য়ে গেলো—অশান্তর কাছ থেকে একটা বই চেয়ে আনলে হ'তো, পড়ে' তবু সময় কাটতো। তার নিঃসঙ্গতার চেতনা ক্রমেই

প্রখর হ'য়ে উঠছে। বাইরে একটা গাব গাছের বড়-বড় পাতায় বিকেলের আলো এসে পড়েছে। কালকের বিকেলের কথা তার মনে পড়লো, ষ্টেশন থেকে আসতে-আসতে অপর্য্যাপ্ত-আকাশময় সেই অন্তহীন দীপ্তি। একভাবে বসে'-বসে' সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, চেয়ারের পিছনে হেলান দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটলো। আর-একটু হ'লেই সে চেয়ারসুদ্ধ মেঝেয় চিৎ হ'য়ে পড়ছিলো, প্রবৃত্তিগত আত্মরক্ষার চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে সামনের টেবিলটা ধরে' ফেলে টাল সামলে নিলে। কী আপদ! চেয়ারের পিছনটা একেবারে আলগা। শান্তিতে একটু বসাও যাবে না, দেখছি। চাকর ডাকিয়ে সে তাকে কুঁজো আর গেলাস আনতে দিলে। পাশের ঘরের মেয়েটি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো; তার কাছে সন্ধান নিলে, কী করে' এখন একটু চা পাওয়া যেতে পারে।

* * *

'আপনাকে ডাকছে।' টেলিফোন নামিয়ে রেখে স্পোর্টিং এডিটর অশান্তর দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে' হাসলো।

'আমাকে?' অশান্ত একটু বিস্মিত হ'লো। টেলিফোনে, সাধারণত, কেউ তাকে ডাকে না। বাড়িতে কি হঠাৎ কোনো বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়লো, মালতী হয়-তো নিকটবর্ত্তী সুবোধবাবুর বাড়ি থেকে তাকে ফোন করেছে? না কি রাণী…? হাত বাড়িয়ে সে চোঙটা তুলে নিলে।

'হ্যালো?'

'আপনি অশান্তবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'তবু ভালো আপনাকে পাওয়া গেলো। খুব ব্যস্ত? একটু সময় নষ্ট করতে পারি? আমি লতা—লতা সমদ্দার—'

'তা বুঝতে পেরেছি।'

'কেন আপনি আজকাল আর আমাদের এখানে আসেন না?'

'হ'য়ে ওঠে না—এই আর কি।'

'কিন্তু ইচ্ছে থাকলে সবই যে হ'য়ে ওঠে। স্বীকার করুন, আমাদের সঙ্গ আপনার ভালো লাগে না।'

'কী আশ্চর্য্য—' অশান্ত যত্ন নিলে কণ্ঠস্বরে প্রতিবাদ পরিস্ফুট করে' তুলতে।

'স্বীকার করুন, আপনি ক্লান্ত হন্, বিরক্ত হন্। কিন্তু কেন? কেন?'

'কিন্তু—'

'থাক্। শুনুন। বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন?'

'কী ব্যাপার?'

'আজকে হঠাৎ আমি একেবারে একা। বন্ধুরা সবাই আমাকে পরিত্যাগ করেছে। চৈত্র মাসের একটা সন্ধ্যা একা কাটানো—কী ভয়ানক! ভয়ানক, ভয়ানক ব্যাপর, যখন আপনার একা-একা লাগে। আপনি তখন কী করেন?'

'কী করি? কিছুই করিনে, বোধ হয়। যে-কোনো অবস্থায় একটা মস্ত আশ্বাস এই যে সময় কেটে যাবেই।'

'কিন্তু সময় যে কাটে না, কাটতে চায় না। বইয়ের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে মরে' গেলাম। যা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে, তা হচ্ছে একা থাকা। বিশেষ, চৈত্র-মাসের এই সন্ধ্যায়—ভাবা যায় না। বাগানে রজনীগন্ধা ফুটেছে—এখানে বসে' গন্ধ পাচ্ছি। অন্ধকার থেকে আমি আপনাকে ডাকছি—আমাকে উদ্ধার করবেন না?'

'কিন্তু এখন তো—'

'কিন্তু এখনই যে! এখন নয় তো কখন্? আপনি এক ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকলে কি কালকের কাগজ বেরুবে না?'

'দুঃখিত।' আজকে তার উপর ভার পড়েছে ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজ্ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সম্পাদকীয় লেখবার। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সেটা শেষ করে' দেয়া চাই : রোটারি যন্ত্র অসহিষ্ণু। 'আর-একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

'আর-একদিন? সে কবে? আজকের এই অসহ্য মুহূর্ত্ত অতিক্রম করে' কিছুতেই আর-একদিনের কথা ভাবতে পারছিনে।'

'কিছু মনে করবেন না; অত্যন্ত দুঃখিত।'

'জীবে দয়া করবার এমন সুযোগ আপনার জীবনে আর আসবে না। ফাঁকির উপর পুণ্য অর্জ্জন করতে পারতেন।'

'যদি পারতাম', অশান্ত চোঙের ভিতরে হেসে উঠলো, 'নিশ্চয়ই করতাম।'

'আমরা শুধু তা-ই করতে পারি, যা আমরা করতে চাই। যা হোক, এই অত্যন্ত উপভোগ্য আলাপের জন্য ধন্যবাদ। আপনার অন্ধকার দিনে আমাকে মনে করবেন।'

'শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ।'

অশান্ত টেলিফোনটা হুকের উপর ফিরিয়ে রাখলে। পাশের চেয়ার থেকে স্পোর্টিং এডিটর অত্যন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর টেবিলের গায়ে পায়ের ভর রেখে চেয়ারের সামনের দু' পা শূন্যে তুলে মৃদুভাবে দোলাতে-দোলাতে থিয়েটারি নাচের একটা সুর শিষ দিতে আরম্ভ করলো।

অশান্ত তার করাচি-ক্রয়ডন আকাশ-পথে ফিরে এলো। যেটুকু

লেখা হয়েছিলো, একবার পড়লো ; তারপর কলম তুলে নিয়ে লিখলো এক সেনটেন্স। লতা একা, হঠাৎ তার মনে পড়লো, লতা এখন একা। কাগজের মুখের উপর তিন আঙুলের মধ্যে ধৃত তার কলম অপেক্ষা করতে লাগলো। লতা একা বসে' এ-বই ও-বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে ; কিছুই তার ভালো লাগছে না, কিছুতেই তার সময় কাটছে না। 'বাগানে রজনীগন্ধা ফুটেছে, এখানে বসে' গন্ধ পাচ্ছি।' বাগানে অন্ধকার, চৈত্র-রাত্রি তারা-ছিটোনো, রজনীগন্ধা বাতাসকে দিচ্ছে মদির করে'। এই সন্ধ্যা কী করে' একা কাটানো যায় ? অশান্তর মনে ছবি ফুটে উঠলো ; তারাদের নিচে, অন্ধকারে লতার প্রেত-ম্লান মুখ ; নিঃশব্দ, আপাতত মাংসহীন একটা আকৃতি, সূক্ষ্মবিহারী লতার প্রেত-শরীর। রাত্রি উষ্ণ ; পরিষ্কার আকাশে তারাগুলো বড় আর উজ্জ্বল ; অন্ধকারে লতার কালো চুল আর নীল রঙের সাড়ি মিলিয়ে গেছে, শুধু তার মুখ—কোনো আশ্চর্য্য, অপরিচিত ফুলের মত তার মুখ অন্ধকারকে হানা দিচ্ছে। রাত্রির অন্তরে কোনো গূঢ় ক্ষতের রক্ত-লেখার মত তার ঠোঁট। রাত্রি মরে' যাচ্ছে : আর সময় নেই। কোনো গূঢ় ক্ষত-মুখ থেকে অবিশ্রান্ত রক্ত-ক্ষরণে প্রতি মুহূর্ত্তে রাত্রি মরে' যাচ্ছে ; এখনই মরতে আরম্ভ করেছে। 'অন্ধকার থেকে আমি আপনাকে ডাকছি।' অন্ধকার···। আর হঠাৎ লতাকে দেখবার একটা প্রবল, দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায় অশান্ত যেন পাগল হ'য়ে গেলো। তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত অবান্তরতা থেকে মুক্ত, অশান্তর মনে তীব্র স্পষ্টতায় লতার মূর্ত্তি ফুটে উঠলো ; নিজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ, সে বাঞ্ছনীয়, সে সুন্দর। কল্পনায় অশান্ত তার পাশে গিয়ে বসলো ; টাটকা রক্তের ফোঁটা যেন ঝরে' পড়তে-পড়তে হঠাৎ জমে' গেছে—এমনি তার কর্ণাভরণ।

'কাপি।' যন্ত্র-ঘর্ঘরিত নিচের তলা থেকে, নিম্নতম নরক থেকে

উত্থিত এক অশুভ দূতের মত আপিসের ছোকরা তার টেবিলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। 'কাপি।' অশান্তর বোধচিহ্নহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ছোকরা আবার বললে।

'যা, আর দশ মিনিট পরে আসিস্।' কলম তুলে নিয়ে অশান্ত দারুণ বেগে লিখতে আরম্ভ করলো। কী লিখলো, নিজেই ভালো করে' বুঝতে পারলে না। লতাকে তার দেখা চাই-ই ; যেমন করে' হোক্। তাকে শুধু দেখা—বাগানের সেই সুগন্ধি অন্ধকারে, তারা-উজ্জ্বল নির্জ্জনতায়। 'অন্ধকার থেকে আমি আপনাকে ডাকছি।' ঘণ্টাখানেক সে অনুপস্থিত থাকলে সত্যি কিছু এসে যাবে না। কত সময় তো এমনি বসে' থেকেই কাটাতে হয়। কাগজের উপর পাগলের মত ছুটলো তার কলম। দশ মিনিটের আগেই ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সে সম্পন্ন করে' ফেললো।

টেলিফোনের বই দেখে তাড়াতাড়ি সে লতার বাবার নাম বার করলে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে আবার লতার সঙ্গে কথা বলছিলো।

'অশান্তবাবু ? হ্যাঁ, বলুন।'

'কাজ শেষ হয়েছে—মানে, এখনকার মত। এখন—'

'আসতে পারেন ?'

'আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবো।'

'কী অদ্ভুত—ভাগ্য যখন দয়া করে, অজস্রভাবেই করে। একটু আগে বিকাশ এসে উপস্থিত।'

'কে ?'

'বিকাশ। ঈশ্বরের দূত হ'য়ে এসেছে আমাকে উদ্ধার করতে। ওর সঙ্গে এখন যাচ্ছি মেলিনিতে। ভালোই হ'লো—মাঝামাঝি জায়গায়

আপনার সঙ্গে দেখা হবে। বিকাশ বলছে, টুলটুলও আসবে, আর মৃণাল আর—'

'এখনই যাচ্ছেন ?'

'এক্ষুনি। বাড়ির ভিতরটা নরকের মত গরম।'

'কিন্তু মেলিনি কি আরো গরম নয় ?'

'কে জানে। ওখানে গেলে গরম ঠাণ্ডা লক্ষ্য করবার সময়ই থাকে না। আজ সন্ধেয় আর-একবার, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি বেঁচে গেলাম। আমার উপর ঈশ্বরের বিশেষ দৃষ্টির আর-একটা প্রমাণ পেয়ে উৎফুল্ল হচ্ছি। আপনিও আসছেন—চমৎকার !'

'আমার বোধ হয় যাওয়া হবে না।' শুষ্ক, নির্জীবস্বরে অশান্ত বললে।

'সে কী ?' লতা সত্যি-সত্যি অবাক হ'লো।

'না', অশান্ত শুধু বললে, 'না। মাপ করবেন।' বলে' টেলিফোন রেখে দিলে।

অশান্তর মনে হ'তে লাগলো, কেউ যেন তার গালে চড় মেরেছে। মনে-মনে বাগানের অন্ধকার আর আকাশের তারার ছবি দেখা—আর শেষ পর্য্যন্ত কিনা মেলিনির নরকের চেয়েও গরম ঘর, ইলেকট্রিক আলোয় সাড়ির আর চুলের ঝলসানি, সিগ্রেটের ধোঁয়া, কফির গন্ধ, সেই উন্মাদ কথা আর হাসাহাসি ! খুব জব্দ, এ-ই তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, তার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। লতার কাছে যাবার ইচ্ছে হওয়াই তার পক্ষে স্রেফ পাগলামি —আর তারার নিচে তাকে একা কল্পনা করা—খুব জব্দ, খুব জব্দ। সে মনে করতে পারলো না, জীবনে সে কখনো এতদূর অবমানিত হয়েছে। কাগজ টেনে নিয়ে সে প্যারাগ্রাফ লিখতে আরম্ভ করলো, 'Recrudescence of communal riot in the Punjab reminds us of...'

*   *   *

'তোমার বন্ধু কী অদ্ভুত ছেলে!' লতা বললে, 'নিজেই বললে, আসবে; আধ মিনিট পরে বললে, না। মাথা খারাপ নাকি?'

'কে অশান্ত?' বিকাশ অভ্যেসমত তার সর্ব্বব্যাপী, বিশ্বজয়ী হাসি হাসলো, কিন্তু ট্যাক্সির অন্ধকারে সেটা মারা গেলো, 'ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ।'

'কিন্তু ইণ্ট্রেসটিং, যা-ই বলো। মাঝে-মাঝে ওকে ধরে' আনতে পারো না?' প্রথমবার অশান্ত যে আসতে অস্বীকার করেছিলো, স্পষ্ট, নির্ভুল ভাষায় অস্বীকার করেছিলো, সে-জন্য লতার মনটা এখন পর্য্যন্ত একটু-একটু জ্বালা করছিলো। সবাই নির্ব্বিচারে তার ইচ্ছামত কাজ করে, তাতেই সে অভ্যস্ত, এটাই সাধারণ নিয়ম বলে' সে ধরে' নিয়েছে। এর ব্যতিক্রম হ'লে তার সহ্য হয় না। 'মাঝে-মাঝে ওকে ধরে' আনতে পারো না?'

'তোমার কাছে', গাড়িটা একটা মোড় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বিকাশ লতার আরো একটু কাছে সরে' এলো, 'তোমার কাছে যে কাউকে ধরে' আনবার দরকার হয়, লতা, সেটাই আশ্চর্য্য।' বিকাশ লতার কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করলো।

লতার মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত এক হাসি নির্গত হ'লো। আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কোনো মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলেই তাকে চুমো খাবার চেষ্টা করবার এই অভ্যেস ছাড়ো তো, বিকাশ! যে-হারে তুমি এগোচ্ছো, তাতে আর কিছুদিন পরে তোমার গায়ে DANGER লেবেল এঁটে দিতে হবে।'

যেন লতা তাকে মস্ত একটা স্তুতির কথা বলেছে, বিকাশ পরমানন্দে উচ্চহাসি করে' উঠলো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে আপিস থেকে ফিরে অশান্ত যখন খেতে বসলো, বাসন্তী তার ধরণ-ধারণে একটু অনভ্যস্ত অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করলেন। তার মুখের চেহারা অস্বাভাবিক, কেউ যেন ভিতর থেকে তার মুখ আঁকড়ে ধরেছে, যেন অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোর সামনে সে ভালো করে' তাকাতে পারছে না। দুই গ্রাসের মাঝখানে একটু থেমে সে—কী ভাবছিলো? বাসন্তীর পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়, এবং কিছু জিজ্ঞেস না-করবার মত সুবুদ্ধি তাঁর ছিলো। অশান্তর কথা বলবার জন্য তিনি খানিক অপেক্ষা করলেন; তারপর, অশান্ত যখন মাছের ঝোলে এসে পৌঁচেছে, 'রাণীর বোর্ডিং কেমন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

খাদ্যের উপর আনত তার দৃষ্টি অশান্ত মা-র দিকে তুললো। বাসন্তীকে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে হ'লো।

'বেশ ভালো—ভালোই তো মনে হ'লো।'

'ওখানে কোনো অসুবিধে হবে না ওর?'

'অসুবিধে আর কী হবে।' স্পষ্টত, অশান্ত এই প্রসঙ্গে উৎসাহ পাচ্ছিলো না।

তবু বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন—আর কোনো কারণ না থাক, শুধু অশান্তকে কথা বলাবার জন্য—'কিছু বললে ও?'

'শনিবার আসবে বললে।'

এর পর আর-কোনো কথা হ'লো না। নিঃশব্দে, যেমন-তেমন

করে অশান্ত খাওয়া সেরে উঠলো। লতার ব্যাপারটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলো না, থেকে-থেকে তা খোঁচা দিচ্ছিলো তাকে; আর নিজের কাছেই সে লজ্জায় মুমূর্ষু হ'য়ে পড়ছিলো। ভাবা যায় না, কখনো এ-রকম একটা ব্যাপার তার কখনো ঘটবে। এর অপার হাস্যরসকতা, এর অবমাননার লজ্জা! নিজের মনে, এ-রকম অবস্থায় সাধারণত যা হয়, ব্যাপারটাকে সে অনেক পল্লবিত, অতিরঞ্জিত করে দেখছিলো: বাস্তবের ক্ষীণ উপাদান থেকে তার কল্পনা সম্পূর্ণ একটা গল্প রচনা করছিলো; আর্টের খাতিরে যেখানে যে-খুঁটিনাটি দরকার, তা নিজের মন থেকে জুগিয়ে নিতে সে চেষ্টার ত্রুটি করছিলো না। টেলিফোনে লতার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছে, মনে-মনে সে বার-বার সে-সব আউড়ে গেছে, এবং প্রতিবার এর আগে অলক্ষিতে কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, তার শিল্প-রূপায়নের পক্ষে কোনো কারু বিন্যাস তার কাছে উপস্থাপিত হয়েছে—লতার কোনো কথায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ, তার কোনো প্রত্যুত্তরের তলহীন মূঢ়তা। কি বোকামি, কী অকারণ, অতুলনীয় বোকামি! স্বাভাবিকমাত্র, লতা যে তার উদ্দেশে হাসবে। লতা যে আগাগোড়াই তাকে ঠাট্টা করছিলো, একটু সময়ের মধ্যেই এ-বিষয়ে সে নিজের মনে নিঃসংশয় বিশ্বাস উৎপাদন করলে। আর দ্বিতীয়বার, একগুঁয়ের মত হঠাৎ 'না' বলে'ই টেলিফোন ছেড়ে দেয়া—লতার তখন তাকে কী ভয়ানক বোকাই মনে হয়েছিলো, তা হ'তেই পারে! লতার মুখ নির্ম্মম স্পষ্টতায় তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো, তার কানে টেলিফোন, মাউথপীসের ভিতর সে কথা বলছে—কোনো জবাব পাচ্ছে না। একটু পরে ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে সে টেলিফোন রেখে দিলে, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তার ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেলো। শিল্প-রূপ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনা থাকা সব সময়েই বিপদের—তাতে আমরা

অনেক বেশি কষ্ট পাই। আসলে যে-ঘটনা তুচ্ছ, তখন-তখন 'ভুল' যেতে পারিনে; তাকে মনে করে' রাখি, ফেনিয়ে তুলি, তাকে নাটকীয় রূপ না-দিয়ে ক্ষান্ত হইনে। তার অসংলগ্নতাকে, অর্থহীনতাকে সুন্দর, সুসমঞ্জস করে' সাজাই, গভীর দ্যোতনায় তাকে সম্পদশালী করি। যে-কোনো ছোটখাটো জিনিস নিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অসুখী করে' তোলা কল্পনাপ্রবণ লোকের বিশেষ একটা ক্ষমতা। অশান্তর সব চেয়ে খারাপ লাগছিলো মা-র সামনে বসে' থাকতে; মা-র চোখের দিকে তাকাতে সে সহ্য করতে পারছিলো না। মনে হচ্ছিলো, যেন কোনোভাবে মা-র প্রতি সে মিথ্যাচরণ করেছে, যেন মা-র কাছে কোনো বিশ্বাসের হানি করেছে। সে যদি তাঁকে বলতে পারতো, কী হয়েছে—কিন্তু একরকম দুঃখ আছে, যা বলা যায় না; যা সহানুভূতির উদ্রেক করে না, হাসির উদ্রেক করে। কী বলবে? 'একটি মেয়েকে বাগানে একা পাবো ভেবে আমি তার কাছে যেতে চাইলুম, কিন্তু সে খবর দিলে সে এক রেস্তোরাঁয় বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং সেইজন্য আমার মন-খারাপ।' চমৎকার, চমৎকার। শুনলে মনে হবে, সে রসিকতা করছে। অথচ আপিস থেকে ফেরবার সময় তার সম্পূর্ণ এক মাসের মাইনে চুরি হ'য়ে গেলেও এর চেয়ে অসুখী সে হ'তে পারতো না। সে-দুঃখের কথা সবার কাছে বলা যায়, সবার সহানুভূতি পাওয়া যায়; কিন্তু এটা—না, এর ভাষা নেই, মনে-মনে একে পুষে রেখে যন্ত্রণা-ভোগ করা ছাড়া আর উপায় নেই। কোনো বই পড়বার কথা চিন্তা করা যায় না, খেয়ে ওঠা মাত্র অশান্ত শুতে গেলো। এ-ই হচ্ছে ফল, বিছানায় শুয়ে নিজের মনে সে বললে, বেশি কবিতা পড়বার এ-ই হচ্ছে ফল। কবিতার সঙ্গে জীবনকে মেলাতে গেলে মাঝে-মাঝে এরকম আছাড় খেতে হয়ই। অন্ধকার—তারা—রজনীগন্ধা: সম্পূর্ণ ছবিটি

একটি কবিতা। এবং যে-মুহূর্ত্তে সে-ছবি তার মনের মধ্যে বাঁচতে আরম্ভ করলো, তাকে প্রত্যক্ষ করবার আকাঙ্ক্ষা হ'য়ে উঠলো প্রবল। কেন, ঘুমোবার চেষ্টায় পাশ ফিরে সে ভাবলে, কেন এত সহজে সে অভিভূত হ'য়ে পড়ে? আর, পাশের ঘরে বাসন্তী প্রার্থনা করছিলেন, অন্ধকারের অশুভ শক্তি থেকে অশান্ত যেন রক্ষা পায়।

কিন্তু অশান্তর বোজা চোখের অন্ধকারে লতার কালো চুল স্রোতের মত লালায়িত: সেই অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে সে কী করবে? কী করবে মা'র রক্ষাপ্রয়াসী প্রার্থনা? 'But lo her wonderfully woven hair!' স্রোতের মত সেই চুল, বন্যার মত চলে' যাচ্ছে তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে', অভিভূত করে', তার আত্মার মূলে সেই চুল পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়িয়ে গেলো। তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে, মুক্তির জন্য সে ছটফট করছে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে, সেই নিষ্পেষণ, সেই বিজড়িতত্ব—তাকে সে কামনা করছে, উপভোগ করছে, ভালোবাসছে। লজ্জার, পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় মনের সযুক্তি অংশ দিয়ে সে বলছে, আর নয়; কিন্তু মনের যে-অংশটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, প্রবৃত্তিগত, পশুধর্ম্মী, অগণ্য শতাব্দীর ক্রমবিবর্ত্তনের ফল মানুষের যে-সভ্যতা, যে-আত্ম-গঠন, তার উপর শুধু মুহূর্ত্তের বাসনা-উচ্ছ্বাসে যে-অংশ মাঝে-মাঝে জয়ী হয়, সেই অংশ বলছিলো—শুধু একবার তাকে দেখা, সেই আশ্চর্য্য চুল, আশ্চর্য্য ফুলের মত সেই মুখ! সেই চুল বন্যা; বন্যা প্রখর, বন্যা অপ্রতিরোধ্য। বন্যার মুখে সে রুদ্ধশ্বাস, অচেতনীভূত। তবু মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ, উজ্জীবনকারী আঘাতে সেই লজ্জা, পরাজয়ের চিন্তা! সে-আঘাতে মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন বন্যার গভীরতা থেকে উপরে উঠে আসে; তখন নিজের অখণ্ডতা সে ফিরে পেতে চায়, মুক্ত হ'তে চায় এই শ্বাসরোধকারী বিজড়িতত্ব থেকে।

পরদিন সকালে বিকাশ এসে উপস্থিত। 'ওল্ড্ বয়্, কাল তুমি গেলে না কেন?' এর কোনো উত্তর নেই, অশান্ত চুপ করে' রইলো। 'কেন গেলে না?' বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে, প্রশ্নের উত্তরের আশায় ততটা নয়, যতটা তার নিজের কথার ভূমিকা-হিসেবে। 'এমন চমৎকার কাটলো সন্ধেটা। পার্ফেক্ট। কিম্বা পার্ফেক্ট হ'তো—তুমি গেলে।'

'শুনতে খুব ভালো লাগছে।'

'মনে হ'লো লতা যেন বিশেষভাবে তোমাকে আশা করছিলো।' বিকাশের মুখে গূঢ় হাসি ফুটে উঠলো। 'তুমি না-যাওয়াতে ওকে একটু', তার হাসি ঠোঁটের কোণ থেকে স্ফীতগণ্ডে বিস্তৃত হ'লো, 'একটু বিষণ্ণ মনে হ'লো।' ইংরিজি স্ল্যাঙ্গের প্রতিষেধক-হিসেবে মাঝে-মাঝে বিকাশের বিশুদ্ধ বাঙলায় কথা বলবার খেয়াল চাপতো, এবং তখন শব্দ-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে সে একটু বেশি, বড় বেশি সযত্ন হ'য়ে পড়তো, আর সেই পোষাকি, দামি কথাগুলোকে উচ্চারণ করতো আত্ম-সচেতনভাবে, একটু জমকালোভাবে—যেন শ্রোতার মুখের উপর সেগুলো ছুঁড়ে মারতো: 'নাও এবার!' 'এমন কি', পাছে এত আনন্দ একবারে অশান্তর সহ্য না হয়, সে একটু-একটু করে' বলছিলো, 'তোমার কথা তিন-চার বার আমাকে বলেছে।' প্রাধান্যে বিরাট, তার গাল স্ফীততরো হ'য়ে বিজয়ে, গোপন রহস্যে যেন ফেটে পড়তে লাগলো। 'এ সত্যি তোমার অন্যায়, লতাকে এ-রকম করে' নিরাশ করা—সত্যি অন্যায়।' অসমর্থনসূচক, সে মাথা নাড়লো। 'একদিন তোমাকে, দেখছি, কিডন্যাপ করে' নিয়ে যেতে হবে।' এই রসিকতার ঝলকে আত্ম-প্রীত, বিকাশ সশব্দে হেসে উঠলো। অশান্তর পক্ষে একটু হাসা কর্ত্তব্য হ'লো। 'কিন্তু শোনো', বিকাশ লক্ষ্য করলে না, অশান্ত এতক্ষণ কোনো কথাই বলছে না; সেটা

তার স্বভাব নয়। এবং সে-জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়; কারণ এক-এক সময় চুপ করে' থাকতে পারার জন্য একজন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করে, 'সামনের শনিবার লতার ওখানে তোমাকে যেতেই হবে—না—' অশান্ত কথা বলবার ভঙ্গি করতেই বিকাশ প্রতিবাদ করে' উঠলো, 'না, তোমার কোনো আপত্তিই শুনছিনে। গোল্লায় যাক্ তোমার গ্রেট ইণ্ডিয়া. লতা যা চায়, তা হ'তেই হবে। লতা চায় যে তুমি আসো। সুতরাং—যেমন করে' পারো। বুঝলে?'

অশান্তর প্রথম ঝোঁক হ'লো নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার; কিন্তু বিকাশের সঙ্গে এখন বসে' কথা-কাটাকাটি করা বৃথা। বিকাশ যে-রকম অনুপ্রেরিত হ'য়ে এসেছে মনে হয়, অনুকূল জবাব না-পেলে কিছুতেই ছাড়বে না। তাই একটু পরে, খানিকটা অনির্দেশ্যভাবে অশান্ত বললে, 'আচ্ছা।' সম্প্রতি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাক্ তো; শনিবারের এখনো দেরি আছে, উপস্থিত মুহূর্তের অভিরুচি অনুসারে তখন মন ঠিক করা যাবে।

সে কি লতার কাছে যেতে চায়, অশান্ত একটা সমাধানে পৌছবার চেষ্টা করলে, না, চায় না? জোর করে' নিশ্চিত করে' কিছু বলা শক্ত। যা আমরা সমস্ত মন দিয়ে কামনা করি, তা হাতের কাছে পেলেই অনেক সময় তা থেকে পালিয়ে যাই। একটা জিনিস ততক্ষণই লোভনীয় থাকে, যতক্ষণ তাকে দখল করতে না পারি। কোনো-কোনো জিনিস আছে, যার কথা শুধু ভাবতেই ভালো লাগে, যার সত্যিকারের সংস্পর্শ বিতৃষ্ণাকর। থিওরি-হিসেবে, কোনো-কোনো জিনিস ভালো লাগবে বলে' নিশ্চিত ধারণা জন্মায়; কিন্তু পরখ করে' দেখা যায়, পরখ না-করলেই ছিলো ভালো। সত্যি-সত্যি কী আমার চাই, এক-এক সময় তা বোঝা এত শক্ত হ'য়ে ওঠে। অশান্ত চেষ্টা করে' ছেড়ে দিলে।

ঘটনা তার নিজের গতি নিক্। দৈনন্দিন জীবন-প্রণালীর মধ্যে লতা অনেকটা দূরে সরে' গেলো; রাত্রির নীরব অন্ধকারে মনের এক আকস্মিক প্রতিক্রিয়ায় লতার যে-চুল বন্যার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলো, দিনের স্পষ্টতায়, দিন থেকে দিন কাজের তাড়ায় প্রশমিত হ'তে-হ'তে তা প্রায় মিলিয়ে গেলো। কিন্তু শনিবার যতই কাছে আসতে লাগলো, ততই একটা চাপা উত্তেজনা তার মনে ফুঁসে উঠতে লাগলো; অনেক সময় তার কেটে গেলো, লতার ওখানে যাবে কি যাবে না, সে-কথা না-ভাববার চেষ্টা করে'। শুক্রবার রাত্তিরে, সে ভেবে দেখলো, না-যাওয়াটা ভয়ানক অভদ্রতা হয়, বার-বার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটা রীতিমত চাষাড়ে। শনিবার সকালে সে নিশ্চিতরূপে মন ঠিক করে' ফেললো—যাবে না। তার চেয়ে বরং আজকের দিনটা বিশ্রাম নেয়া যাক। খাওয়ার পর দরজা-জানলা বন্ধ করে' শুয়ে বিকেল পর্য্যন্ত বই পড়া; তারপর চায়ের সঙ্গে আর-একটা বই—ভাবতেও কী আরাম। শুধু মাঝে-মাঝে আপিস পালাবার আনন্দের জন্যই চাকরি করতে হয়। বাইরে গিয়ে সে আপিসে ফোন করে' দিলে, আজ যেতে পারবে না। দুপুরবেলা বই নিয়ে শুয়েছে, হঠাৎ মনে হ'লো, লতার ওখানে তাকে যেতেই হবে। বেলা যতই পড়ে' এলো, এ-সঙ্কল্প ততই উঠতে লাগলো গভীর হ'য়ে। সন্ধে নাগাদ, ল্যান্সডাউন রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে সে পৌঁছে গেলো।

কবিতার সঙ্গে জীবন মেলে না; কবিতা-উদ্দীপিত কল্পনার সঙ্গে কল্পনার উদ্দেশ্যকে মেলাতে গেলে চমকে উঠতে হয়। অশান্ত লতাকে দেখলো, লাল সিল্কের কুশানে আশ্রিত, সোফার উপর অর্দ্ধ-শায়িত তার শরীর। আর, যেন বিস্ময়ের চমকের সঙ্গে লতার সীমাবদ্ধতাকে সে উপলব্ধি করলো। ঘুমের আগেকার অন্ধকারে যে-চুল বন্যার মত

উচ্ছ্বসিত, লাল কুশানের গায়ে তা শান্তভাবে বিশ্রাম করছে, বস্তুর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তা আবদ্ধ; তা পরিমিত, সুনির্দ্দিষ্টরূপে সংজ্ঞেয়—তা নেহাৎই একমাথা মেয়ের-চুল। অশান্তকে দেখে লাল কুশানের উপর থেকে সেই চুল উত্থিত হ'লো। 'আ, এই যে।' লতার দৃষ্টিতে সদ্য-ধৃত বন্দীর সামনে করুণাময়ী রাণীর হাসির একটু আভাস ছিলো। একপাশে একটু সরে' বসে' অশান্তর জন্য সে জায়গা করে' দিলে। 'শেষ পর্য্যন্ত আপনার দয়া হয়েছে তাহ'লে।' ঘাড়ের উপর দিয়ে হাত তুলে সে পিঠের নিচে একটা কুশান ঠিক করে' নিলে। 'বসুন্ না।' হাসিতে বাঁকানো তার লাল ঠোঁট তীক্ষ্ণ-অস্ত্রকৃত একটা রক্তক্ষর ক্ষতের মত, কোনো কাল্পনিক বক্রগতি লাল পোকার মত।

অশান্ত বসলো। সূক্ষ্ম কেয়াসৌরভ কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত বর্ষাসন্ধ্যার মত। 'আর সবাই কোথায়?'

'আমার সঙ্গে একা থাকতে আপনি ভয় পান্ কেন?'

ভয় পেলে কিছু দোষের হয় না; একটা ছোট, লাল সাপের মত লতার ঠোঁট, যেন ছোবল মারতে উদ্যত। এত কাছে থেকে, নিরালায়, এমন সম্পূর্ণ করে' এ-ই প্রথম অশান্ত তাকে দেখলো। এ যেন সে নয়, মনে-মনে যার কথা সে ভেবেছে, যাকে দেখবার ইচ্ছা কিছুতেই, কিছুতেই সে পরাভূত করতে পারেনি। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার রক্তাভ আলো, মুমূর্ষু দিনের ভারি নিঃশ্বাস একটা উৎপীড়নের মত। সেই ভারি, উষ্ণ আবহাওয়ায় কোনো অদ্ভুত, গোপনচারী জন্তুর মত লতা—উন্মুখ, উন্মুখ, শীকারের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য প্রতীক্ষমান। আর সেই কেয়ার গন্ধ—এক-এক সময় সেটা বড় বেশি মিষ্টি মনে হয়; অশান্ত প্রায় অসুস্থ বোধ করলো।

পরস্পর

'আমার ধারণা হয়েছিলো, আরো অনেকে আসবে।'

'আসবে। কিন্তু আপনি তো বেশি লোক পছন্দ করেন না।' জিজ্ঞাসার ক্ষীণতম আভাসে লতা কথাটা শেষ করলো। 'তা-ই নয়?' লতার মুখ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো; জমানো রক্তবিন্দুর মত তার কর্ণাভরণ উঠলো ঝিল্‌মিল্ করে'।

'সেটা নির্ভর করে লোকের শ্রেণীর উপর।' কিছু বলতে হবে বলে'ই অশান্ত বললে। তার মন হঠাৎ বিগড়ে গিয়েছিলো, এখানে আসবার জন্য এরই মধ্যে সে অনুতাপ করতে আরম্ভ করেছিলো। এখন পালানো, মুমূর্ষু দিনের আর কেয়াগন্ধের ভার থেকে পালানো। কিন্তু সে বন্দী, রাণী যার উপর দয়া করে' হাসছে। সে বন্দী, এবং সে সেটা অনুভব করছিলো।

'আমার সব সময়েই মনে হয়েছে, মানুষের মধ্যে আমরা হচ্ছি নিম্নতম শ্রেণীর। অলস-ধনীসম্প্রদায়—ইত্যাদি। চাষাদের রক্তশোষণ করে' স্ফীত হচ্ছি। সমূলে আমাদেরকে ধ্বংস করা উচিত। কিন্তু সত্যি, ধ্বংস কখনো করবে?' তার মুখ গম্ভীর, প্রায় ব্যাকুল, লতা জানতে চাইলো। যেন সে একটা নির্দিষ্ট সংবাদ জানতে চাইছে, যেন সে জিজ্ঞেস করছে, 'এই সাড়িটায় কি আমাকে মানিয়েছে?' 'তাহ'লে বাঁচা যায়, সত্যিকারের একটা থ্রিল পাওয়া যায়। কেউ যদি এখন এসে আমাকে টুকরো-টুকরো করে' কেটে ফেলতে চায়—কী ভয়ানকরকম উত্তেজক হয় ব্যাপারটা!'

'যদিও খুব উপভোগ্য হয় না হয়-তো', অশান্ত হেসে উঠলো।

'উপভোগ্য?' যেন কথাটা খুব জটিল, এবং তা বোঝবার জন্য লতাকে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হচ্ছে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে' লতা খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে অশান্তর দিকে তাকিয়ে রইলো। 'উত্তেজনাই তো উপভোগ

—তা-ই নয়? কিন্তু আপনি তো বুঝি আবার শান্তি ভালোবাসেন—নির্জ্জনতা।'

শান্তি, নির্জ্জনতা, অন্ধকার বাগান, আকাশ-ভরা তারা। অশান্তর মনে হ'লো যেন লতা তার সেদিনকার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলো, এবং তার প্রতি ইঙ্গিত করে' এখন ইচ্ছে করে' তাকে বিদ্রূপ করছে কিন্তু লতার মুখে বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই; তার দৃষ্টি একাগ্র, তাতে আপাত-তন্ময়তা—এমন কি, তা একটু করুণ। 'এক-এক সময়', যেন তার চিন্তার গূঢ়তা থেকে সে বলে' উঠলো, 'আমার মনও ও-সব জিনিসের প্রতি ঝোঁকে, কিন্তু', একটা, একটা অলস ভঙ্গিতে লতা তার সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া মাথা আবার পিছনে হেলিয়ে দিলে, 'আমরা যে যেমন, আমাদের জীবনও সেই অনুসারে তৈরি হয়। নিয়তিকে এড়ানো যায় না।'

ঘর অন্ধকার হ'য়ে আসছিলো। 'আলোটা জ্বালিয়ে দিলে হয় না?' অশান্ত বললে।

'কেন, বেশ তো আছে। এ-সময়টাই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে—দিনটা মরে' যেতে এত বেশি সময় নেয়। প্রায় অত্যাচারের মত মনে হয়—হয় না?'

হ্যাঁ, অত্যাচার, অশান্ত মনে-মনে ভাবলো, কিন্তু যে-দিন মরে' যাচ্ছে, তার উপর নয়; এই ঘরের অবরোধ, গন্ধঘন আধো-অন্ধকারে যার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে, তার উপর। এখান থেকে খসে' পড়বার প্রথম যে-সুযোগ আসবে, তা-ই তাকে নিতে হবে। এখনই ওঠবার চেষ্টা করা—না, তা কী করে' হয়? এই তো সবে এলো। অন্য-কেউ আসছেই বা না কেন। সে কখনো ভাবেনি, এ-সময়ে লতা এ-রকম একা বসে' থাকবে। সম্পূর্ণ দলের মধ্যে অশান্ত অনেকটা গা-ঢাকা

দিয়ে থাকতে পারে, তাকে বিশেষ মনোযোগ দেবার যোগ্য কেউ মনে করে না, সে শুধু বহিরাগত একজন দর্শক; অত লোকের মধ্যেই সে তার বাঞ্ছিত বিচ্ছিন্নতা পায়, অনেকটা শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু এখন, ঘরে যখন তারা দু'জন মাত্র, তাকেও সক্রিয় না হ'লে চলে না; এখন দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এড়ানো শক্ত। এবং তাতে তার সমস্ত অন্তর বিমুখ। নিজেকে সে অখণ্ড রাখতে চায়, নিজেকে সে দিতে চায় না। আত্ম-রক্ষায়, তার মন যেন একেবারে টান হ'য়ে পড়েছে; কেউ এলেই সেটা শ্লথ হ'তে পারে। হঠাৎ, বিস্ময়ের সঙ্গে তার খেয়াল হ'লো যে এতদিন সে কামনা করেছে, লতাকে একা পেতে; আজ, এই মুহূর্ত্তে সেই তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু···এখন সে চাইছে, অন্য-কেউ আসুক। চাইছে, তারাই আসুক, যারা থাকবে বলে' সেদিন সে মেলিনিতে যেতে অস্বীকার করেছিলো।

যেন পারস্পরিক সম্মতিতে, দু'জনের মাঝখানে নীরবতার ছেদ পড়লো। ঘরে অন্ধকার এলো গাঢ় হ'য়ে। দিনের মৃত্যু সম্পূর্ণ হ'লো; তার উপর মন্থর, করুণাহীন অত্যাচারের অবসানে, যেন সেই নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ারই কোনো পরোক্ষ উৎপত্তিরূপে রাত্রি জন্ম নিচ্ছে। বড় সহরের কোনো শান্ত পাড়ার রহস্যময় শান্ততা নিয়ে সন্ধ্যা নামলো। তার কালো মাথা লাল কুশানে হেলানো, একটা দীর্ঘ, বক্রতাময় আভার মত লতার শরীর। অশান্ত তাকিয়ে দেখলো; তার চোখে পড়লো অন্ধকারের সঙ্গে একীভূত চুলের নিচে লতার প্রেত-ম্লান মুখ। আর সেই রাত্রি, ঘুমের আগেকার সেই সজীব, শক্তিশালী অন্ধকার ফিরে এলো তার মনে; তার চেতনার উপর দিয়ে সেই বন্যার পুনর্মুক্তি সে অনুভব করলে। হঠাৎ তার শরীরের জীবন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো, তার রক্তে কামনা উঠলো প্রবল হ'য়ে—লতাকে অনুভব করবার,

সদ্য-জাগ্রত সেই জীবন দিয়ে উপলব্ধি করবার, বন্যার চেতনাহীনতায় তার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে যাবার। আর যা-কিছু, সাময়িকভাবে সব লুপ্ত হ'য়ে গেলো: সৃষ্টি তার গোপনতম রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে, এবং তা হচ্ছে লতার শরীরের অস্পষ্ট আভা, তার মধ্যে রক্তিম উষ্ণতায় প্রবহমান জীবনের সচেতনতা, তা হচ্ছে নিরাকৃতি অন্ধকারেরই গভীরতা থেকে রূপায়িত কোনো প্রতীক-মূর্ত্তির মত লতার মুখ। সে-মুখ একটা আহ্বান, একটা অনির্দ্দেশ্য প্রতীক্ষায় সে-মুখ নিঃস্পন্দ। সেই নিঃস্পন্দতা ভাঙতে! বাসনার উষ্ণ সঞ্চারে সেই মুখ উজ্জীবিত, আরক্ত করে' তুলতে!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাসির শব্দ শোনা গেলো ঘরের মধ্যে, আর কথার, আর দ্রুত পদক্ষেপের। 'এ কী, ঘর অন্ধকার কেন?' 'লতা নেই নাকি?' কুশান থেকে লতা তার মাথা তুললো। 'এত অলস লাগছে যে আলো জ্বালবার জন্যও উঠতে ইচ্ছে করছে না। একটু কষ্ট করো না, টুলটুল।' অশান্ত কতগুলো স্বর শুনতে পেলো; কথা বুঝতে পারলো না। মুহূর্ত্ত পরেই ইলেকট্রিক আলোর দীপ্তিতে সাড়ির নানারকম রঙ ঝলসে উঠলো; তার স্থায়ী অনপসারণীর হাসি বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত, বিকাশ তার দিকে আসতে-আসতে বললে, 'আ, অশান্ত, কেন তোমাকে এমন দেখাচ্ছে—'

'যেন এই মাত্র একটা খুন করতে গিয়ে তুমি বাধা পেয়েছো', লতা বললে। বলে' অশান্তর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

যেন একটা তীব্র আলো হঠাৎ নিবিয়ে দেয়া হ'লো; চেতনার কেন্দ্র মস্তিষ্ক একটা রূঢ় আঘাতে হঠাৎ উঠলো সচকিত হ'য়ে। সচকিত, অশান্ত ফিরে এলো। বন্যা প্রশমিত, স্রোতে স্তব্ধ: একটা অবস্থান্তর, একটা জাগরণ। আর আবার, কেয়াগন্ধের অনুভূতি অশান্তর মধ্যে ক্ষীণ হুঙ্কারের উদ্রেক করলো।

ক্রমে আরো অনেকে এলো। দিনের মৃত্যুশ্বাসের চাপে উৎপীড়িত সেই ঘর যেন কোনো জাদুতে রূপান্তরিত—সম্মিলিত মানবতার ঘনগন্ধে, সুখী হবেই বলে' যে-সব লোক পণ করেছে, তাদের জ্বরগ্রস্ততায়। সান্ধ্য সম্মিলন বৃহৎ ; লতার দলের বোধ হয় সেটা ছিলো পূর্ণ অধিবেশন। পণ-করা জেদ-ধরা উৎসব একটু অতিরিক্তরকম সানন্দ। সানন্দ আর লঘুচিত্ত, আর দৃশ্যহিসেবে সুন্দর।

আর সব মিলে অবাস্তব, শূন্যতাময় ; যেন ওদের অস্তিত্বের মূল নেই, রঙিন ধোঁয়ার মত এরা ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়, খানিক পরে মিলিয়ে যেতে, কিছু-না হ'য়ে যেতে। ছাখো আমাদের আধুনিক যৌবনকে, কী সুন্দর এরা, ব্রিলিয়েণ্ট, চার্মিং এদের ফর্‌ফরানি আর ঝিলিমিলি নিয়ে, এদের ইনোনো-বিনোনো, ক্ষুধিত কুকুরের ডাকের মত করুণ গজলগন্ধী গান আর অত্যন্ত মৃদু, সম্পূর্ণ নিরামিষ অথচ কণ্ডূয়ন-সুখময় ফ্লার্টেশন নিয়ে, এদের আর্টপ্রীতি, গার্বোপূজা, স্বাধীনতার, সংস্কারমুক্তির বড়াই, কিছু না-মানবার দেখানোপনা, কিছু মানতে হ'লে যেটুকু মননশক্তির দরকার হয়, তার সুখকর অভাব—চার্মিং, ডিলিশাস্‌! একটা রঙিন ধোঁয়ার পরদা—স্বর্গ-মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী রাজ্যে ভাসমান, জীবন থেকে বিচ্যুত, শূন্যবিহারী শূন্যতা। আর, তাকে ঘিরে এই ঝল্‌মলানি আর ফর্‌ফরানি যখন উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে, একটা বিরাট শূন্যতার, নিষ্ফলতার চেতনা অশান্তকে আক্রমণ করলো ; তাকে যেন কেউ পরাজিত, ব্যর্থ করে' দিচ্ছে। বাসনার উচ্ছ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে বিরূপতায় পরিণত হ'লো (অনেক সময় আমাদের মন সমস্ত মধ্যবর্ত্তী স্তর পার হ'য়ে আবেগের এক সীমা থেকে অন্য সীমায় চলে' যায়), আর অশান্তর মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আবার তীব্র হ'য়ে উঠলো—এবার আর লতার কেশস্রোত থেকে নয়, এই বন্ধ্যা অবাস্তবতা থেকে : এই বর্ণচ্ছটারঞ্জিত,

পরস্পর

সুখপীড়িত, মুখর রাত্রি থেকে, তার বিচ্ছিন্নতার অনাক্রমণীয় নির্জ্জনতা থেকে—মুক্তি, পালিয়ে-যাওয়া, নিজেকে ছড়িয়ে দেয়া—অন্য-কোনো রাত্রিতে, অন্য-কোনো নির্জ্জনতায়।

আমি এখানে বসে' কী করছি, অশান্ত বার-বার নিজের মনে বললে, আমি এখানে বসে' কী করছি? বাইরে রাত্রি এইমাত্র বাঁচতে আরম্ভ করেছে, গ্যাসালোকিত, পল্লবঘন রাস্তায় প্রিয়া-স্পর্শের শান্ত আনন্দ। ভদ্রতা বজায় রেখে যত শিগগির সম্ভব হ'লো, অশান্ত যাবার কথা উত্থাপন করলে, কিন্তু তার মুখের কথা শেষ না-হ'তেই তারা সবাই একসঙ্গে এমন চীৎকার করে' উঠলো যে অশান্ত নিজেই পড়লো লজ্জিত হ'য়ে। সময় কেটে গেলো; দশটার আগে সে ও-বাড়ি থেকে বেরুতে পারলো না।

বাড়ি ফিরে প্রথম তার যার সঙ্গে তার দেখা হ'লো, সে রাণী। ও, আজ তো শনিবার, এতক্ষণে তার মনে পড়লো, আজ রাণীর আসবার কথা ছিলো যে। এ-ক'টা দিন, এতক্ষণে তার মনে পড়লো, তার পক্ষে রাণীর অস্তিত্বই ছিলো না। তাকে দেখে, তাই, সে একটু বিস্ময় সামলাতে পারলো না। এবং সেই সঙ্গে সে খুসি হ'লো; কী-রকম যেন, রাণীর অস্তিত্বের জন্য সে কৃতজ্ঞ বোধ করলো। যে-মুক্তির জন্য তার মনের মধ্যে সংগ্রাম চলছিলো, কোনো-একভাবে, রাণী যেন তারই প্রতীক। রাণী যেন একটু আলাদা: ক'দিন ধরে' যত আত্ম-বিরোধ, পরস্পর-প্রতিকূল মানসিক অবস্থা তাকে আঘাত করেছে, তার আবহাওয়া থেকে আলাদা, তা থেকে পলায়ন। তার মনে হ'লো, রাণীর মধ্যে সে মনের শান্তি পাবে।

'এত শিগগিরই আপিস হ'য়ে গেলো?' আগের রাতের সঙ্গে তুলনা করে' রাণী জিজ্ঞেস করলে।

'আপিসে যাইনি', অশান্ত সংক্ষেপে বললে, 'আপনি এসেছেন কখন্?'

'সন্ধের সময়। এসে শুনলাম, একটু আগেই আপনি বেরিয়ে গেলেন।'

অশান্ত বললে, 'হুঁ।'

একটু পরে বাসন্তী ওদেরকে ডাকলেন খেতে। 'আপনি খেয়ে নিলেই তো পারতেন', অশান্ত বললে, 'এত রাত অবধি বসে' আছেন কেন?'

'তা আর কী হয়েছে। একসঙ্গে খাওয়াই তো ভালো।'

অশান্ত নাম মাত্র খেলো। অনেকটা নিজের উপর প্রতিশোধরূপে, লতার ওখানে সে অনেকগুলো কেক্ খেয়ে ফেলেছিলো। 'কিছু খাচ্ছিস না যে?' বাসন্তী, অনিবার্য্যরূপে, প্রশ্ন করলেন।

'খাচ্ছিই তো।'

এ-উত্তর অবিশ্যি গ্রাহ্য করবার নয়; ছেলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আপিসে যাস্‌নি?' প্রশ্নটা অসংলগ্ন, কিন্তু শুধু আপাতরূপে।

'না।' বাসন্তীর সন্ধানরত দৃষ্টির সামনে অশান্তর নিজেকে অপরাধী মনে হ'তে লাগলো। তার স্বচ্ছ, বোধ হয় অতিরিক্তরকম স্বচ্ছ মুখ লুকোবার জন্য সে জলের গেলাসে চুমুক দিলে। কোনো জিনিস লুকোতে খারাপ লাগে, কিন্তু যদি সেটা উপভোগ্য হয়, তাহ'লে সার্থক মনে হয় সেই গোপনতার কুণ্ঠা, অপরাধের চেতনাকে সহনীয় করে' তোলে একরকম মাধুর্য্য। কিন্তু যা ক্লান্তিকর, এমন কি, কষ্টকর, তা যদি গোপন করতে হয়—তাহ'লে সত্যি সেটা খারাপ। প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তন করবার জন্য সে তাড়াতাড়ি রাণীকে জিজ্ঞেস করলে, 'ওখানে ভালো

ছিলেন বেশ?' তারপর, রাণী কিছু বলবার আগে নিজেই বললে, 'অবিশ্যি ভালো যে ছিলেন, তা আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি।'

'এরই মধ্যে কলকাতা আমার ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে।' রাণী হাসলো।

'আর তোমার পড়ানো?' মালতী জিজ্ঞেস করলে।

'ও-বিষয়ে বলবার কিছু নেই। মানুষ যতক্ষণ কাজ করে, ততক্ষণ কি আর সে বেঁচে থাকে? মানে—যে-কাজ জীবিকার জন্য, আনন্দের জন্য নয়।'

'অভিযোগ করবার একটা উপলক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হোক।' মালতীর কথাটা প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই উদ্দেশে বলা হ'লো।

'অবসরের সময়টুকুতেই তো মানুষ সত্যি-সত্যি বাঁচে। যখন সে তার ইচ্ছাকে খাটাতে পারে। প্রাণীজগতে এক মানুষই কাজ থেকে ছুটি পেলেই ঘুমোয় না। মানুষ বাঁচে কিসে? তার ইচ্ছার ব্যবহারে।'

'যদিও আজকালকার ঝোঁক হচ্ছে', অশান্ত বললে, 'সেই ইচ্ছাকে ধ্বংস করবার; কাজের মত, অবসরকেও যথাসম্ভব যান্ত্রিক, সকলের পক্ষে একরকম করে' তোলবার। সন্ধেটা একটু ভালোভাবে কাটাবার কথা মনে হ'লেই আমরা বায়োস্কোপে যাই।'

'সভ্যতা।'

'হ্যাঁ, সভ্যতা', অশান্ত হেসে উঠলো। 'টেলিফোন আর ইলেকট্রিক ফ্যান আর শস্তা মোটরগাড়ির জন্য কোনোভাবে কি আর দাম দিতে না হবে। এডিসন আর ফোর্ড—এই দুই মার্কিনে মিলে পৃথিবীটাকে শেষ করে' দিলে।'

'কিন্তু ভাবুন একবার, ইলেকট্রিক ফ্যান না-থাকলে কী অবস্থা হ'তো।'

'অনায়াসে ভাবা যায়। এককালে ও-জিনিস ছিলো না, এবং আমাদের দেশ তখন এমনি গরম ছিলো।'

'এককালে মানুষ কাঁচা মাংস খেতো।'

'জানি ও-সব। প্রগতি। দিন থেকে দিন আমরা পার্‌ফেক্ট হচ্ছি; দেবতার মত সব মানুষ। বিজ্ঞাপনের প্রাণকাড়া বুলি। জানি। কিন্তু রেডিয়োর উৎপাতে ভবানীপুরের কোনো-কোনো রাস্তা দিয়ে যে সন্ধের সময় হাঁটা যায় না।'

'নতুন-কোনো উদ্ভাবন-সম্বন্ধে প্রথমটায় মানুষ চিরকাল সন্দিহান হয়েছে। রেলগাড়ি প্রথম যখন ঘণ্টায় বারো মাইল চলতে আরম্ভ করে, এমন দারুণ বেগে চললে মানুষের প্রাণ আর থাকবে না, এই কারণে বিলেতে তুমুল আপত্তি হয়।'

'সুতরাং—সহরের প্রতি বাড়িতে, প্রতি সন্ধ্যায় যন্ত্রযোগে সঙ্গীত সরবরাহ হচ্ছে—তা-ই শুনে আমাকে রসতৃষ্ণা মেটাতে হবে। বেশ।'

'আপনি জিনিসটা মেনে নিতে পারছেন না, কারণ তার উদ্ভাবন হয়েছে আপনার জীবৎকালে। কিন্তু এর পরের বংশ—শিশুকাল থেকে যারা রেডিয়ো শুনবে তারা রেডিয়ো ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারবে না।'

'তাদের জন্য শুধু দুঃখিত হ'তে পারি।'

'কিন্তু টেলিফোন আর মোটর-এঞ্জিন না-হ'লে চলে না। যন্ত্রকে একবার যদি স্বীকার করে'ই নেন, কোথায় সীমা টানবেন?'

'এক জায়গায় টানতেই হবে। এটা পুরোনো সত্য। এবং কী করে' জানেন সেটা ঠিক এখানে নয়?'

'কী করে' জানেন যে তা-ই? কী করে' জানেন, যন্ত্র-ব্যবহারের এটা মাত্র প্রথম অবস্থা নয়? অন্তত ইতিহাসের দিক থেকে তো তা-ই সত্যি।'

'যদি তা-ই হয়, হোক। শুধু রেডিয়ো কেন, টেলিভিশন, রবো, ম্যাক্সি-গ্র্যাণ্ড, মোটরগাড়ির বদলে হেলিকপটার, আর এ-সবের সঙ্গে অ্যান্‌থ্রক্স-বম্ব্‌, মাইক্রোব-শেল্‌—সবই আসুক। প্রগতি চলুক, আমি বাধা দেবার কে? আর বাধা দেবার কী ক্ষমতাই বা আমার আছে? কিন্তু যা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে, তা হচ্ছে আমি যখন চাইনে, তখন আমাকে গান শোনানো; যে-জিনিসে আমার দরকার নেই, আমাকে দিয়ে তা কেনানো, যে-দেশ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, আমাকে সেখানে যেতে বাধ্য করা, আমি যখন চুপচাপ ঘরে বসে' থাকতে চাই, তখন জোর করে' আমাকে দিয়ে ফুর্তি করানো। সভ্যতা তার দ্রুত থেকে দ্রুততরো এরোপ্লেন আর নতুন থেকে নতুনতরো বোমা নিয়ে যা খুসি তা-ই করুক, আমাকে যেন ঘাঁটাতে না আসে। আমার ইচ্ছায় যেন বাধা দিতে না আসে। আমি যেন আমার নিজের নির্ব্বাচিত রাস্তা দিয়েই নরকে যেতে পারি।'

'কিন্তু সবাই এক রাস্তা না-ধরলে যে ব্যবসা ফেঁপে ওঠে না। ব্যবসাই টাকা; আর টাকা না-হ'লে দ্রুত থেকে দ্রুততরো এরোপ্লেন কী করে' তৈরি হবে? কার জন্যেই বা হবে? এরই মধ্যে আপনি চেষ্টা করতে পারেন, যদ্দূর সম্ভব আপনার নিজত্ব বজায় রাখতে। একটা কম্প্রোমাইজ। তার বেশি নয়।'

'এক-এক সময় আমার ভেবে অবাক লাগে, এর শেষ কোথায়? হাক্স্‌লির Brave New World? না কি, Penguin Island-এর শেষ পরিচ্ছেদ?'

খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কথা বলতে-বলতে কেউ উঠছিলো না। 'তোরা উঠে গিয়ে গল্প কর্‌ না', বাসন্তী তাড়া দিলেন।

'সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলো—মাঠ আর বন, ফুল আর লতা, চামড়া-

পরা মানুষ—ভাবতে চমৎকার। কিন্তু তারপর—মাত্র কয়েক হাজার শতাব্দী পরে—আবার সেই কারখানা আর আপিস, চল্লিশতলা বাড়ি, বিশাল সহরে পনেরো মিলিয়ন লোক কাজ করছে। কোথায় পালাবেন?'

'সম্প্রতি আমি পালাতে চাইনে। এ-সব বিষয়ে কথা কয়ে' সুখ, এবং সভ্যতার আওতায় আছি বলে'ই এ-সব বিষয়ে কথা কইতে পারছি।' অশান্ত হেসে উঠলো; হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো, তার মন আশ্চর্য্য-রকম ভালো লাগছে।

রাণীর মনের একটা দিক আছে, যা কঠিন, যা একটু পথ ছাড়বে না; সেখানে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত। যা হ'লে তার ভালো লাগে, এবং সত্যি-সত্যি যা হচ্ছে, এ দু'য়ে সে গোলমাল করে ফেলে না; যাকে বলে গিয়ে ফ্যাক্টস, আপনার উদ্দেশে তা ছুঁড়ে মারবে, কোণঠাসা করবে আপনাকে, পালাবার পথ দেবে না। এবং এই জিনিসটি, অশান্ত দেখলো, সে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে, দূরভাবে প্রশংসা করতে পারে। সেখানে, রাণীর সঙ্গে সে সংস্পর্শহীন। কিন্তু সেই সঙ্গে অশান্ত অনুভব করলো, রাণী নিহিতভাবে রোমান্টিক: রাত্রির মত, এই চৈত্র-রাত্রির মত সে উষ্ণ, সে অন্ধকার, সে সঙ্গোপন। মনের অন্ধকারে তার গোপন আগুন জ্বলছে; তারই প্রতিচ্ছায়া যেন তার হঠাৎ-হাসিতে, দ্রুত, দীপ্ত তার দৃষ্টিপাতে মাঝে-মাঝে ঝলসে উঠে। আর সেই অন্ধকার রহস্য অশান্তকে তার সত্তার গভীরতায় আলোড়িত করে' তুললো। রাণীর মধ্যে লুকোনো শিখার মত জ্বলছে জীবন, তার সমস্ত শরীর যেন তারই আভাময়, তার কাছে গেলেই তা ধরা পড়ে, ভুলে' থাকা যায় না। আর সেই জীবনের চেতনাই অশান্তর পক্ষে মূক, অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

রবিবারটা গানের মত কাটলো। বিকেলের দিকে এলো বিমল;

চায়ের পরে সবাই দল বেঁধে বেড়াতে বেরুলো। সবারই মন অত্যন্ত ভালো লাগছিলো; এক অনির্দ্দেশ্য কারণে সবাই যেন সুখী। এমন কি, মালতীও যেন তার আবরণ থেকে বেরিয়ে এলো, অশান্তকে চটাবার জন্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলো তীব্র মন্তব্য করলে। সবাই কথা বলছিলো; এক মাইলের বেশি রাস্তা দেখতে-না-দেখতে কেটে গেলো।

ভিক্টোরিয়া মেমরিয়েলের কাছে এসে বাসন্তী বললেন যে তাঁর পা ধরে' গেছে, এখন কোথাও একটু না-বসলেই চলছে না। একটু খোঁজাখুঁজির পর খালি একটা বেঞ্চি পাওয়া গেলো; বেঞ্চিতে তিনজনের বেশি ধরে না; বাসন্তী বসবার পর অশান্ত মেয়েদেরকে বসতে বললে।

মালতী বসলো; কিন্তু 'আমার একটুও ক্লান্ত লাগছে না', রাণী বললে, 'আরো অনেক হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

'চলুন তাহ'লে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়েলকে একবার প্রদক্ষিণ করে' আসা যাক। রাস্তাটা কিছু কম নয়, ইংরেজরা অন্য দিকে যেটা পারেনি, আয়তনে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে।'

'পুষিয়ে নিয়েও বেশি হয়েছে, মনে হয়।

'তুমি, বিমল, আমাদের সঙ্গে আসবে?'

'আমি বরং একটু বসছি; তোমরা ঘুরে এসো।'

'বেশি দেরি করিস্‌নে কিন্তু', বাসন্তী বললেন।

'এই ফিরলুম বলে'।'

বাসন্তী সঙ্গে ছিলেন বলে' এতক্ষণ তাদেরকে আস্তে হাঁটতে হয়েছিলো, এইবার মনের সুখে দ্রুত পা চালালে। মোড় ঘুরে দু'জনে মেমরিয়েলের পশ্চিমদিকের রাস্তায় এসে পড়লো। সন্ধে হ'য়ে আসছে, একটু পরেই গ্যাস জ্বলতে আরম্ভ করবে। কলকাতার গ্রীষ্ম

যে-একমাত্র কারণে শুধু সহনীয় নয়, রীতিমত উপভোগ্য হ'য়ে উঠে, সেই জোরালো, ঠাণ্ডা হাওয়া অবিশ্রান্ত বইছে দক্ষিণ থেকে। বিস্তীর্ণ রেইসকোর্সের পিছনে পশ্চিমের আকাশে সূর্য্যাস্তের সুন্দর রঙ ধরেছে। মেমরিয়েলের শ্বেতমর্ম্মরে গোলাপি আভা এর মধ্যে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে, উপরের দিকের জানলার রঙিন কাচ মুহূর্ত্তের রঙিনতরো আগুনে জ্বলে' উঠছে। 'Beauty to the right of them, Beauty to the left of them', অশান্ত বললে। 'যদিও মেমারিয়েলটা সত্যি-সত্যি সুন্দর হ'লে আপত্তি করবার কিছু ছিলো না।'

'কিন্তু এ যে সত্যি সুন্দর!' রাণী বলে' উঠলো, 'কিছুই একে নষ্ট করতে পারে না; এমন কি, এই মেমরিয়েলও নয়।' 'আমার মনে হয়', একটু চুপ করে' থেকে সে জুড়ে দিলে, 'চিরজীবন আমি কলকাতায় কাটাতে পারি।'

'কলকাতার এমনি মোহ', অশান্ত বললে। 'প্রথমটায় অবিশ্যি কলকাতাকে শক্ত মনে হয়, উদাসীন সহানুভূতিহীন মনে হয়, তার মধ্যে নিজেকে হারানো মনে হয়। তাকে জয় করতে, তার রহস্যে প্রবেশ করতে সময় লাগে। কলকাতা হচ্ছে লাজুক মেয়ের মত', বলতে-বলতে অশান্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো, 'প্রথমটায় সে মুখ তুলে তাকাবে না, ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু লেগে থাকতে হয়, তার ভালোবাসার জন্য সাধনা করতে হয়। আর, একবার যখন সে ধরা দেবে, গ্রহণ করবে, উন্মোচন করবে তার রহস্য, তখন চির-জন্মের মত তার দাস হ'য়ে পড়তে হয়, কিছুতেই তার মায়া কাটানো যায় না।'

কথা বলার ঝোঁকে অশান্ত রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি সরে' এসেছিলো; হঠাৎ পিছন থেকে একটা গাড়ি একেবারে তার গা ঘেঁষে তীরবেগে এগিয়ে গেলো। 'কলকাতা আর-একটু হ'লেই', রাণী হেসে বললে,

'আপনার ভালোবাসার উপর প্রতিশোধ নিতো। আসুন, পেইভমেণ্টে ওঠা যাক।'

'মোটরগাড়ি জিনিসটাকে আমি খুব পছন্দ করি, যতক্ষণ তার ভিতরে থাকি। কিন্তু পায়ে হেঁটে যখন চলি, তখন অবিশ্যি মাঝে-মাঝে…' কথাটাকে অশান্ত অসমাপ্ত রাখলে।

'মাঝে-মাঝে মনে হয়, the world is too much with us—না, কী?'

'কিন্তু সত্যিই যে তা-ই। ওয়ার্ডস্বার্থের সময় কী-ই বা ছিলো? আজকালকার পৃথিবী—too much, too much।'

'আমাদের দেশে অন্তত নয়।'

'এখন পর্য্যন্ত নয়, সে-জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু যে-হারে আমরা সভ্য হ'য়ে উঠছি, আমাদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখন থেকেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।' লতার সান্ধ্যসম্মিলন অশান্তর মনে পড়লো, সেই উত্তাপ, ভারি নেশার মত সেই গন্ধ, সেই জ্বরগ্রস্ত চাঞ্চল্য, উত্তেজনা-আকাঙ্ক্ষা। কোনো-না-কোনো অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের মতামত গঠন করি; মুখে আমরা যে-সব বিশ্বাস প্রকাশ করি, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দাঁড় করাই, তার মূলে—হ'তে পারে অনেক দূরে, হ'তে পারে মনের অচেতনায়—কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকেই। 'লক্ষণ দেখা যাচ্ছে', অশান্ত বলে' চললো, 'যাতে মনে হয় আমরাও সাদা মানুষদের সভ্যতার অচলায়তনে বন্দী হ'য়ে পড়ছি। ইংরেজ শাসনের কুফল এতদিনে ফলতে আরম্ভ করেছে। বেচারা পঞ্চক কেঁদে মরছে—কিন্তু কে-ই বা তার কান্না শোনে! সে একটা আপদ—গলা টিপে তাকে মেরে ফেলো। তারও দরকার হবে না বোধ হয়, অন্যমনস্ক-ভাবে রাস্তা পার হবার সময় একদিন সে মোটর চাপা পড়বে।'

'এমনো হ'তে পারে যে নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে পঞ্চক সভ্যতার এক স্তম্ভ হ'য়ে দাঁড়াবে ?'

'যদি তা হয়, একই কথা। সে যে মরবে, তাতে কোনো ভুল নেই। আর, এরই মধ্যে বোধ হয় আধ-মরা হ'য়ে পড়েওছে। আফিম ঢুকেছে তার মগজে। আমরা সবাই আধ-মরা হ'য়ে পড়েছি—সমস্ত জাতটা: যেন কোনো নেশার ঝোঁকে, কোনো কৃত্রিম উত্তেজনায় কিল্‌বিল্‌, কিল্‌বিল্‌ করছি।'

'যে-দেশের লোক হু'বেলা ভালো করে' খেতে পায় না, তাদের খুব সজীব হ'তে আশা করা যায় না।'

'সে-কথা এখানে উঠছে না', একটু অসহিষ্ণুভাবে অশান্ত বলে' উঠলো। সে একটু অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো, রাণীর মুখ থেকে এ-কথা শুনতে সে আশা করেনি হু'বেলা ভালো করে' যারা খেতে পায় না, অশান্তর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী ? রাণীই বা তাদের সম্বন্ধে কী জানে ? ফস্‌ করে' দারিদ্র্যের ওজুহাত খাড়া করা—তা খুব সোজা, বড় বেশি সোজা। সমস্ত তর্কের এটা হচ্ছে শেষ উত্তর, এর উপর আর কথা চলে না। খাতায়-পত্রে যারা দেশ, যাদেরকে চোখেও কখনো দেখিনে, তারা হু'বেলা ভালো করে' খেতে পায় না, আমার সমস্ত পাপের এটা যেন একটা ক্ষমা। এদিকে···লতা সমদ্দারের যদি মাঝে-মাঝে খাদ্যাভাব ঘটতো, তাহ'লে হয়-তো রঙিন ধোঁয়ার পরদা অত গাঢ় হ'তো না, অমন শ্বাসরোধকারী হ'তো না কেয়াফুলের গন্ধ। 'কিন্তু পাঁচবেলা যাঁরা খুব ভালো করে'ই খেতে পাচ্ছে', নিজের চিন্তার জের টেনে সে বললে, 'তারাই বা কী ? তারা কেন আধমরা ? আমাদের কী-যেন একটা হয়েছে। The world is too much with us'.

'কিম্বা এখন পর্য্যন্ত যথেষ্টই হয়-তো হয়নি। শুধু পৃথিবীটার নাগাল পাবার চেষ্টা চলছে।'

'কিন্তু আগে তো এ-রকম ছিলো না। মধুসূদনের আমলের কথা ভাবুন। সধবার একাদশীতে যে-জীবন পাওয়া যায়, তার কথা মনে করে' দেখুন। উচ্ছৃঙ্খল, অসংযমী, আমাদের আধুনিক রুচির পক্ষে একটু বেশি স্থূল হয়-তো, কিন্তু জীবনের কী পরিপূর্ণতা! কী ঐশ্বর্য্য! আমরাও আজকাল উচ্ছৃঙ্খল হবার চেষ্টা করি, কিন্তু কী হই? একসার কলের পুতুল—নেপথ্য থেকে ইলেকট্রিক শক্-এর তাড়নায় কিল্‌বিল্, কিল্‌বিল্-করছি।'

'অতীত সব সময়েই স্বর্ণযুগ।'

বিরক্ত, অশান্ত মাথা-ঝাঁকুনি দিলে। 'কথা-কাটাকাটি করে' লাভ কী? আপনি কি তা অ নু ভ ব করেন না—আমি যা বলছি?'

'আপনি যতটা করেন, ততটা নয় নিশ্চয়ই।'

অশান্ত পাশাপাশিভাবে রাণীর দিকে তাকালো। মুখের যে-আধখানা দেখা যাচ্ছে, তা ফিরলো না, রাণী সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। অশান্তর সঙ্গে-সঙ্গে সে হেঁটে চলেছে, তার মধ্যে একটা শান্ত গোছের শক্তি; যেন গোপন একটা সঞ্চয়, উপলক্ষ পেলে যা মুক্ত হবে, প্রবলভাবে ফেটে বেরুবে। মুহূর্ত্তের জন্য, অশান্ত তীব্রভাবে আগুনের মত সেই জীবন সম্বন্ধে সচেতন হ'লো, রাণীর মধ্যে যা লুকিয়ে জ্বলছে; তার মাংসের মধ্যে প্রায় তাকে অনুভব করলো। আশ্চর্য্য নয়, রাণীর দিকে আর-একবার তাকিয়ে সে ভাবলে, আশ্চর্য্য নয়, রাণী এই বন্ধ্যা নিষ্ফলতা অতটা অনুভব করবে না। বোধ হয় তার নিজেরই দোষ; সে-ই বোধ হয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলেছে, বা কোনোদিন খুঁজে পায়নি, এবং সেইজন্য দোষ দিচ্ছে বর্ত্তমান সময়কে, নিমচাঁদও যার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিলো, যাকে দোষ দেওয়া সব চেয়ে সোজা। সে নিজেও বোধ হয় সেই শূন্যবিহারীদেরই একজন (হ'তে পারে,

অন্য-কোনো প্রণালীতে) যাদের উপর, এবং সেই কারণেই, তার এত রাগ। সে-ও হয়-তো তার নিজস্ব এক রঙিন পরদার পিছনে বসে' আছে, যা হচ্ছে গিয়ে সাহিত্য। তা-ই কি? তা-ই কি? সত্য উত্তরটা বড় বিপদের হ'য়ে উঠতে পারে; অশান্ত সেটা এড়াবার চেষ্টা করলো। নিজের মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যস্ত, সে রইলো চুপ করে'। রাস্তার একটা জায়গায় দু'দিকে বড়-বড় গাছ; উপরে, তাদের ডালে-ডালে জড়াজড়ি হ'য়ে আকাশকে রেখেছে প্রায় আড়াল করে'। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সখের জাপানি লণ্ঠনের মত গ্যাস জ্বলছে। পাৎলা কাপড়ের মত ফুরফুর করছে অন্ধকার। সেই সংক্ষিপ্ত অ্যাভেনিউ দু'জনে নীরবে পার হ'লো। দক্ষিণ দিক থেকে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়েলের দৃশ্য সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্য হ'লো না। তার পর তারা যখন মোড় ঘুরে উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে, 'আমাদের প্রবৃত্তিগত জীবন একেবারে চাপা পড়ে গেছে', অশান্ত হঠাৎ বলে' উঠলো, 'আর সেটাই হয়েছে সর্ব্বনেশে ব্যাপার।'

'প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ—সভ্যতা তা ছাড়া আর কী?'

'হ্যাঁ, তা-ই। যুদ্ধ—প্রবৃত্তিগুলোকে বাগে রাখবার জন্য। কিন্তু তাদেরকে যদি মেরেই ফেলা হয়, মানুষ তাহ'লে থাকে কোথায়?'

'কিন্তু মেরে ফেলতে দেবেন কেন?'

'দেবো কেন তা কি আমার হাতে? চারদিকে বুদ্ধির চর্চ্চা। যুক্তির জয়জয়াকার। বিজ্ঞান আর ব্যবসা। বিজ্ঞান মানে অবিশ্যি অ্যাপ্লাইড সায়ান্স, যা দিয়ে নিত্য-নতুন স্ত্রী-বাঁচানো, সময়-বাঁচানো, পরিশ্রম-বাঁচানো সব যন্ত্রপাতি বার করা যায়। আট ঘণ্টা করে' খেটে পয়সা করো, তারপর বিজ্ঞান-অনুমোদিত উপায়ে তা ওড়াও। তা যদি না পারো, বসে' পড়ো, গোল্লায় যাও। জীবন সুখের; সুখ করে' নাও: ত্যাখো

পরস্পর

আমরা তোমার সুখের সব সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছি। নাক টিপে ধরে' গলা দিয়ে সুখ ঢেলে দেয়া—কী চমৎকার! যদি এ-ব্যবস্থায় তুমি আপত্তি করো, তুমি সমাজের শত্রু, সভ্যতার শত্রু। নিজের ইচ্ছামত গলায় সুখ কি দুঃখ যা-হোক ঢালবার চেষ্টা করা—তা তুমি কিছুতেই করতে পারবে না। অন্যে যা করে, তা-ই করতে হবে। কাজ আর সুখ—এর বাঁধা রুটিন থেকে বিরাম নেই। কাজ কমছে, সুখ বাড়ছে। গোরু-ছাগলের দেখবার অনুপযুক্ত সব ফিল্ম, রেডিয়োর ইনোনো-বিনোনো চীৎকার, পাগলের মত খামকা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় দারুণ বেগে ছুটোছুটি করা—এই-সব? এর মধ্যে কোথায় প্রবৃত্তির স্থান? এর মধ্যে আমার ইমোশনকে কী করে' বাঁচিয়ে রাখবো? আজকালকার পৃথিবী যে ও-সব জিনিস চায়ই না।'

'জানিনে।' স্পষ্ট বোঝা গেলো, অশান্তর এ-সব কথা রাণীর মনে ঠিক লাগলো না। 'কিন্তু তা-ও যদি হয়', একটু পরে সে বললে, 'এর বদলে আপনার প্রস্তাব কী, শুনি? মানুষকে বর্ব্বর অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান? তথাকথিত নোব্‌ল্ স্যাভেজ দেখলে আপনিই হতাশ হবেন সব চেয়ে বেশি।'

'নোব্‌ল্ স্যাভেজ সম্বন্ধে এমনিও আমার মনে কোনো মোহ নেই। আর এর বদলে, এর বদলে আদৌ কিছু হ'তে পারে কিনা; আর হ'লেও, কী হ'তে পারে—ও-সব বলা আমার কাজ নয়। আমি শুধু প্রতিবাদ করতে পারি।'

'এবং এতক্ষণ ধরে' আপনি তা ছাড়া আর কিছুই করেননি' রাণী হেসে উঠলো।

'এ-ই তো একমাত্র উপায়', অশান্তও সে-হাসিতে যোগ দিলে, 'যাতে এখনো মনে করতে পারি যে আমরা বেঁচে আছি। অবিশ্রান্ত

প্রতিবাদ করতে থাকবো, আর সেই সঙ্গে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, তার মধ্যে আরো নিবিড়, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়বো—যদ্দূর দেখতে পাচ্ছি, এই-তো রয়েছে কপালে। সেবা করবো বুদ্ধিবৃত্তির, আর মুখে করবো প্রবৃত্তিগত জীবনের জয়গান।'

'ও-দুটোকে শত্রু মনে করছেন কেন?'

'হাড়-হাড়ে তা টের পাচ্ছি বলে'।'

'কিন্তু—"এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল।"'

'আছে? সেটা খুঁজে পাওয়া যায়?'

'যায় বইকি। খুঁজলেই পাওয়া যায়। অন্তত, নিজের জীবনে। আজকালকার পৃথিবীর যা হবার হোক, সে কী চায় আর না চায়, তা ভাববার আমাদের দরকার কী? আপনি আমি নিজেদের ইচ্ছেমত বাঁচি, কে তাতে বাধা দেবে? ও-সমস্ত হচ্ছে শুধু কথা—কথা; আসলে, আমাদের নিজেদের উপরই তা নির্ভর করছে। সম্পূর্ণরূপে।'

তাদের প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া প্রায় শেষ হয়েছিলো, বাকিটা পথ আর কোনো কথা হ'লো না। অশান্তর আরো বলবার ছিলো, কিন্তু কী যেন, তার ইচ্ছে করছিলো না। ফেরবার পথটাও সে বেশির ভাগ চুপ করে'ই রইলো।

পরদিন সকালে, রাণী যখন চলে' যাচ্ছে, 'আবার কবে আসবেন?' অশান্ত জিজ্ঞেস করলো, 'সেই শনিবার?'

'এই তো, সামনের শনিবার', বলে' রাণী হাসলো। রাণী চলে' যাবার পর খানিকক্ষণ অশান্তর ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো, কোনো কাজে মন বসলো না। কিছু ভাবতে গেলেই রাণীকে মনে পড়ে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গরমের ছুটি এসে পড়লো ; রাণী রয়ে' গেলো কলকাতাতেই। 'সমস্ত জীবনই তো লক্ষ্ণৌয়ে কাটিয়ে এলাম', বাসন্তীর প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'আর এখানে তো এলামই মোট সেদিন। তা ছাড়া, খরচ আছে।'

'ছুটিতে তাহ'লে আমাদের এখানে এসে থাক্', বাসন্তী বললেন, 'কালই চলে' আয়।'

কিন্তু রাণী রাজি হ'লো না। তাদের বোর্ডিঙে আরো দু'জন মাষ্টারনি থেকে যাচ্ছে ; সব রকম ব্যবস্থা যেমন ছিলো, থাকবে ; কোনো অসুবিধেই হবে না। বরং বেশ শান্তিতে, আরামে থাকা যাবে। এতগুলো, এতগুলো দিন সম্পূর্ণ তার হাতের মুঠোয়, এদেরকে নিয়ে যা-খুসি-তাই সে করতে পারে। একটা সম্পত্তি পাওয়ার মত। আর, মুক্ত হওয়া, একা হওয়া—এই সম্পত্তির উপভোগে অবিজড়িত থাকা, তার মনের প্রতি তন্তু এই আকাঙ্ক্ষায়, এই আনন্দে টান হ'য়ে উঠছিলো। না, বোর্ডিঙেই সে থাকবে। বাসন্তী পিড়াপিড়ি করলেন না, কিন্তু মনে-মনে যে একটু দুঃখিতও না-হ'লেন, তা নয়। তিনি নিজের মনে ব্যাপারটা মাত্র একভাবে বোঝাতে পারলেন : তা এই যে রাণী তাঁদের কাছে ঋণগ্রস্ত হ'তে অনিচ্ছুক ; এবং যেখানে ঋণের চেতনা সেইখানেই খানিকটা ব্যবধান। 'আজকালকার মেয়েরা', রাণী চলে' গেলে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করলেন, 'নিজের উপর বড় বেশি নির্ভর করতে চায়।'

'কে-ই বা না চায়!' ফস্ করে' মালতী বলে' উঠলো, 'আর কবেই বা না-চেয়েছে!' এবং কথাটা বলে' ফেলেই তার মনে হ'লো, না-বললেই ভালো ছিলো। তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে' রাখতে সে এত অভ্যস্ত যে কখনো অসাবধানভাবে তার ব্যতিক্রম ঘটলে মনে হয়, যেন নিজেরই কাছে কোনোভাবে সে কপট আচরণ করলো। যেন নিজেকে সে ফাঁস করে' দিয়েছে, ধরিয়ে দিয়েছে। সে যা, সে তা-ই, কিন্তু দাদাকে সে তা টের পেতে দেবে না, মা-কে তো কখনোই নয়। সে যা-কিছু বলে, সবই যেন বুদ্ধিবৃত্তির কথা, শান্তমনে ভেবে-দেখা, বিচার-করা; ব্যক্তিগত অনুভূতির ঝাঁজ তাতে যেন ফুটে না-ওঠে। কিন্তু সেই ঝাঁজই তার এ-কথায়...সে সামলাতে পারেনি, আর নিজের কানেই তা ঠেকেছিলো। 'যাই বলো, মা', কথাটাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি সে বললে, 'বোর্ডিঙেই রাণী থাকবে ভালো।'

'তোদের ভালোমন্দ তোরাই বুঝিস্।'

'বুঝি বইকি, মা', ইচ্ছাকৃত শান্ততার সঙ্গে মালতী বললে।

অশান্ত মনে-মনে আশা করছিলো—এক হিসেবে বলতে গেলে, ইচ্ছা করছিলো, রাণী ছুটিতে তাদের বাড়িতে থাকবে। সেই ধরণের ইচ্ছা যাকে আপনি সামলাতে পারেন না, যার উপর আপনার কোনো হাত নেই, যা স্রেফ আপনার উপর চেপে বসে: যে-ইচ্ছা অস্বস্তি, শেষ পর্য্যন্ত, আশঙ্কা। রাণীর অসম্মতিতে, তাই, আশান্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। আসলে, সে চায় না রাণী খুব বেশি কাছে থাকে। রাণীর সঙ্গে, ইতিমধ্যে একরকমের অন্তরঙ্গতা তার হয়েছিলো, কিন্তু তার খুব বেশি কাছে থাকা সে চায় না। সে-রকম অন্তরঙ্গতা নয়, ঘন থেকে ঘনতরো নৈকট্যে যা পরিপূর্ণতা সন্ধান করে; তা শুধু একটা পারস্পরিক স্বীকার, একের অন্যকে মেনে নেয়া, জীবন-সংঘটনের মধ্যে

গণনা করা। দুই ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ, সংঘাত। আর অনিবার্য্যরূপে, প্রচ্ছন্নভাবে একটা প্রতিকূলতার ভাবও ছিলো। দু'জনে যখন গল্প করছে, একসঙ্গে হেসে উঠছে, তার মধ্যেও সেই কঠিন প্রতিকূলতা— অবরুদ্ধ, সঙ্গোপন, কিন্তু তাহ'লেও অনস্বীকার্য্য, নিঃসংশয়রূপে উপস্থিত। যেন সব সময় পরস্পরকে তারা প্রতিরোধ করছে, স্বীকার করে' নিতে বাধ্য হবার জন্য একজন চেষ্টা করছে অন্যের উপর প্রতিশোধ নিতে। একত্র হ'তে, কথা বলতে তারা ভালোবাসে; সে-সব কথা স্বচ্ছন্দ, সঙ্কোচ কি দেখানোপনার—গোড়ায় একই জিনিস—নিপীড়ন থেকে মুক্ত, যেন কোথাও তাদের মধ্যে একটা প্রবল ঐক্য রয়েছে। এবং সেই ঐক্যকেই তারা অবিশ্বাস করে, যেন তাকে তার সম্পূর্ণ গতিতে ছেড়ে দিলে দু'জনেই কোনো অনিশ্চিততায় তলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। সেই ঐক্য অপরিচিত, অপরীক্ষিত একটা শক্তিশালী রাসায়নিকের মত: কোনো দৈবসংযোগে যদি তা তীব্রভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে···না, সে-জন্য তারা প্রস্তুত নয়। সেইজন্যই এই বিরোধিতা, এই সংঘাত। বিরামহীন, এই সংঘাত একটা ক্ষুব্ধ আলোড়ন, অস্থির, প্রত্যাশায় কম্পমান—এ থেকে যেন তাদের মধ্যে নতুন-কোনো জিনিসের জন্ম হচ্ছে।

রাণী তার বোর্ডিঙেই থাকবে—তা-ই ভালো। বাড়িতে রাণীর উপস্থিতি তার সচেতনতার উপর একটা ভারের মত: সপ্তাহশেষে রাণী যখন আসে, সে খুসি হয়, কিন্তু সেই খুসির সঙ্গে থাকে একটা উৎপীড়নের চেতনা। কেউ যেন তাকে দাবি করছে, তাকে দখল করতে চাইছে। নিজের উপর অন্যের দাবিতে সে অভ্যস্ত নয়। ছেলেবেলা থেকে বিচ্ছিন্নতার নিজস্বতায় সে অবরুদ্ধ: সেই দুর্গে কোনো আক্রমণ শেষ পর্য্যন্ত টি'কতে পারেনি। স্বপ্নের মত, কালো চুলের নিচে লতার প্রেত-শরীর—তা-ও মিলিয়ে গেলো; স্বপ্নের মত, অন্ধকারে অর্দ্ধ-নিদ্রায় প্রেত-

উপস্থিতির আকস্মিক অনুভূতির মত মিলিয়ে গেলো। নিজের মধ্যে সে রচনা করেছে একটা নির্জ্জনতা, যাকে সে কোনো রকমেই ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে পারে না। এটা তার স্বভাবের অংশ। বাল্যকাল থেকেই, যূথবদ্ধ হবার পশু-প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে যখন প্রবলতম থাকে, সে মোটের উপর নিজের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে কাটিয়েছে। আর সেই আবদ্ধতায় কল্পনা দিয়েছিলো জানলা খুলে, যার ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে সে দেখতো। তাতেই তার আনন্দ, প্রায় সমগ্র পরিপূর্ণতা। যেটুকু অভাব থাকতো, তা পরিপূর্ণ হ'তো তার মা-কে দিয়ে। মা ছিলেন বাস্তবের সঙ্গে তার সেতু, তার আর দৈনন্দিন জীবনের সব ঘটনার সঙ্গে সর্ব্বদা-উপস্থিত দোভাষী। যে-সব জিনিস সে বুঝতো না বা বুঝতে চাইতো না তার মা ছিলেন তার পক্ষে সে-সবের মীমাংসা; যে-সব ব্যাপারে সে ঘাবড়ে যেতো, অস্বস্তি বোধ করতো, এমনকি, ভয় পেতো, তা থেকে নিশ্চিন্ত ও স্থায়ী আশ্রয়স্থল। শৈশবের অস্পষ্ট, আদিম থিয়লজি অনুসারে মা-কে সে দেখেছিলো ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন করে'। তার মা-র শক্তি অসীম: তার মা সুন্দর, সক্ষম, ভীষণ। তা ছাড়া, তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য, সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করে' দেবার জন্যই মা আছেন—এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের তা ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হ'তে পারে? মা-কে সে ভালোবাসতো, মনে-মনে পূজো করতো, অস্পষ্ট, অন্ধকারভাবে ভয় পেতো। মা, অনেক রহস্যময় শক্তির প্রতীক—যে-শক্তি তার ক্ষুধার উদ্রেক হ'লেই তা নিবৃত্ত করে, তার ঘুমের সময় ব্যবস্থা করে নরম বিছানার, অসুখের সময় আয়োজন করে নানা আরামের, যে-শক্তি তার ভালো লাগার জন্য আকাশকে করেছে এত নীল, প্রজাপতিকে এত চঞ্চল, যে-শক্তির জন্য বর্ষার বাজ তাকে মারছে না, বৃষ্টির সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে ভিজতে হচ্ছে না, যা তার প্রয়োজনে সমস্ত পৃথিবীকে খাটাচ্ছে,

অফুরন্ত আনন্দে ভরে' রেখেছে তার জীবন, যার জন্য সে আছে। সেই শক্তি—তাকে তার সঙ্গোপন একাত্ব, তা-ও সে সমর্পণ করতে পারে—সে যদি তা-ই চায়। বস্তুত, আর কারো কাছে এই সমর্পণ করতে সে এতটা উন্মুখ হয়নি, যতটা তার মা-র কাছে হয়েছিলো। অন্য-সব লোকের কাছে, বাইরের সব মেলামেশা, সম্পর্কস্থাপনের আড়ালে, সে তার মূলগত দূরত্বে বিচ্ছিন্ন; কারো কাছেই সে নিজেকে 'দেয়'নি, তার গভীর নির্জ্জনতা রয়েছে অস্পৃষ্ট। এবং রাণীর উপস্থিতি যেখানে আক্রমণ করতে চায়, তাকে সে রোধ করে, তা থেকে পলায়ন খোঁজে। ভিতরে-ভিতরে ইচ্ছার সঙ্গে বিরোধী ইচ্ছার সংগ্রাম চলে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে, অশান্তর এই একাকীত্ব তার জীবনকে সঙ্কীর্ণ, অসম্পূর্ণ করে' রেখেছে; এটা তার প্রকৃতির একটা অভাব। চলিত ভাষায় জীবনকে জানা বলতে যা বোঝায়, তা তার ঘটেনি, তা ঠিক। এখন পর্য্যন্ত, তার আর বাস্তবের মাঝখানে বাসন্তী দোভাষীর কাজ করছেন। ও-সব জিনিস, দিন থেকে দিন জীবন-যাপনের যত গা-ঘষাঘষি, বাইরেকে আমলে আনা বাসন্তীর উপর ন্যস্ত, এবং তা-ই থাকবে। সেটাই নিয়ম। অশান্ত, অন্তত, তা-ই জানে। ও-সব জিনিস নিয়ে তার ভাববারও দরকার করে না। সে আছে তার নিজের পৃথিবী নিয়ে, নিজেকে নিয়ে। সে-পৃথিবী বিশাল, সে-পৃথিবী রহস্যময়; প্রতি পদে সেখানে নতুন-কোনো আবিষ্কারের সম্ভাবনা; তা-ই নিয়ে সে বড় বেশি ব্যস্ত। তার বাইরে যেটুকু তা অতি সামান্য; এবং তা সে জেনেছে পরোক্ষভাবে, বাসন্তীর মধ্যস্থতায়, ব্যাখ্যায়। এবং এ-সম্বন্ধে রাণী নিশ্চেতন ছিলো না, জীবনের প্রত্যক্ষতাকে জানবার অশান্তর এই অনিচ্ছা, অনিচ্ছাজনিত অক্ষমতা। 'তুমি কি', চসার-সম্বন্ধে অশান্তর দীর্ঘ ও উচ্ছ্বসিত এক বক্তৃতার শেষে রাণী তাকে

জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তুমি কি চিরকাল কবিতার কাচের বাড়িতেই বাস করবে?'

অকৃত্রিম আমোদে অশান্ত পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে উচ্চহাসি করে' উঠেছিলো। 'কিন্তু বাড়িটি সুন্দর, যা-ই বলো।'

'সেইজন্যই তো বেশি ভয়। অন্য জিনিসটাকে একবার চেষ্টা করে' ছাখো না—একটা পরিবর্তন হিসেবে?'

'অন্য জিনিস? কী অন্য জিনিস?' তারপর, রাণীর কাছ থেকে তখন-তখন কোনো উত্তর না পেয়ে, ঈষৎ ঠাট্টার সুরে: 'তোমারও কি অভিজ্ঞতা-cult নাকি? একদল আছে, জানো তো, যারা সত্যিকারের ঘটনার সংখ্যা দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা মাপে?'

'অনুভব করা, সংগ্রাম করা, দুঃখভোগ করা—এবং শেষ পর্য্যন্ত জানা, আমার কাছে তো এটা কিছু কম মনে হয় না।'

'বাঃ, বেঁচে-থাকাটা এ ছাড়া আর কী? যে যেভাবেই জীবন কাটাক্, তুমি যা বললে, তা তার হবেই—না-হ'য়েই পারে না। সচেতন-ভাবে বেঁচে থাকাই তো অভিজ্ঞতা; না-হয়, জীবন তো সকলের পক্ষে এবং সব সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরিজি উপন্যাসের মত ঘটনাবহুল ও উত্তেজনাময় হ'তে পারে না।'

'হ'লেও খুব সুখের হ'তো না। কিন্তু তুমি যে আছো মেঘের আড়ালে—'

'প্রথমে ছিলো কাচের বাড়ি, তারপর হ'লো মেঘ। কিন্তু, উপমা যা-ই হোক্, সেটা যে দরকার; নিছক আত্ম-রক্ষার জন্য। ভেসে গিয়ে কোনো লাভ আছে?'

'ভেসে-যাওয়া?' রাণীর সহাস্য চোখ অশান্তর মুখে এসে পড়েছিলো, 'তোমার, অশান্ত, তোমার অন্তত সে-ভয় নেই।'

'"So much the worse for you"—তা-ই তো? কিন্তু এই তথাকথিত জীবনবাদীদের কথা আমি সত্যি বুঝতে পারিনে। অভিজ্ঞতার কথা, জানবার কথাই যদি বলো, সে একটা জিনিস, যা সচেতন মন থাকলে আপনিই আসে, যে-কোনো অবস্থাতেই আসে; তার জন্য কোমরে গাঁট বেঁধে রাস্তায় বেরোতে হয় না। এবং তা থেকে কে কতটা লাভ করতে পারছে, তা অবিশ্যি নির্ভর করে এক-একজনের গ্রহণক্ষমতার উপর। এমন নয়, বাইরের ঘটনা যার জীবনে যত বেশি, সে-ই তত বেশি জানে। কাকে ধরবে? ধরো, লর্ড বায়রন, ধরো নেপোলিয়ন। তাঁরাই কি মস্ত বাঁচনেওয়ালা? যে-লোক একবার ভালোবেসেছে, সে প্রেমের যা জানে, লর্ড বায়রন তার অসংখ্য প্রণয়িণী নিয়ে তার বেশি কিছু জানেননি। নিতান্ত ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারে বিরোধী শক্তির উপর নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করতে পারা আর অস্টারলিৎস্-জয় একই জিনিস। কারণ, মনের দিক থেকে সব অভিজ্ঞতারই মূল্য সমান। তা ছাড়া, এটা খুব স্পষ্ট কথা যে মানুষের জীবন এত ছোট, স ব জিনিস প্রত্যক্ষভাবে জানা তার পক্ষে অসম্ভব। তুমি যদি এতটুকু জানো, বাকিটা অনুমান করে' নিতে পারো—এবং সে-অনুমানে ভুল হয় না। সেখানেই কল্পনা আসে, আসে চিন্তা। তারই তো ফল কাব্য আর দর্শন। নিজের ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে থেকে সমস্ত বিশ্বকে তুমি জানতে পারো।'

'যদি সে-ঘরে রাজ্যের যত বই থাকে', বলে' রাণী হেসে উঠেছিলো।

'বইয়ের উপর তুমি এত বিরূপ কেন? বইও তো একটা অভিজ্ঞতা।'

'আসল কথা কী, জানো? আসল কথা, তোমার জীবন অত্যন্ত সুখের; কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঝক্‌মারি নেই—আলগোছে, গায়ে ফুঁ দিয়ে থাকা তোমার পোষায়। তা না-হ'লে—'

'কী হ'তো? আমি কি এর চেয়ে কিছু অন্যরকম হ'তাম? ও-সব

কিছু কাজের কথা নয়; আমরা যে যে-রকম জীবন কাটাতে ইচ্ছে করি, তা-ই কাটাই। অবস্থায় কিছু এসে যায় না।'

'টের পাবে, যদি কখনো সে-রকম কোনো চাপ পড়ে।'

'লোকে যাকে বলে জীবনের ফ্যাক্টস্, তার কথাই যদি বলো, সে যে এখনই কিছু-কিছু টের না পাচ্ছি, তা নয়। কিন্তু ও-সব টের পেয়েও আলগোছে থাকা সম্ভব। সত্যি-সত্যি তো আর আফিমখোরের মত স্বপ্নের মধ্যে আমার দিন কাটে না। আমি যা চাই, তা শুধু মুক্ত থাকতে; সব সময় আমি আমিই থাকতে চাই জড়িয়ে পড়তে চাইনে।'

'শুধু মুক্ত থাকতে! এমনভাবে বলছো, যেন ব্যাপারটা খুবই সামান্য।'

'সাধারণ তো বটে। সবাই যে তা-ই চায়। তুমিও তা-ই চাও।'

'কী করে' জানলে?'

'চাও না?'

'কিন্তু এ-ও কি ঠিক নয় যে দায়িত্ব এড়ানোকে অনেক সময় মুক্ত হওয়া বলে' ভুল করা যায়?'

'দায়িত্ব? নিজের প্রতি দায়িত্ব সবার আগে। নিজের পরিপূর্ণতার জন্য একটা মহান স্বার্থপরতা দরকার।

'ধরো—তোমার যদি একরাশ ভাই-বোন থাকতো, বিধবা দিদি তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে পড়তো এসে তোমার উপর, তাহ'লে কোথায় থাকতো তোমার নিজের পরিপূর্ণতা? তখন কি তোমার স্বার্থপরতা খুব মহান দেখাতো? তাহ'লে তুমি সব সময় নিজত্ব বজায় রাখবার কী ব্যবস্থা করতে পারতে?'

'তাহ'লে আমার প্রতি প্রকাণ্ড অন্যায় করা হ'তো, এ-ই শুধু

বলতে পারি। কিন্তু যা হয়নি, তা বলে' আমাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা কেন? তা ছাড়া, তুমি যা বলছো, ও-রকম আমার কখনো হ'তোও না: কারণ, যার জীবনে যা-কিছু ঘটে, তা ঠিক তার নিজেরই মত।'

'কথাটা শুনতে খুব আরামের বটে। কিন্তু এ স্বচ্ছন্দেই ভাবা যায় যে তোমার বই কেনবার যথেষ্ট টাকা নেই: সেটা তোমার মত হবে না। তুমি গাড়ি কিনতে পারো না, তোমাকে বাস্-এ চড়তে হয়; বলতে পারো, এটা তোমার মত নয়। আর, যে-ব্যক্তির খাদ্যের অভাব হচ্ছে, সে-ঘটনা কি ঠিক তারই মত? কী বলবে তুমি এর উত্তরে? শুধু এ-কথা বলতে পারো যে দৈবক্রমে তোমার জীবন তোমার নিজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তেমনি, দৈবক্রমে আর-একজনেরটা না-ও মিলতে পারে। ক্যালিবন ছ'টা পোকাকে ছেড়ে দিয়ে সাতেরটাকে ধরে। কেন, তার কোনো কারণ নেই। তার খেয়াল। তেমনি দৈব।'

'দৈব যা-ই হোক্, তোমার অন্তত তার সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছু থাকতে পারে না। ভেবে দেখতে গেলে, তোমার চাকরিটা কিছু খারাপ নয়। এবং তোমারও একরাশ ভাই-বোন কি তেমন কোনো হাঙ্গাম নেই। এতক্ষণ নেহাৎই ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল তর্ক করছিলে।'

'আমার সত্যি দেখতে ইচ্ছে করে, তুমি কোনো হাঙ্গামে পড়েছো— সত্যিকারের হাঙ্গামে।'

সেদিন কথাবার্তা আর এগোয় নি; কিন্তু পরে অশান্ত ভেবেছিলো, সে-সব কথার অন্তর্লীন যে-সত্য, তা-ই রাণীকে বলা হয়নি। এবং তা হচ্ছে এই যে সব মানুষেরই নিজের মধ্যে একটা মায়াচক্র গোছের আছে, যার মধ্যে সে বাঁচে। সেখানে তার অপার নিঃসঙ্গতা: সেখানে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পৃথিবী-স্বাধীন। কোনো অবস্থা-বিপর্যয়, দৈবের কোনো আঘাতের প্রতিক্রিয়া সেখানে পৌঁছতে পারে না; কোনো

অন্তরঙ্গতা তার বহিঃসীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। সেখানে, অচ্ছেদ্য গোপনতায় সম্পূর্ণরূপে সে নিজে। বাইরে থেকে আমরা যে-মানুষ দেখি—যে সামাজিক জীব, তার পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি, প্রতি মুহূর্ত্তের তুচ্ছ সুখদুঃখে নিত্য-আন্দোলিত—তাকে দেখে কী করে' ধারণা করা যায় সেই অভ্যন্তরীণ স্তব্ধতার, প্রশান্তির? আমাকে ঘিরে আছে যে-মায়াচক্র, অশান্ত ভাবলে, রাণী তার কী জানে? আর, রাণী—তারও নিশ্চয়ই একটা নিজস্ব মায়াচক্র আছে—সেই গহন রহস্যের লেশমাত্র আভাস আমি কখনো পাবো না। জীবনের সমুদ্রে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত দ্বীপ আমরা মানুষ; বাতাস বয়ে' আনে এক দ্বীপে দ্বীপান্তরের গন্ধ; আভাস পাই তার শস্যের, জলবায়বিক প্রকৃতির, কিন্তু সেখানেই আমাদের সংযোজনার সমাপ্তি। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, আমাদের চারদিকে অশ্রান্ত স্রোতের মত নিঃসঙ্গতা বইছে। প্রত্যেক মানুষের সে-একাকীত্ব কখনোই ঘোচবার নয়।

রাণী ময়দান-অঞ্চলে বেড়াতে ভালোবাসে; কিন্তু অশান্তর সময় নেই। সপ্তাহে ছ'দিন, ময়দানের সীমানায় পশ্চিমের আকাশ যখন সূর্য্যাস্তে ফেটে পড়ছে, সে তার ইলেকৃট্রিসিটি-জ্বালা আপিসের টেবিলের উপর মাথা নিচু করে' বসে' মন্তব্য লিখে যাচ্ছে প্যাসিফিকে কোন্ জাহাজডুবির উদ্ধার-সাধনের উপর, বার্লিনের রাজপথে কম্যুনিস্ট্ দাঙ্গার, লণ্ডনে সদ্য-আগন্তুক কোনো জাভানি নর্ত্তকীর কৃতিত্বের, সরকার-প্রকাশিত আসাম-সংক্রান্ত কেতাবের উপর। ইচ্ছামত, তাই, বেড়ানো হয় না। রাণীর ছুটি হ'লে পরে, এডিটরকে বলে'-কয়ে' অশান্ত সময়টা বদলে নিলে। সাধারণমত, দিনের বেলা কাজ; বিকেলে ছুটি, সন্ধেটা তার নিজের। এত সহজে এ-পরিবর্ত্তন সাধিত হ'লো যে সে একটু অবাকই হ'লো; শুধু সাহস করে', এখন সে বুঝতে পারলো, একটু

বলতে পারলে অনেক আগেই এ হ'তে পারতো। কিন্তু এর আগে সন্ধেবেলা মুক্ত থাকবার বিশেষ-কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করেনি। যা ছিলো, চলতে দিচ্ছিলো। ও-সময়ে—বা অসময়ে—কাজ করতে তার খুব যে একটা খারাপ লাগতো, তা নয়।

প্রায়ই তারা একসঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটে আসতো—রাণী আর সে। শান্ত আনন্দে ভরা, সেই সব বেড়ানো: যেন তাদের ভিতরটা আসন্ন সন্ধ্যার মতই শান্ত-সোনালি হ'য়ে উঠেছে। সময় আর বাস্-এর পয়সা বাঁচাবার জন্য তারা ঠিক করলো, হোয়াইটেওয়েজ বাড়ির সামনে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছু'জনেই এসে উপস্থিত হবে। ছু'জনেই, দেখা গেলো, পাংচুয়েলিটির আতিশয্যে ভুগছে। এক-একদিন একই সময়ে ছুই বিপরীতগামী বাস্ থেকে রাস্তার ছু'দিকে তারা নামতো। কলকাতায় ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে; ভিড় এড়াবার জন্য তারা হাঁটতো দক্ষিণদিকে, গাছে ঢাকা লাল সুড়কির রাস্তায় কি মাঠের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়ে, নিরুদ্দেশভাবে, যখন যেখানে খুসি তারা ঘুরে বেড়াতো।

রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে অন্য সব কাজ, সব কথার আড়ালে রাণীর চিন্তা থাকতো অশান্তর মনে: জটিল বহুযন্ত্রনির্গত কোনো সঙ্গীতে প্রচ্ছন্ন একটা একটানা সুরের মত—স্পষ্টভাবে শ্রাব্য নয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বরং মন দিয়ে অনুভাব্য। সে-চিন্তা তার দৈনন্দিন, নিয়মিত জীবন-যাপনে বাধা দিলে না, কোনো বৈষম্যের সৃষ্টি করলে না। বরং, সেটা একটা সুরসাম্য, নিখুঁতভাবে মিলোনো। সে-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতনও হ'তে হয় না; চেতনার তলদেশে লঘুভাবে তা শায়িত; ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে অত্যন্ত লঘু, প্রায় অশরীরী একটা স্পর্শের মত অশান্তর মনে রাণীর চিন্তার বিরামহীন সুর।

পরস্পর

'আজ দুপুরে কী করেছি, জানো?' একদিন ময়দানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে রাণী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে।

'কী করেছো?'

'চেহারা দেখে বুঝতে পারছো না?' রাণী অশান্তর দিকে তার মুখ ফেরালো। অশান্তর দৃষ্টি রাণীর চোখের উপর এসে পড়লো। 'না', পরীক্ষা শেষ করে' সে বললে, 'বুঝতে পারছিনে।'

'ঘুমিয়েছি—পূরো চার ঘণ্টা। একটু বেশিও হ'তে পারে।'. একটু পরে, অশান্তর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে, 'কী আর করা!' রাণী বললে, 'তোমাদের দেশটা যা গরম!'

'আর যে-দেশ থেকে আসছো, তা বুঝি নয়?'

'কিন্তু সেখানে এত ঘাম হয় না।'

'তাহ'লে আর কী? এ-দেশে যখন এসেছো, বাঙালির জাতীয় বদভ্যাসগুলো তোমাকে নিতেই হবে। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌ও দিনে ঘুমোতেন।'

'কিন্তু যা-ই বলো, বেশ লাগে ঘুমোতে। খেয়ে উঠে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে' আধো-অন্ধকারে একটা মাসিকপত্র নিয়ে শোয়া—ঠিক যে-মুহূর্তে অক্ষরগুলো ঝাপসা হ'য়ে আসে, বইটা খসে' পড়ে হাত থেকে—কী আরাম, ভাবো তো!'

'এ-হারে এগোতে থাকলে ডেপুটি-গিন্নি হ'তে তোমার বেশি দেরি নেই—এ-ই শুধু বলতে পারি।'

রাণী হেসে উঠলো।—'কিন্তু ডেপুটি-গিন্নিরাই বা খারাপ কিসে?'

'না, খারাপ নয়; খুব ভালো। সেইজন্যই তো বলছি। জীবনের প্রত্যেক দুপুর ঘুমিয়ে কাটাতে পারবে। বাঙলা মাসিকপত্রের মত ভালো soporific কমই আছে।'

'নাঃ, ওদের উপর তুমি বড় বেশি চটা।'

'ছাখো, খামকা খানিকটা সময় একেবারে নিশ্চেতন হ'য়ে ছিলাম, এ-কথা চিন্তা করলেই ভয়ানক মন খারাপ হ'য়ে যায়। যায় না? চার ঘণ্টা: টুর্গেনিয়েফের কোনো উপন্যাস শেষ করবার, চমৎকার একটা ছোট গল্প লেখবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। অথচ তুমি তা ঘুমিয়ে কাটালে।'

'কিন্তু এর বেশি আমাকে দিয়ে কি কিছু হ'তো? শুধু চার ঘণ্টা কেন, সমস্ত জীবন ভরে' চেষ্টা করলেও আমি একটা ছোট গল্প লিখতে পারবো না। আর টুর্গেনিয়েফ—সব সময় কি আর ভালো সাহিত্যের সময়? মাঝে-মাঝে বাঙলা মাসিকপত্রও পড়তে হয়।'

'থাক্', একটু অসহিষ্ণুভাবে অশান্ত বাধা দিলে, 'আর বলতে হবে না। অপচয়ের মত পীড়াদায়ক কিছু নই—এই শুধু আমি বলছিলাম।'

'ধরো, অপচয় করতেই যদি আমার ভালো লাগে?'

'কিন্তু ঘুমিয়ে? যতক্ষণ ঘুমোও, ভালো কি মন্দ কিছুই যে লাগে না। আর সেখানেই আমার আপত্তি।'

'লাগে; ঘুমিয়ে পড়বার আগে ভালো লাগে। আর জেগে উঠে।'

'ভয়ানক খারাপও লাগে।'

খানিকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ হাঁটলো। আর পর অশান্ত বললে: 'তোমার ইস্কুল খুললে, রাণী, ঘুম সম্বন্ধে মেয়েদের একটা essay লিখতে দিয়ো।' "O sleep, it is a gentle thing, blessed from pole to pole—" এ-ই তো সবাই লিখবে। আর হেনরি দি ফোর্থের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা—সে তো আছেই। এবং সে-সব কথা যে ঠিক তা, একবার যে অনিদ্রারোগে একটু ভুগেছে, সে-ই বুঝবে। কিন্তু যাকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানো, তাকে ঘুমোতে দেখলে কেমন লাগে? বিশ্রী লাগে না? মনে হয় নাকি, যার এত বুদ্ধি, এত সজীবতা—তার কিনা

এ-অবস্থা, পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে, কিছুই তার খেয়াল নেই, তার সম্বন্ধে ধারণা তখনকার মত কেমন-যেন নিচু হ'য়ে যায়। সে যদি মাতাল অবস্থায় তোমার সামনে এসে আবোল-তাবোল বকতো, তাহ'লে যেমন হ'তে পারতো। ঘুমও তো মৃত্যু, হ্যাম্লেট তা-ই ভেবেছিলো। কিন্তু ঘুম একটা সাময়িক মৃত্যু, জীবনকে যা নতুন প্রাণ দেয়। তার বেশি যে-ঘুম নিষ্প্রয়োজন, তা মৃত্যু ছাড়া আর কী? কারণ, আমাদের চেতনা যখন ঘোলাটে হ'য়ে যায়, অন্ধকার হ'য়ে যায়—যখন আমরা মাতাল হই বা দুপুরবেলা চার ঘণ্টা ঘুমোই, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে বাঁচিনে। সে-অবস্থায় আমরা কিছু-না হ'য়ে যাই, সে-সময়টা একটা ফাঁকা সচেতনতাই তো জীবন।'

'তা তো বুঝলাম', রাণী বললে, 'কিন্তু চার ঘণ্টা ঘুমের বদলে চার ঘণ্টা মেয়ে পড়ানো—সেটাই কি খুব একটা সচেতন কাজ? বেঁচে থাকা?'

'যাতে বাকি সময়টা বাঁচতে পারো, সে-জন্যে তার দরকার। আপত্তি করতে পারো, এড়াবার উপায় নেই। বর্ত্তমান পৃথিবীর যা ব্যবস্থা, তাতে বাকি সময়টা যদি বাঁচতে পারো, তা-ই যথেষ্ট মনে করবে।'

'যা-ই হোক, সবার আগে তো শারীরিক অর্থে বাঁচতে হবে—তারপর অন্য কথা। সুতরাং আমার মেয়ে-পড়ানোই বা মন্দ কী?'

'না, মন্দ আর কী? সব্-এডিটরি কি হাকিমি কি কেরানিগিরি কি অন্য যে-কোনো কাজেরই মত ভালো—এবং খারাপ। আমি আগে মনে করতাম আমার সব্-এডিটরির মত বিশ্রী কাজ আর নেই; কিন্তু এখন দেখছি, আসলে সবই সমান, আমাদের বিশাল সভ্যতা-যন্ত্রের আমরা এক-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চাকা। তার বেশি কিছু নয়।'

'আজকালকার দিনে তারাই শুধু ভালো আছে, যাদের কাজই

আনন্দ। যেমন লেখকরা, চিত্রকররা, বৈজ্ঞানিকরা। কোনো দিকে কোনো বিশেষ ক্ষমতা না-থাকলে—ঐ তুমি যা বললে, চাকা হ'য়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সাধারণের এমন দুর্দ্দিন কখনো আসেনি।'

'এবং সাধারণই হচ্ছে হাজারে ন' শো নিরানব্বুই। কিন্তু একেবারে যারা সাধারণ, তাদের জন্য ভাবনা নেই, ঈশ্বর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাদেরকে এই বর দিয়ে পাঠান যে কিছুই তাদের গায়ে লাগবে না, কিছুই তার টের পাবে না। কিন্তু মাঝামাঝি এক শ্রেণী আছে, যারা বিশেষ কোনো ট্যালেন্ট্ নিয়ে জন্মায় না, অথচ যে-কাজ কোনো ট্যালেন্টের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ নয়, তার ভীষণ দুঃসহতা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যাদের আছে। এবং যে-জগতে ক্ষেতের শস্য দশ হাত ঘুরে আমার হাতে পৌঁচচ্ছে, সেখানে বসে'-বসে' খাওয়া অসম্ভব। সুতরাং কিছু একটা করতেই হয়। আমার মনে হয়, নিছক জীবিকার জন্য যে-কাজ করতে হয়, যাতে কোনো-না-কোনো রকম আত্মপ্রকাশের আনন্দ নেই, তা সবই সমান soul-killing. অথচ এত লোক তো আছে, আত্মার অস্বাস্থ্যের জন্য তাদের কাউকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত মনে হয় না। দেখে শুনে মনে হয় আমরা ভুল জেনেছি, মানুষের আত্মা বলে' কোনো জিনিস নেই।'

'কিম্বা তা এমন একটা জিনিস, যা কিছুতেই মরে না।'

'সব চেয়ে ভালো', অশান্ত তার নিজের কথার জের টেনে বললে, 'সব চেয়ে ভালো আদৌ কোনো কাজ করতে না-হওয়া।'

'সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী?' দ্রুতদৃষ্টিতে রাণী একবার অশান্তর মুখে তাকালো, 'যদিও তাতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার ডেপুটি-গিন্নি বনে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

কথা বলতে-বলতে অনির্দ্দিষ্টভাবে কোথায় যে তারা এসে পড়েছিলো

খেয়াল ছিলো না। মাঠের মধ্যে অন্ধকার জমে' এসেছে; তাকিয়ে দেখলো, দূরে একটা লাল আলোর মালার মত চৌরঙ্গি ঝল্‌মল্‌ করছে। এস্‌প্লানেডের উপরকার আকাশ ইলেকট্রিক সাইনের দীপ্তিতে থেকে-থেকে তামাটে হ'য়ে উঠছে। ইলেকট্রিক হাউসের উপরকার রক্তাভ গোলক কোনো মাতাল দৈত্যের ঘূর্ণ্যমান একচক্ষুর মত। রাণী বললে, 'চলো ফির।'

'তুমি আমার কাছ থেকে কিছু বই নিতে পারো পড়তে—যদি ইচ্ছে করো', ফেরবার পথে অশান্ত বললে।

'আমার বইয়ের দরকার থাকলে চেয়েই নিতুম; তোমার অনুমতির অপেক্ষা রাখতুম না।'

'দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম, আমি যা ভালোবাসি, অন্য-একজনও তা-ই ভালোবাসবে। ভুলটা ক্ষমার যোগ্য।'

'অশান্ত', একটু চুপ করে' থেকে হঠাৎ রাণী জিজ্ঞেস করলে, 'কেন তুমি চাও, অন্য সবাই ঠিক তোমার মত হোক্?'

'সবাইকে চাইনে। কিন্তু তোমাকে চাই—হয়-তো।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যখন চেনা হয়েছে', রাণী হেসে ফেললো, 'আর যা-ই হোক, আমার শিক্ষার ত্রুটি হবে না। এর মধ্যে কি আমাকে কম ইংরিজি কবিতা পড়তে হয়েছে!'

'খারাপ লেগেছিলো তোমার?'

'তা ছাড়া, দ্যাখো', অশান্তর প্রশ্নের সোজা উত্তর না-দিয়ে রাণী বলতে লাগলো, 'অত পড়বার সময় কোথায় আমার? আর যে-দু'টি মেয়ে এখন বোর্ডিঙে আছে, তাদের সঙ্গে গল্প করতে হয়। চমৎকার ওরা দু'জনেই। একজনের দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার অছিলায় গ্লাসগোয় আছেন; সেই ভদ্রলোকের জীবনচরিত লেখবার পক্ষে যথেষ্ট আমি

জেনে ফেলেছি। আর-একজন, তাকে মোভ রঙে বেশি ভালো দেখায় কি হেলিয়োট্রোপে, এর মীমাংসা করতে আমাকে দস্তুরমত মাথা ঘামাতে হয়েছে। এর পরে যেদিন যাবে, তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তোমার ভালো লাগবে ওদেরকে।'

'বই পড়তে ভালোবাসবার অপরাধের জন্য', অশান্ত বললে, 'যথেষ্ট তিরস্কৃত হয়েছি। আর কত?'

মুহূর্ত্তের জন্য রাণী আলগোছে অশান্তর হাতের উপর তার হাত রাখলে। শুধু বললে, 'অশান্ত।'

'এ-জায়গাটা একটু উঁচু-নিচু', অশান্ত বললে, 'সাবধানে হেঁটো।'

রাণীর বাস্-এর জন্য তারা যখন অপেক্ষা করছে, অশান্ত হঠাৎ আবিষ্কার করলো যে এই সমস্তটা সময় সে ছিলো গভীর, অনির্ব্বচনীয়রূপে সুখী। রাণীর মুখের দিকে একটু সময় সে তাকিয়ে রইলো; তারপর জিজ্ঞেস করলে: 'আবার কবে আসবে?'

'কাল', রাণী বললে।

পরদিন বিকেল ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় অশান্ত হোয়াইটেওয়ের মোড়ের কাছে বাস্ থেকে নামলো। চারদিকে তাকিয়ে রাণীকে দেখতে পেলো না। এক্ষুনি এসে পড়বে নিশ্চয়ই—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে অশান্ত অপেক্ষা করতে লাগলো। একটার পর একটা বাস্ এসে দাঁড়াচ্ছে; অশান্ত তাকাচ্ছে ব্যগ্রদৃষ্টিতে—প্রতিবারই আশা করছে যে এক্ষুনি রাণীর মূর্ত্তিকে সে নামতে দেখবে। রাণীর অন্বেষণকারী চোখ যে-মুহূর্ত্তে তার মুখের উপর এসে পড়বে, রাণীর মুখে অন্ধকারে হঠাৎ-আলোর মত ফুটে উঠবে হাসি, অশান্ত দেখতে পাবে তার সুসম্বদ্ধ, ছোট, সাদা দাঁতের ক্ষণিক ঝলক—সেই মুহূর্ত্তের প্রত্যাশায় অশান্তর মন ভরে' উঠলো আনন্দে। 'এই যে, এত দেরি করলে কেন?' 'উঃ, তিন নম্বর

বাস্-এর কথা আর বোলো না; মৌলালির মোড়ে এক ঘণ্টা।' মনে-মনে, ফুটপাথের জনস্রোতের মধ্যে তার সামনে দাঁড়ানো রাণীর শরীরকে অশান্ত একবার আগাগোড়া দেখে নিলে। হঠাৎ তার মনে হ'লো, রাণীকে কখনো সে ভালো করে' ছাখেইনি: রাণী ডান দিকে কি বাঁ দিকে সিঁথি কাটে, তা-ও সে মনে করতে পারে না। শুধু কথা কয়ে'ই সময় কাটিয়েছে; তাকে দেখতে, জানতে সে যত্ন নেয়নি: কথা বলতে-বলতে তার মুখের সূক্ষ্ম সব ভাবান্তর—তার মুখোমুখি বসে', তার পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে, তা-ও সে লক্ষ্য করেনি। রাণীর হাতের কেমন আকৃতি? অশান্তর মনে বিস্ময়ের সহিত এ-প্রশ্ন জাগলো, কেমন দেখায় তার আঙুলগুলো, যখন কোনো জিনিস ধরবার জন্য তারা বেঁকে যায়। অশান্ত জানে না। রাণীকে ভাবতে তার যেটুকু মনে পড়ে, তা শুধু তার ঋজু, শান্ত দৃষ্টি, যার মধ্যে ঝিলিমিলি গোপন হাসি; আর তার মুখের সেই হঠাৎ-আলোর মত হাসি, তার উষ্ণ গাত্রবর্ণকে যা উষ্ণতরো আভায় সজীব করে' তোলে। কিন্তু এর বেশি, রাণীর সম্পূর্ণ মেয়ের শরীর, তার স্পষ্ট আবয়বিক ছবি—তা মনে করতে গেলেই কেমন এলোমেলো হ'য়ে যায়। এখানটা ঝাপসা, ওখানটা শুধু কল্পনা—যে-রকম হ'লে তার ভালো লাগে। বেশি দেরি নেই, এক অদ্ভুত, অস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের সহিত সে ভাবলে, এখনই রাণী আসবে, আর একটু পরেই সে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে, মিলিয়ে নিতে পারবে তাকে তার কল্পনার সঙ্গে।

কিন্তু সময় কেটে যেতে লাগলো; বাস্-এর পর বাস্ এসে দাঁড়ালো সেই মোড়ে—এবং চলে' গেলো—রাণী এলো না। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে অশান্তর পা ধরে' গেলো, প্রত্যেকটা বাস্-এর ভিতর উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে চোখ টাটাতে লাগলো। সন্ধে হ'য়ে এলো;

চৌরঙ্গির ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রাণী না-এসেই পারে না, বার-বার নিজের মনে সে বললে, রাণী না-এসেই পারে না। যে-বাস্‌টাকেই আসতে দেখা যায়, মনে হয় এর ভিতরে আছে রাণী, বাস্‌টার বাইরেকার চেহারাই যেন সে-কথা বলছে। প্রতিবারই সে-কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়; আশা সেই অনুপাতে ক্ষীণতরো হ'য়ে আসে, তবু, 'আর পাঁচ মিনিট দেখা যাক্', মনে-মনে এ-কথা বলে' অশান্ত পা দুটোকে একটু বিরাম দেয়ার জন্যে এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করে। পাঁচ মিনিট করে'-করে' আধ ঘণ্টা কেটে গেলো; রাণী এলো না। আর অশান্ত উপলব্ধি করলো, কারো জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলে সে যদি না আসে, তা কী ভয়ানক, কী অসহ্য ব্যাপার। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যাচ্ছে, সে আসছে না। চারদিকে বয়ে' চলেছে দ্রুত জীবনস্রোত; মনে হয়, আজ এই সন্ধ্যায় যেখানে যা কিছু হবার কথা ছিলো, সবই ঘটছে; শুধু সে-ই তার কথা রাখলে না। নিজেকে পরিত্যক্ত মনে হয়, জীবনস্রোত থেকে উৎক্ষিপ্ত; হঠাৎ যেন আমার পারিপার্শ্বিক বিশ্ব থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি। পশ্চিমের আকাশে মেঘস্তূপে খানিকক্ষণ অগ্নি-ক্রীড়া করে' সূর্য্য অস্ত গেলো; রাস্তায় আলো জ্বলবার আগেকার এই সময়ে চৌরঙ্গি যেন নিজস্ব একটা প্রাণ পেয়ে একরকম বন্যতায় জেগে উঠলো। গ্রীষ্মের দীর্ঘ গোলাপি গোধূলির ভিতর দিয়ে অশান্ত অপেক্ষা করলো; রাণী এলো না।

আর হঠাৎ, অশান্তর ভিতরকার সব আলো যেন নিবে গেলো। এই দীর্ঘপরিচিত, প্রিয় চৌরঙ্গি, যানচক্রমুখর, কলকাতার ব্যস্ত হৃৎপিণ্ড এই এস্‌প্লানেড, সুন্দর এই নগরস্থলী, যার সঙ্গে সে রক্তের সংযোগ অনুভব করে' এসেছে—কালো পরদার মত সবার উপর নেমে এলো অন্ধকার। সব যেন মুছে গেছে; যেন, যে-সব অদৃশ্য সুস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বস্তুকে এতকাল ধারণ করেছে, তারা গেছে পড়ে', এখন সব ফাঁকা, শূন্য। ভয়ানক শূন্যতা, যার মধ্যে অশান্তর নিজের অস্তিত্বই যেন বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। চৌরঙ্গির বন্য প্রাণস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে তার অসহ্যরকম পরিত্যক্ত মনে হ'তে লাগলো; পারিপার্শ্বিক বিশ্ব যেন হঠাৎ তাকে অস্বীকার করছে, উৎক্ষেপ করছে। সে একা; জীবনে কখনো তার এমন ভীষণরকম একা লাগেনি। কিছু করবার নেই; কোনো-খানে যাবার নেই; চৌমাথায় দাঁড়িয়ে, কোন্‌দিকে সে ফিরবে ঠিক করতে পারলো না, সব দিকই তার পক্ষে সমান। রাণী আজ আর এলো না, এ-কথা উপলব্ধি করবার পরও সে খানিকক্ষণ, নিশ্চল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো লতার প্রশ্ন: 'আপনার যখন একা-একা লাগে, তখন আপনি কী করেন?' 'কিছুই করিনে', চিন্তাহীনভাবে, মনে-মনে লতার উদ্দেশে হেসে অশান্ত বলে-ছিলো, 'সময় কেটে যেতে দিই।' তখন পর্য্যন্ত অশান্ত জানতো না, একা-একা লাগা কাকে বলে। এই অসীম শূন্যতা, মুহূর্ত্তের জন্যও অবিস্মরণীয় পরিত্যক্ততার চেতনা—এর আগে সে কখনো এর স্বাদ জানেনি; এর মত ভয়ানক কোনো জিনিস যে জীবনে থাকতে পারে, এমনও সন্দেহ করেনি। 'ভয়ানক, ভয়ানক ব্যাপার', টেলিফোনের চোঙের ভিতর দিয়ে শোনা লতার সেই ঈষৎ-কম্পিত, যেন করুণ, যেন মূর্চ্ছিত-হ'য়ে-পড়া স্বর অশান্তর মনে প্রতিধ্বনি করে' উঠলো। সত্যি, সত্যি ভয়ানক। লতা যে-একা-একা লাগার কথা বলেছিলো, তা কি এ-ই? এই শূন্যতা, এই অন্ধকার থেকেই কি সেদিন সে তাকে টেলি-ফোন করেছিলো? 'অন্ধকার থেকে আমি আপনাকে ডাকছি', লতা বলেছিলো। সে-অন্ধকার এই; বাগানের তারা-ফোটা, রজনীগন্ধা-আবিষ্ট অন্ধকার নয়। এ-ই কি? এ-প্রশ্ন উত্তরহীন থাকবে। এবং

যেন গতির সাহায্যে, পদক্ষেপের ছন্দ থেকে ঐ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, অশান্ত দ্রুতবেগে চৌরঙ্গি দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। 'আপনার অন্ধকার দিনে আমাকে মনে করবেন', লতা বলেছিলো। সেই অন্ধকার দিন আজ। লতা কি জানতে পারলে খুসি হয় না, তার সেই প্রতিশোধ-কা[illegible]জ পরিপূর্ণ হয়েছে?

প্রবহমান জনস্রোতের ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটার মধ্যে অশান্ত একরকম সান্ত্বনা পেলো। প্রথমত, দ্রুততরো রক্তচলাচল-জনিত শারীরিক উষ্ণতা অবসাদ খণ্ডন করতে সাহায্য করে; তা ছাড়া বিশেষ কোনো স্থানে যাচ্ছি, এক মুহূর্ত্ত সময় নেই, মনকে যথেষ্ট শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজের কাছে এই রকম একটা ভাণ করা যায়; এবং অশান্তর যা মনের অবস্থা, তাতে সেটা মূল্যবান। অন্তত, পুরো একঘণ্টা ধরে' একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে যে-কোনো দিকে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাওয়া অনেক ভালো দেখায়; তাতে 'মুখরক্ষা' হয়। শূন্যতার ভয়াবহতা থেকে যে-কোনো নিষ্কৃতি-সন্ধানী, অশান্ত তার বেগ আরো বাড়িয়ে দিলে। একটু পরেই দেখলো, সে পার্ক ষ্ট্রিটের মোড়ে এসে পড়েছে।

এক সার গাড়ি চৌরঙ্গিতে এসে পড়ছিলো; রাস্তা পার হবার আগে অশান্তকে একটু অপেক্ষা করতে হ'লো। হঠাৎ তার মনে হ'লো, লতা হয়-তো এখন মেলিনিতে বসে' আছে। অত্যন্ত লঘুভাবে, অতর্কিতভাবে মনে হ'লো। লতা সেই নরকের চেয়েও নরম ঘরে সবন্ধু বসে' আছে; কয়েক পা হাঁটলেই অশান্ত তার দেখা পেতে পারে। বলতে পারে, 'আপনার কথা আমি রাখলাম; অন্ধকারে এইবার আপনি আলো জ্বালুন।' এই চিন্তাতেই তার মুখে একটু হাসি খেলে' গেলো। প্রেতের মত, অধঃলোক থেকে এইমাত্র ছাড়া-পাওয়া

কোনো অবাঞ্ছিত অতিথির মত সে পড়বে গিয়ে তাদের মধ্যে, অবাক হ'য়ে যাবে তারা; সে-সময়ে তাদের মুখ-চোখ সত্যি লক্ষ্য করবার জিনিস। অতিরঞ্জিতভাবে, নাটকীয়ভাবে হেসে সে বলবে, 'আপনার শাপ ফলেছে',...যদি সে সেখানে যায়। অতিরঞ্জিত, নাটকীয় স্বরে লতাকে কিছু বলা—তা থেকে আমোদ পাওয়া যেতে [illegible]। তার শূন্যতার অন্ধকারে লঘু-ভাসমান এই-সব চিন্তা; ক্রমে তারা আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলো; কেন যে সে এখন লতার খোঁজে মেলিনিতে যাবে না, অশান্ত তার কোনো কারণ দেখলো না। কিন্তু এ যে আজগুবি, হাস্যকর—তার মন বললে। হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছে, তাই বলে' তা-ই করা! ছেলেমানষি, ইডিয়সি! কিন্তু যখন সে মনে-মনে বলছে এ-কথা, ঠিক সেই সময়ে পার্ক ষ্ট্রিট ধরে' হাঁটতে আরম্ভ করেছে।

মেলিনিতে, রাস্তার উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোট এক টেবিলে লতা আর বিকাশ বসে'। তাদের মাঝখানে টেবিলের উপর বেঁটে, চ্যাপ্টা-পেট একটা অর্দ্ধ-শূন্য বোতল, তার ভিতর একটা সবুজ, স্বচ্ছ-তরল পদার্থ টল্‌মল্ করছে। লতা বসে' ছিলো রাস্তার দিকে মুখ করে', গেলাস থেকে একবার মুখ তুলতেই অশান্তর উপর তার চোখ গিয়ে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে তার ভুরু উত্থিত হ'লো উপর দিকে, দু'ঠোঁট অতি, অতি সামান্য একটু ফাঁক হ'য়ে গেলো, চোখের দৃষ্টির এমন এক ভাব হ'লো, যেন সে স্বপ্ন দেখছে। 'কী সৌভাগ্য!' খানিকক্ষণ পর, যেন হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সে বলে' উঠলো, 'কী সৌভাগ্য!'

বিকাশ একটা সিগ্রেট ধরাতে যাচ্ছিলো; জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে নিয়ে ফিরে তাকালো।—হেলো! অশান্ত যে! So jolly good of you to have looked in. Everything O. K.? আমরা ভাবছিলাম—

'Oh, *damn!*' আগুনটা তার আঙুলে গিয়ে লেগেছিলো। তাড়াতাড়ি সেটা ফেলে দিয়ে, 'জীবনে তোমার আবির্ভাব এত বিরল!' বিশুদ্ধ বাঙলা বলবার একটা প্রেরণা থেকে সে বলে' ফেললো, 'এ-বিষয়ে, অশান্ত, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার মিল আছে।' বলে' নিজেই উচ্চহাসি করে' উঠলো।

চেয়ারের হাতলের উপর শায়িত বাঁ হাত তুলে লতা শূন্যের উপর অত্যন্ত মৃদু একটা বাড়ি মারলো।—'এর চেয়ে একটু আস্তে হাসাও কী তোমার পক্ষে সম্ভব নয়?' তারপর অশান্তকে: 'বাঃ, বসবেন না?'

অশান্ত মাথা নাড়লো, কিন্তু তখনই বসলো না। মুহূর্ত্তের জন্য, সে তার দৃষ্টিকে লতার উপর বিলাস করতে দিলে: লতার সাড়ি ম্লান-সবুজ; কাপড়টা এমন যা থেকে আলো পিছলে পড়ে—বরং, যা ভেদ করে' আলো একেবারে লতার শরীরের উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাড়িটা যেন আলো দিয়েই বোনা; যেন, ঘরের ইলেকট্রিক আলোয় নয়, তারই ভিতরকার কোনো দীপ্তিতে লতা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আগাগোড়া ম্লান-সবুজ একটা আভা—তার দীর্ঘ, স্বচ্ছ কর্ণাভরণ পর্য্যন্ত তার মাথা-নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ আলো-কণা নিঃসৃত করছে। অকপটে, অশান্তর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। লতার মুখ থেকে টেবিলের মধ্যস্থিত চ্যাপ্টা-পেট বোতলের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'একটা সবুজ সিম্ফনি—না, কী?

'একটা সবুজ স্বপ্ন!' বলে' বিকাশ তার গেলাসে চুমুক দিলে।'

'একটা সবুজ দুঃস্বপ্ন!' একটু দূরে দেয়ালসংলগ্ন একটা আয়নার দিকে লতা দৃষ্টিপাত করলে। 'কিন্তু আপনি বসছেন না কেন?'

'বসছি, কিন্তু আগে আমার সবুজ পরীকে অভিবাদন জানিয়ে নিই।' হঠাৎ চেয়ারের হাতলে শায়িত লতার বাঁ হাত দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে অশান্ত তার ঠোঁটে স্পর্শ করলো।

'বাঃ, বাঃ!' যেন ভালো একটু অভিনয় দেখে বাহবা দিচ্ছে. এইভাবে বিকাশ বলে' উঠলো।

'আজ মোটে দু'জন যে?' লতার ডানদিকে একটা চেয়ারে বসে' অশান্ত জিজ্ঞেস করলো।

'Such is life', বিকাশ বললে। তারপর বোতলটাকে এক আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে:

'খাও একটু?'

'না।'

'ক্রেম-দ্য-মন্ত্—বেশ ভালো লাগে খেতে।'

'না।'

'অন্য-কিছু? যা তোমার ইচ্ছে—বলো।'

'কিছুই এখন খাবো না, থাক্।

বিকাশ তার দিকে তার সোনার সিগ্রেট-কেইস এগিয়ে দিলে, 'একটা সিগ্রেট অন্তত নাও।'

'তুমি তো জানো আমি সিগ্রেট খাইনে।'

'একেবারে শাপভ্রষ্ট দেবশিশু!' লতা বলে' উঠলো।

'ছিলাম', উপযুক্ত ভঙ্গি-সহকারে অশান্ত বললে, 'যতক্ষণ না, সবুজ পরী, তোমার উপর চোখ পড়েছিলো। যে-মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখলাম—'

'কী হ'লো?' যেন ডারহামস্-মোহনবাগানের খেলার খবর জানতে চাইছে, লতা জিজ্ঞেস করলো।

'"তোমার সে-চোখের তিমিরে"', অশান্ত তার প্রিয় আধুনিক কবি থেকে আবৃত্তি করলে, '"লোষ্ট্রসম সপ্তস্বর্গ ডুবে গেলো মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া।"'

'আ, আশন্ত, কবিতা আওড়াতে তুমি একজন বটে!' ভালো করে'

একটা বলো না, শুনি। সেই যে—'"কালি মধুযামিনীতে জোছনা-নিশীথে—"'

'আঃ, চুপ করো না তুমি।' লতা বাধা দিলে। 'যে-কোনো উপলক্ষ্যে আওড়াবার মত কবিতার পুঁজি থাকা ভারি চমৎকার কিন্তু', বিকাশ চুপ করলে পর তার মধুরতম ও সূক্ষ্মতম হাসি হেসে লতা বললে।

'তুমি যতক্ষণ কাছে থাকো, পুঁজি না থাকলেও চলে। তোমার প্রভাবে সাধারণ মুখের ভাষাও কবিতা হ'য়ে উঠতে চায়।'

'অশান্ত', বিস্মিত প্রশংসা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললে, 'কবে শিখলে তুমি এত কথা বলতে ?'

'একটু স্থূল ফ্ল্যাটারি, তা-ই নয় ?'

'যে যে-জিনিস বুঝতে পারবে, তাকে তাই দিতে হয়।'

'আমার সম্বন্ধে তোমার উচ্চ ধারণার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি দেখে খুসি হ'লাম। বোঝা যাচ্ছে, তোমার মাথা ঠিকই আছে।'

'মাঝে-মাঝে', বিকাশ একটা এপিগ্রাম করবার লোভ সামলাতে পারলে না, 'মাথা ঠিক না-রাখাই মানুষের নৈতিক কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়ে।'

লতার চোখের পাতা মুহূর্ত্তের জন্য তার চোখের উপর বুজে এলো। 'জাহান্নমে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে', চিন্তাশীলভাবে সে বললে, 'অন্তত, গন্তব্যস্থানে যতক্ষণ না-পৌঁছও।'

টেবিলের উপর দু'কনুই রেখে, চুলের ভিতর আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে অশান্ত বসে' ছিলো, টেবল-ক্লথের উপর তার দৃষ্টি আবদ্ধ। চোখ তুলে লতাকে তার দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করে' সে বলে' উঠলো, 'কিন্তু, লতা, এ তুমি করছো কী ?'

'কী করেছি ?' নিরাসক্ত, তার সাধারণতম স্বরে লতা জানতে চাইলো।

'এত আকর্ষক হবার অধিকার কোনো মানুষেরই নেই। এ যে রীতিমত অশ্লীল!'

'তুমি আজকে প্রীতিকর কথা বলবে বলে' পণ করে' বেরিয়েছো, মনে হচ্ছে।'

'রীতিমত অশ্লীল!' বিকাশ পুনরাবৃত্তি করলে; তারপর বিশেষ-কোনো কারণ ছাড়া সশব্দে হেসে উঠলো।

'লতা', বিকাশের হাসির মাঝখানে অশান্ত জিজ্ঞেস করলো, 'এখনো কি তোমাদের বাগানে রজনীগন্ধা ফোটে?'

'That reminds', হাত বাড়িয়ে বিকাশের কেইস থেকে একটা সিগ্রেট নিয়ে লতা বললে, 'নক্ষত্রদের কোনো চক্রান্তে বাড়ির সব লোক আজ একযোগে অদৃশ্য হয়েছে। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।'

'এখনই!' যদি কেউ তাকে বলতো, কাল সকালে তার ফাঁসি হবে, তাহ'লেও যেন বিকাশ এর চেয়ে বিস্মিত, ক্লিষ্ট হ'তে পারতো না।

'নিরুপায়। কর্ত্তব্য সবার আগে।'

'কিন্তু একটু সাইডার অন্তত খেয়ে যাও।'

'আজ আর নয়। বাড়িটা একেবারে খালি। অপহরণকারীদের সুবর্ণ সুযোগ।'

'তোমাকে সুদ্ধ যদি অপহরণ করে' নেয়, ধরো?' বিকাশ হাসতে গিয়ে কেশে ফেললো, এবং কাশি গোপন করবার জন্য জোর করে' হাসতে লাগলো।

'সে-আশঙ্কা তো রইলোই!—থাক্', বিকাশের মণিবন্ধের উপর হাত রেখে লতা তাকে বাধা দিলে, 'আমি দিচ্ছি।'

দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে দু'হাতের মধ্যে পাখার হাওয়া থেকে আড়াল করে' অশান্ত লতার মুখের সামনে ধরলো। তার দু'আঙুলের

ফাঁকে সিগ্রেট, লতা গলা বাড়িয়ে মাথা নিচু করলো; কিন্তু আগুনে চুমুক দেবার আগে হঠাৎ একটু থেমে অশান্তর মুখের দিকে চোখ তুললো। এক মুহূর্ত্ত অশান্তর হাতের বাটির মধ্যে আগুনটা ফর্‌ফর্‌ করলো। তার পরেই লতা সৌজন্যের মৃদুমর্ম্মরে বললে, 'ধন্যবাদ।' কিন্তু অশান্তর বুকের মধ্যে তখন একটা মর্ম্মান্তিক নিশ্চয়তা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে লতা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। 'তোমরা এগিয়ে যাও, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'কী হ'লো আবার?' বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।

'টুলটুলকে একটা কথা। এক মিনিট।'

লতা টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'টুলটুল?···সাড়ে-ন'টায় নিউ এম্পায়ারে যাবে?···*Real* gorilla-picture, একেবারে রক্ত-হিম-করে'-দেয়া নাকি।···হ্যাঁ, ওখানেই দেখা হবে।···তৈরি হ'য়ে থেকো তাহ'লে, বিকাশ যাচ্ছে তোমার ওখানে।···আচ্ছা।'

'টুলটুল বললে, বিকাশ', রাস্তায় বেরিয়ে এসে লতা বললে, 'ও সাড়ে-ন'টায় নিউ এম্পায়ারে যাচ্ছে। কী এক গোরিলা-ফিল্‌ম্—বললে, একেবারে নাকি রক্ত-হিম-করে'-দেয়া। জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি ওর সঙ্গে যেতে পারবে?'

'টুলটুল গোরিলাদের যে-রকম ভক্ত হ'য়ে উঠছে···' কথায় যা অব্যক্ত রইলো, বিকাশ তা প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো হাসি দিয়ে। 'কিন্তু তুমি যাবে না?'

'Meanwhile, কর্ত্তব্য সমাপন করে' আসতে হয়। বাইরের লোকটার হাতে আমার টিকিটটা রেখে যেয়ো। তুমি পৌঁছতে-পৌঁছতে টুলটুল তৈরি হ'য়ে থাকবে, বললে।'

ট্যাক্সিতে, তার চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে অশান্ত স্তব্ধ

হ'য়ে বসে' রইলো। 'কী হয়েছে?' অশান্তর ঘাড়ের উপর দিয়ে তার আঙুলের ডগাগুলো একবার চালিয়ে নিয়ে লতা জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে?' অশান্ত অনুভব করলে, তার মাংসের মধ্যে লতার নখের সূক্ষ্ম মুখ বসে' যাচ্ছে, 'এখন তোমাকে কেউ দেখলে মনে করতে পারে, আমি তোমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছি।'

অশান্ত চুলের ভিতর থেকে তার হাত নামালে; কোনো কথা বললে না।

'তোমার সুন্দর চুলগুলোকে অমন করে' নষ্ট করো কেন?' লতার আঙুলের প্রজাপতি-স্পর্শ আস্তে-আস্তে অশান্তর ঘাড় পার হ'য়ে মাথার পিছন দিয়ে উঠে উপরকার চুলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। 'যদি বুঝতে পারতে তোমাকে কী funny দেখাচ্ছে!' অশান্তর সামনের চুলগুলো মুঠির মধ্যে একত্র করে' লতা উপর দিকে তুলে ধরলো, 'একেবারে বন্য পশু। শুধু, মুখটা বুদ্ধের মত। এবং বাক্যহীনতা।' তার চুলের ঝুঁটি ধরে' লতা হঠাৎ এমন জোরে এক টান মারলে যে অশান্ত 'উঃ' বলে' উঠলো। 'আ', লতার মুখ থেকে এক সংক্ষিপ্ত হাসি নির্গত হ'লো, 'এই তো দিব্যি পশুর মত আওয়াজ করছো। যদিও আশানুরূপ বন্য নয়।'

'কেউ ফেরেনি, দেখছি', কয়েক মিনিট পরে, ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিতে-দিতে লতা বললে, 'বাড়িটা একেবারে অন্ধকার।'

পরদিন সকালে গতরাত্রের ঘটনা অশান্ত শুধু অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারলে। যেন এক উগ্র মদ্যনেশার প্রতিক্রিয়ায় সে অবশ, অসাড়। আগের রাত্রে নেশার ঝোঁকে যত কথা বলেছি, যা-কিছু করেছি, এখন সে-সব মনে হচ্ছে যেন অন্য-কোনো ব্যক্তির অনেকদিন আগে শোনা ইতিহাস। তার সমস্ত আত্মার উপর এক বিরাট ভার নিয়ে তার ঘুম

ভাঙলো। ঘুম ভাঙলো, কিন্তু সে চোখ মেললো না, কোনোরকম নড়াচড়া করলো না। যেন সে মরে' গেছে। কাল রাত্রে সে মরে' গিয়েছিলো; এখনো সে মৃত। 'ঈশ্বর, ঈশ্বর', লালসার পিচ্ছিলতায় বেশ একটা গড়াগড়ি দিয়ে ওঠবার অনিবার্য্য এবং অবিলম্ব ফল যে-আধ্যাত্মিকতা, তার প্রেরণায় অশান্ত মনে-মনে বলতে লাগলো, 'ঈশ্বর, ঈশ্বর।' যেন তার আত্মার উদ্ধার-সাধন করবার জন্যই ঈশ্বর আছেন। বিছানায় ঋজুভাবে তার শরীর প্রসারিত, স্তব্ধ, নিশ্চল, তার বোজা চোখের অন্ধকারের মধ্যে, বিশেষভাবে তারই আত্মার মুক্তির জন্য সেই মুহূর্ত্তে সৃষ্ট তার নিজস্ব ঈশ্বরের উদ্দেশে 'ঈশ্বর', নীরবে সে উচ্চারণ করতে লাগলো, 'ঈশ্বর, ঈশ্বর।' চোখ বুজেও ঘরের মধ্যে সে সকাল-বেলার রোদ অনুভব করছিলো, বাড়ির অন্যান্য অংশ থেকে সকালবেলার সদ্য-উত্থিত সজীবতার চিহ্ন ভেসে আসছিলো তার কানে। এর মধ্যে সে নির্ব্বাপিত, সে মৃত। ঈশ্বর, শেষ পর্য্যন্ত এই! গতরাত্রির কোনো বৃত্তান্ত, বিশেষ-কোনো ঘটনা সে মনে করতে পারছে না, চাইছেও না। শুধু তার আত্মার উপর এই বিরাট ভার, এই নেশাচ্ছন্নতার জড়িমা। কী করে' সে তা কাটিয়ে উঠবে, চোখ মেলে' কী করে' আজকের এই আগন্তুক প্রভাতের দিকে তাকাবে? শেষ পর্য্যন্ত এই! চায়ের পেয়ালার টুংটাং শোনা যাচ্ছে, একটু পরেই তাকে উঠতে হবে, বসতে হবে চায়ে—এই চিন্তাতেই যেন তার মন এক অতল গহ্বরে ডুবে গেলো। শেষ পর্য্যন্ত এই! আর সে ভেবেছিলো···! সে যা ভেবেছিলো, সে-রকম তা নয়। তা একটা প্রকটন নয়, একটা প্রতারণা। জীবনের গভীরতরো, সাধারণভাবে গোপন, শুধু কোনো বিরল অপরূপ মুহূর্ত্তে আবিষ্করণীয়—জীবনের গভীরতরো কোনো সত্যে তা জাগরণ নয়; তা বিলুপ্তি, নির্ব্বাপন। চিরাভ্যস্ত কোনো আবরণের আকস্মিক, অকল্পিত-প্রদর্শন-

কারী উন্মোচন নয়; বরং, আরো বেশি গাঢ় গুণ্ঠপাত, যার ফলে, যেটুকু প্রদর্শিত, পরিজ্ঞাত, তা-ও হারিয়ে যায়। অচিন্তনীয়, অসহনীয় যে তা শেষ পর্য্যন্ত এতে দাঁড়াবে। এর সীমাহীন অবমাননা! তার মুখের মধ্যে ছাইয়ের মত, তার মাংসে কোনো পচনক্রিয়াশীল ব্যাধির আবির্ভাবের মত। 'ঈশ্বর', এবার ঠোঁট নেড়ে, প্রায় স্ফুটস্বরে সে বলে' উঠলো, 'ঈশ্বর!'

তার মা এসে একবার তাকে ডেকে গেলেন, সে কোনো সাড়া দিলে না; গভীর ঘুমের ভাণ করে' পড়ে' রইলো। সময় কাটতে লাগলো; রাস্তা থেকে কাগজ-ফেরিওয়ালাদের চীৎকার তার শ্রুতি পর্য্যন্ত ভেসে এলো। তার মনে পড়লো, কয়েক ঘণ্টা পরেই তাকে আপিসে উপস্থিত হ'তে হবে। কথা বলা, কাজ করা—যখন তার মনের মধ্যে এই মৃত্যু, এই পচনপ্রক্রিয়া! সে বুঝতে পারলো, বেশ বেলা হ'য়ে গেছে, কিন্তু ওঠবার কোনো চেষ্টাই সে করলে না। তার উপর দিয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত বয়ে' যেতে দিলে। যদি তাকে আজ আর না-উঠতে হ'তো, যদি এমনি চোখ বুজে শুয়েই সমস্ত দিন সে কাটিয়ে দিতে পারতো!

'দাদা', মালতী তার শিয়রে দাঁড়িয়ে ডাকলে। 'দাদা, ওঠো। চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। ওঠো।' মালতী তার কপালের উপর হাত রাখলে। অশান্ত অনুভব করলো, সেই স্পর্শে তার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছে। পাছে তাকে জাগাবার জন্য মালতী আবার তার গায়ে হাত রাখে, সে তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে মালতীর চোখ এড়িয়ে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মালতীর দিকে তাকাতে সে সহ্য করতে পারছিলো না। সারাদিন সে যেন তার শবকে বহন করে' বেড়ালো; সারাদিন তার শরীর, আর শরীরের মধ্যে তার আত্মা মরে' রইলো।

বিকেলে আপিস থেকে ফিরে সে দেখলো, রাণীর এক চিঠি এসেছে।

'জ্বরে পড়েছি', পোস্টকার্ডের উপর পেন্সিল দিয়ে সে লিখেছে, 'যদিও এ-সময়ে কেন যে জ্বর হবে, তার কোনোই কারণ দেখতে পাচ্ছিনে। যা হোক, যদি পারো আজই সন্ধের দিকে একবার এসো। খানকয়েক তোমার বই নিয়ে এসো; নিজেকে শিক্ষিত করবার জ্বরের মত সুযোগ আর নেই। কাল কি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলে? খুব চটেছিলে তো? রাণী।'

রাণীর অসুখের কথা মা-কে বলা অশান্ত উচিত মনে করলো। 'অসুখ নিয়েও বোর্ডিঙে থাকতে হবে', বাসন্তী বললেন, 'তার কী মানে আছে? অন্তত যে-ক'দিন শরীর না সারে, এখানে এসে থাকুক্ না।'

'ও বোধ হয় রাজি হবে না। তা ছাড়া,' অশান্ত তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলে, 'অসুখ তো আর কিছু সাংঘাতিক নয়।'

'সাংঘাতিক নয়, হ'তে কতক্ষণ! বলিস্ ওকে।'

'বলবো' এর বেশি অশান্ত কিছু বললে না।

চা-খাওয়া সেরেই সে বেরিয়ে পড়লো। বাস্-এর উপরতলায় বসে', রাণীর জন্য যে-সব বই নিয়ে যাচ্ছিলো, তারই একটায় মন বসাবার চেষ্টা করলো। সে চাইলো বাইরের পৃথিবীকে নিজের কাছ থেকে অবরুদ্ধ করে' থাকতে। একটু পরে বইয়ের একটা জায়গায় তার মন আটকে গেলো; খানিকক্ষণ তার আত্ম-চেতনা আর রইলো না।

বইয়ের একটা কথা মনের মধ্যে ভেবে দেখবার জন্য পৃষ্ঠা থেকে সে চোখ তুললো। বাস্ তখন চৌরঙ্গির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। অশান্তর চোখ পড়লো সূর্য্যাস্ত-দীপ্ত ময়দানের উপর; এবং সে-চোখ বইয়ের পৃষ্ঠায় আর ফিরে গেলো না। পৃষ্ঠার উপর একটা আঙুল রেখে বইখানা কোলের উপর মুড়ে সে তাকিয়ে রইলো। একসার গাছের আড়াল পার হ'য়ে হঠাৎ একেবারে ফাঁকা মাঠ দেখা দিলো; অশান্তর চোখের

সামনে পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ। এক তীব্র মুহূর্ত্তে তার যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে এলো; মনে হ'লো, একসঙ্গে এত সৌন্দর্য্য সে জীবনে কখনো ত্মাখেনি। এ-ও যে জীবনে থাকতে পারে, সে মনে-মনে বললে, আমাদের জীবনে এতও যে থাকতে পারে! এই সৌন্দর্য্য-চেতনায় আর বাস্-এর গতির অনুভূতিতে তার শরীরে আস্তে-আস্তে প্রাণ ফিরে আসতে লাগলো। এতক্ষণে, সে অনুভব করলো, তার আত্মা থেকে সেই বিরাট ভার একটু-একটু করে' অপসৃত হচ্ছে। পাষাণের মত অন্ধকার ভেঙে যাচ্ছে আলোয়। সে তা অনুভব করতে পারলো—যে-কোনো বাস্তব, শারীরিক প্রক্রিয়ার মত জ্বলন্ত আকাশ থেকে সূক্ষ্মসঞ্চারী আলোরূপী প্রাণ ঝরে' পড়ছে তার মধ্যে; সে ভেঙে গেলো, আপ্লুত হ'য়ে গেলো, স্নান করে' উঠলো। জীবন তার রক্তস্রোতের মধ্যে চঞ্চল, তার স্নায়ুতে স্পন্দমান। তার মধ্যে এইমাত্র যেন একটা বাঁধ খসে' গেলো; সে মুক্ত; জয়ের নিশানের মত তার আত্মা ঊর্দ্ধ-আকাঙ্ক্ষার আনন্দে আকাশের মধ্যে নিজেকে খুলে ধরেছে। সারাদিন, সারাদিন সে আজ মরে' ছিলো···শুধু এই আলোর স্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হবার জন্য। এ-ই তার জ্যোতির্ম্ময় পুনরুত্থান, ঊর্দ্ধ-লিপ্সু নিশানের মত আকাশকে সে লেহন করছে। সমস্ত পৃথিবী সোনালি-লাল; পৃথিবী যেন কোনো বৃহৎ ফলের মত শতাব্দীর পর শতাব্দী অজ্ঞাত রস-সঞ্চারে আজ এতদিনে সোনালি-লালে পেকে উঠেছে। গাছের পাতাগুলোয় পর্য্যন্ত একটা নতুন দীপ্তি; যেন এই আলোর সংস্পর্শে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রাণ জ্বলে' উঠেছে। অশান্ত অচঞ্চল চোখে তাকিয়ে রইলো; দ্রুতগতি বাস্ প্রতি মুহূর্ত্তে এই সর্ব্বব্যাপী আলোময়তাকে অতিক্রম করে' যাচ্ছে। হঠাৎ, একটু বিস্ময়ের আঘাতের সঙ্গে অশান্ত উপলব্ধি করলো যে সে এতক্ষণ ধরে' যা দেখছে, তা শুধু আর-একটা দিনের

মৃত্যু। মৃত্যু : একটা অবসান, সমাপন : আলোর এই তীব্র শক্তির সঙ্গে, শতাব্দী-সঞ্চারিত রসে পেকে-ওঠা বৃহৎ ফলের মত এই পৃথিবীর সঙ্গে কী করে' তাকে মেলানো যায়? সূর্য্যদেব, তোমার মৃত্যু একটা ঐশ্বর্য্য, মহিমা; তোমার মৃত্যু জীবনের পুনরুত্থান : আমাদের মৃত্যু, একটা অপসারণ, অন্ধকার, বিলুপ্তি। আজ সমস্ত দিন আমি মরে' ছিলাম, আমি জানি। আজ সমস্ত দিন আমি মরে' ছিলাম; তোমার মৃত্যু আমাকে প্লাবিত করে' দিলে নতুন প্রাণে।

বাস্‌টা ধর্ম্মতলার দিকে বেঁকলো; কিন্তু অশান্ত যতক্ষণ সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো সূর্য্যাস্তের লাল আকাশকে, ময়দানের সোনালি-সবুজ আভাকে। কিন্তু একটা সময় এলো, যখন তার দৃষ্টির সীমা থেকে তা অন্তর্হিত হ'লো; যখন যে-কোনো দিকে তাকিয়ে শুধু প্রকাণ্ড, কুৎসিত সব দালান, ফুটপাথে অপরিচ্ছন্ন দারিদ্র্যের ভিড়, নানারকম যানে ব্যস্তদর্শন, ক্লান্তদর্শন, সুখান্বেষী-দর্শন মানুষ-মুখের মিছিল আর দালানগুলোয় ছাতে দো-আঁশলা, তে-আঁশলা সব স্ত্রীজাতীয়ার লাম্পট্য-রুগ্ন দৃষ্টি। একদিকে দিগন্তপ্রসারিত ময়দান-সম্বলিত চৌরঙ্গি থেকে হঠাৎ সঙ্কীর্ণ, যানবাহুল্যপীড়িত, শস্তা বাণিজ্যের কেন্দ্র ধর্ম্মতলায় ঢোকার মত এমন চমৎকার অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স্ পৃথিবীতে বোধ হয় কমই আছে। বাতাসে ধূলো আর মানবতার গন্ধ; ট্র্যামগুলো এগোবার পথ না-পেয়ে প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাচ্ছে; মাঝে-মাঝে কোনো রেস্তোরাঁ থেকে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ গ্রামোফোন। অসময়ে, যেন একেবারে হঠাৎ সন্ধে হ'য়ে গেলো, বাস্‌-এর ভিতর উঠলো আলো জ্বলে'। এতক্ষণে, এ-ই প্রথম, বাস্‌-এর অন্যান্য যাত্রীদের সম্বন্ধে সে সচেতন হ'লো। তার সামনের বেঞ্চিতে বসে' দুটি সুবেশ, সুদর্শন যুবক উচ্চস্বরে গ্রিটা গার্বোর সদ্য-খালাস-পাওয়া এক ছবি নিয়ে আলাপ করছে। আর, যেন

এই-সবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক অসুরাকৃতি লুঙ্গি-পরা মুসলমান বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে তার পাশে এসে বসলো। অশান্ত যদ্দুর সম্ভব সঙ্কুচিত হ'য়ে সরে' বসে' নাকের উপর রুমাল চেপে ধরলো। কিন্তু তার মন থেকে সূর্য্যাস্তের সুর একেবারে কেটে গেলো না।

মনের মধ্যে সেই সুরেরই ক্ষীণ গুঞ্জন নিয়ে সে ঢুকলো রাণীদের বোর্ডিঙের চামড়া-আঁটা চেয়ার-সম্বলিত বসবার ঘরে। সূর্য্যাস্ত যেন তার সত্তার নিহিত গোপনতাকে স্পর্শ করেছে : বিশ্বপ্লাবী আলো এখন অপসৃত, পৃথিবীর মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার; কিন্তু সেই আলোর একটা স্খলিত স্ফুলিঙ্গ রয়ে' গেছে তার মধ্যে। তা একটা ঐশ্বর্য্য, তা তার শরীরে প্রাণ; তাকে সে চেপে ধরছে বুকের উপর, তা থেকে তার সমস্ত শরীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। তার মধ্যে জ্বলছে আলোর শিখা; তাকে সে নিবতে দেবে না। বুকের উপর, বুকের উপর, অন্তরঙ্গ, গোপন, আলোর স্পর্শ। মায়ের বুকে শিশুর মত, নিবিড়, শান্ত। তারই ভিতর থেকে যে এর সৃষ্টি, দারুণ যন্ত্রণায় এ জাত। আর এখন তা তার বুকের উপর, নিবিড়, শান্ত, এর স্পর্শ।

চাকর এসে বললে তাকে উপরে যেতে। রাণীর ঘরে সে এর আগে কখনো প্রবেশ করেনি; চাকরের পিছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে সে নিজের মধ্যে এক অস্পষ্ট উত্তেজনা অনুভব করলে। যেন সে কোনো নতুন আবিষ্কারের প্রান্তদেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাণীর ঘরটি ছোট; সদ্য-চুনকাম-করা দেয়ালগুলো ইলেকট্রিক আলোয় বড় বেশি সাদা। একটা ক্যান্‌ভাসের ইজি-চেয়ারে দরজার দিকে মুখ করে' রাণী বসে'।

'এতক্ষণে!'

'এত শিগগির, রাণী। কিন্তু আমি যে আশা করেছিলাম, তুমি মরতে বসেছো।'

'টম্ কাকার কুটিরের সেই মেয়ের মত। বিছানায় শোয়ানো এক-গুচ্ছ ড্যাফোডিল, আস্তে-আস্তে, মৃদুভাবে, প্রায় অলক্ষিতে মিলিয়ে যাওয়া। কী সুন্দর। ভাবতেও চোখে জল এসে পড়ে।' রাণী হেসে উঠলো। 'শুধু, মৃত্যু ব্যাপারটা ঠিক ও-রকম নয়। আর, কঠিন সমালোচক হয়-তো এ-খুঁত ধরবে যে আমার রঙ ড্যাফোডিলের চাইতে কিছু আলাদা।'

'হ্যাঁ, আলাদা, রাণী। প্রাণের শক্তিতে তুমি অন্ধকার। এমন কি, হিংস্র।'

'আগে বসো; তারপর শুনবো আমার নিজের বর্ণনা। দেখো, সাবধান—চেয়ারটার কিন্তু মাঝে-মাঝে কসরৎ করবার অভ্যেস আছে। পিছনে বেশি জোরে ভর দিয়ো না।'

'জ্বর আছে এখনো?'

'আছে একটু। আটচল্লিশ ঘণ্টা মেয়াদ ঠিক করে' রেখেছি।'

'মা-কে তুমি হতাশ করলে, রাণী!'

'তোমাকেও, মনে হচ্ছে?'

'সত্যি বলতে, একটু করেছো। অন্তত, চার ডিগ্রি জ্বর নিয়ে ছট্‌ফট্ করতে তো পারতে। তোমার জ্বরে পৃথিবী যেন পুড়ে যাচ্ছে। জানো তো, ডন্-এর সেই কবিতা:

"O wrangling schools, that search what fire
Shall burn this world, had none the wit
Unto this knowledge to aspire,
That her fever might be it?"

কী অদ্ভুত কল্পনা। এত বেশি আজগুবি যে হাসাও যায় না।

'কাল কিন্তু ব্যাপারটা খুব ফ্যালনা হয় নি। ছ'টা পর্য্যন্তও আশা করেছিলাম, যেতে পারবো। সকাল থেকেই শরীরটা কেমন-যেন লাগছিলো; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্যি-সত্যি জ্বর এসে পড়বে, ভাবিনি। যখন কিছুতেই আর ঠেকিয়ে রাখা গেলো না, বিছানায় গিয়ে গুটিসুটি শুয়ে পড়লাম। তোমার কথা ভাবলাম: রাস্তার মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছো।'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলে?'

'না-হয় করেইছিলাম।'

'আমি যখন এলাম না, কী করলে তুমি?

প্রশান্ত কোনো উত্তর দিলে না; অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো।

একটু পরে রাণী বললে, 'কাল রাতটা খুব আনন্দে কেটেছে, বলতে পারিনে। তোমার সেই আধুনিক কবির একটা লাইন বার-বার মনে পড়ছিলো: "যখন এ-পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা করি অনুভব।" জ্বর ব্যাপারটা, যা-ই বলো, আধ্যাত্মিকতার মস্ত সহায়ক। জ্বর হ'লে—খুব বেশি না হ'লে অবিশ্যি—বোঝা যায় মধ্যযুগের ক্রিশ্চানরা চিররুগ্ন হ'য়ে থাকাকে কেন পুণ্যের কাজ মনে করতেন।' রাণী হাসলো। 'তারপর, আজ সকাল থেকে আমি খিদেয় মরে' যাচ্ছি—আধ্যাত্মিক খিদেয়। একটা বই নেই যে পড়ি। তুমি সেদিন যখন আমাকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলে, আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলুম মনে করে' নিজেকে কত যে শপেছি, তার ইয়ত্তা নেই। আর-একটা খিদে হয়েছে —কথা বলবার। তা তো বুঝতেই পারছো।'

'কিন্তু তোমার চমৎকার বন্ধুরা—একজন, যার ভাই গ্লাসগোয় পড়ছে—'

'হ্যাঁ, এখন তো তোমার প্রতিশোধ নেবারই সময়।—দেখি, কী-কী বই আনলে?'

'দুটো গল্পের বই—সময় কাটাবার জন্য। আর একটা ব্রাউনিঙের চয়নিকা, পড়বার জন্য।'

রাণী বইগুলোকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলে। ব্রাউনিঙটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে, 'পড়ো না একটা কবিতা।'

রাণীর হাত থেকে বইখানা নিজের হাতে নিয়ে অশান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'কোনটা পড়বো বলো।'

'যেটা তোমার খুসি।'

একটু সময়, অশান্ত অনির্দ্দিষ্টভাবে পাতা উল্টিয়ে গেলো। তারপর, 'না, থাক্', হঠাৎ বই বন্ধ করে' সে বললে।

'থাক্ কেন?' রাণী তার শান্ত চোখের জিজ্ঞাসা অশান্তর দিকে তুললো, 'আমি যে তা-ই চাই।'

অশান্ত ক্ষীণ একটু হাসলো। 'কিন্তু আমি যখন চলে' যাবো, রাণী', একটু চুপ করে' থেকে সে বললে, 'রাত বাড়বে, তবু যদি তোমার ঘুম না আসে, একটি কবিতা তুমি পোড়ো।'

'কোন্টা?'

'স্ট্যাচু অ্যাণ্ড্ দি বাস্ট্।'

'ও তো পড়েছি। মনেও আছে। "And the sin I impute to each frustrate ghost is, the unlit lamp—"'

হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে অশান্ত বলে' উঠলো, 'কিন্তু আলো যে জ্বলেছে, রাণী।'

রাণী প্রথমটায় যেন একটু চমকে উঠলো; অশান্তর কথার অর্থ গ্রহণ করতে যেন তার কিছু সময় নিলে। তার শান্ত আলোর মত

দৃষ্টি অশান্তর মুখের উপর এসে পড়লো। খানিক পরে সে বললে, 'তা জানি।'

'রাণীকে কেমন দেখলি?' অশান্ত বাড়ি ফিরলে পর বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন।

'ভালো।'

'ভালো?'

'মানে—কালকেই সেরে যাবে আর কি। অসুখ কিছু নয়।'

'এতক্ষণ ওখানেই ছিলি নাকি?'

'হুঁ।'

'আর কে আছে ওখানে?'

'আর দু'জন মাষ্টারনি আছে, জানোই তো।'

'তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তোর?'

'না।' অশান্ত একটু অবাক হ'লো, 'কেন বলো তো?'

'ওকে এখানে এসে থাকবার কথা বলেছিলি?'

'কী আর দরকার।'

'ও তো আসেও না অনেকদিন।'

'সেরে গেলেই আসবে।' বাসন্তীর গলার স্বরে একট কাঠিন্য, অশান্ত যাতে অবাক হ'লো, যা তাকে পীড়া দিলে। সে তাঁর মুখের দিকে তাকালো: তা ব্যঞ্জনাহীন। কথাবার্তা ওখানেই শেষ হ'লো; কিন্তু একটা রুদ্ধ সংঘাতের ভাব লেগে রইলো অশান্তর মনে।

দু'দিন পর রবিবার; সকালবেলা রাণী এলো। অশান্তর তখনো ঘুম ভাঙেনি। আধো-ঘুমের মধ্যে তার কানে এলো রাণীর কণ্ঠস্বর। প্রথমে শুধু স্বর; তারপর তন্দ্রার ঘোর কেটে গিয়ে কথাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে আসতে লাগলো। তার ঘুম ভেঙে গেলো, তবু খানিকক্ষণ সে বিছানা

থেকে উঠলো না ; উঠলেই রাণীর সঙ্গে দেখা হবে, এ-চিন্তাকে যেন সে ঠিক সহ্য করতে পারছিলো না। সেই সন্ধ্যার পর আজ যেন আবার নতুন ক'রে রাণীর সম্মুখীন হ'তে হবে। একটা সঙ্কট। যেন আজ সকালে সে এক নতুন জীবনে জেগে উঠলো ; সেখানে সম্ভাবনার অনির্দ্দেশ্য অসীমতা ; সে এখনো জানে না, কী ক'রে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে হবে।

সে এর আগে কখনো একে জানেনি, এই দ্বৈতবোধ, আর-একজনের সঙ্গে সংমিশ্রণের, আর-একজনের কাছে সমর্পণের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত জীবন সে নিজের মধ্যে কাটিয়েছে ; এখন, আশঙ্কার আর আনন্দের এক নতুন জগত তার কাছে উন্মুক্ত হ'লো। তাকে টানছে এক গোপন, নিহিত শক্তি, যার কাছে সে অসহায়, যেন একেবার তার মাংসের নগ্নতা তার কাছে উদ্ঘাটিত হ'য়ে পড়েছে। নিজের মধ্যে সে এক চঞ্চল ক্ষুব্ধতার আলোড়ন অনুভব করলো : একরকম ভয়, আর সেই ভয় থেকে উৎসারিত প্রতিশোধ-চেষ্টা। রাণী তাকে চায় ; তার নির্জ্জনতাকে চায়। সে দাবি করে তার সম্পূর্ণতাকে ; সে তাকে বাধ্য করছে দিতে, দিয়ে দিতে। আর তার বিরুদ্ধে, নিজের শক্তি-হীনতার বিরুদ্ধে তার চাপা ক্ষুব্ধতা।

কয়েকদিন পর তারা আবার হোয়াটেওয়ের মোড়ে সম্মিলিত হ'লো। খেয়ালমত ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে তারা এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো, যেখানে মাঠের সবুজ প্রসারের পিছনে শুধু পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ, আর তারই এক কোণে পুরোনো ছবির মত ফোর্টের গাঢ়-লাল মূর্ত্তি। সূর্য্যাস্তের মুখোমুখি তারা দাঁড়ালো—আকাশের গায়ে দুই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকৃতি, সূর্য্যের কাছে প্রার্থনারত, সমস্ত প্রাণের যে চিরন্তন উৎস। আর হঠাৎ, সূর্য্য থেকে মুক্ত এক বিশাল আলোক-তরঙ্গ যেন

তাদের উপর দিয়ে বয়ে' গেলো, আলোর অজস্রতায় তারা গেলো অন্ধ হ'য়ে। সেই ঢেউ কোথায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—কোন্ ভয়াবহ অপরিজ্ঞাততায়? কোন্ স্তব্ধতায়? মৃত্যু-মর্ম্মরিত কোন রাত্রির অরণ্যে? সে যা-ই হোক্, এতদিন তারা যা-কিছু জেনেছে, তার মত তা হবে না। যেন এইমাত্র তারা পুরোনো জীবনের আচ্ছাদন থেকে উত্থিত হ'লো: নতুন, পরিচ্ছন্ন, সদ্যোজাত। ঘাসের উপর পাশাপাশি তারা চুপ করে' বসে' রইলো—টের পেলো না যে চুপ করে' আছে। ছায়ায় পৃথিবী ভরে' গেলো; কেউ কোনো কথা বললে না। রাত বাড়লো; ময়দানটা একটা কালো অন্ধকারের পুঞ্জ হ'য়ে উঠলো, জেগে উঠলো অসংখ্য আলো-কণা, নানাদিকগামী ট্র্যামগুলো এক-একটা সবুজ আলোর রেখা। তবু কেউ কোনো কথা বললে না। সময় অলক্ষিতে বয়ে' চললো।

তারপর অন্ধকারে রাণীর একখানা হাত অশান্তর হাতকে খুঁজলো, তার উপর এসে পড়লো, তাকে চেপে ধরলো। কোটি-কোটি বছর এসে প্রবাহিত হ'লো সেই স্পর্শের মধ্যে, সমস্ত সময়, সময়ের সব অসীমতা। সেই স্পর্শের ভিতর দিয়ে রাণীর আত্ম-নিহিত, এতদিন ধরে' অবরুদ্ধ প্রাণ সঞ্চারিত হ'লো অশান্তর মধ্যে, রাণীর উষ্ণ প্রাণের অন্ধকারে ঐশ্বর্য্য। রাণী, তুমি অন্ধকার, প্রাণের শক্তিতে তুমি অন্ধকার। তার সেই শক্তি অগ্নিশিখার মত অশান্তকে লেহন করলে। সে তাতে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেলো, মগ্ন হ'য়ে গেলো তার মধ্যে, যেন তার শরীরের বস্তু সেই শক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো। আর, তারপর, দীর্ঘ স্তব্ধতা ভেঙে রাণী বললে, 'অনেকদিন পর, যখন তুমি আর আমাকে ভালোবাসবে না,' অশান্ত, আজকের এই সন্ধ্যার কথা তুমি মনে কোরো, যখন লাল সূর্য্যাস্তের নিচে, আলোর স্তব্ধতার মধ্যে আমরা বেঁচেছিলাম।'

ফেরবার পথে তারা একটা ফরাসি রেস্তোরাঁয় গেলো একটু কফি খেতে; অশান্তর, তাই, বাড়ি ফিরতে দশটা বেজে গেলো। বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরি হ'লো যে?'

এ-ধরণের প্রশ্ন বাসন্তী কখনো করেন না; অকৃত্রিম বিস্ময়ে অশান্ত তাঁর মুখে তাকালো। তাঁর মুখে সেই ব্যঞ্জনাহীন ভাব—সেদিন সে যা লক্ষ্য করেছিলো। তার মনের মধ্যে একটা ভোঁতা গোছের রাগ গড়ে' উঠতে লাগলো—কেন মা এ-সব নিষ্প্রয়োজন, নিতান্ত গায়ে-পড়া প্রশ্ন করতে যাবেন, কেন মা খামকা তাকে ঘাঁটাতে যাবেন? 'দেরি? না, দেরি কোথায়?' এ-ই শুধু সে বললে। আর সত্যিও, গ্রীষ্মকালে দশটা তো সন্ধ্যা।

'আর-একটু আগে ফিরতে পারিস্‌নে?'

'আমার যখন ইচ্ছে, আমি ফিরবো।'

বাসন্তী একটু চুপ করে' রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'রাণীর সঙ্গে ময়দানে বেড়ালাম।'

'তোমার কাছে চিঠি লিখছি, রাণী', সেই রাত্রে অশান্ত লিখলে, 'কারণ, না-লিখে পারছি না। দূরে থেকেও তোমার সঙ্গে কোনোরকম একটা সংস্পর্শ এখন আমার দরকার। তোমার কাছ থেকে দূরে চলে' এসেছি, ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি যেখানে থাকবে, আমি থাকবো না, তা যেন অসম্ভব। কিন্তু তুমি যে এখানেই আছো, এখানে, আমার সঙ্গে, আমার মধ্যে। আমি তোমাকে অনুভব করছি। তুমি এখানেই আছো; তুমি আমাকে ঘিরে আছো, ছড়িয়ে আছো আমার মধ্যে, ব্যাপ্ত করে' রেখেছো আমার চৈতন্যকে। তোমারই মধ্যে আমি বেঁচে আছি।'

পরস্পর

রাণীর ইস্কুল প্রায় খুলে এসেছে, এমন সময় কলকাতায় এসে লাগলো মৈশুমের প্রথম ঝাপটা। প্রখর সূর্য্য বঙ্গোপসাগর থেকে দিনের পর দিন শোষণ করেছে যে-সব বাষ্পকণা, তা সঞ্চিত হ'তে-হ'তে পরিণত হ'লো মেঘের আকৃতিতে; সেই মেঘকে তাড়না করলে দক্ষিণের হাওয়া, সুন্দরবন থেকে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেলো মেঘ; নিজের ভার আর বহন করতে না-পেরে তা ভেঙে পড়লো বৃষ্টিতে, বাঙলাদেশকে দিলে ভাসিয়ে। আর তাদেরকে তা আচমকা একদিন ধরে' ফেললো, রাণীকে আর অশান্তকে, ভেঙে পড়লো অজস্রতায় তাদের মাথার উপর, এক সন্ধ্যায় তারা যখন বেড়াচ্ছে ইডেন গার্ডেন থেকে গঙ্গার ধার দিয়ে বরাবর দক্ষিণে চলে'-যাওয়া রাস্তায়। বিকেলটা ছিলো সোনালি, গঙ্গার ঘোলা জলে সোনার ঝিকিমিকি-খেলা; তীর ঘেঁসে সমুদ্রযাত্রী জাহাজ-গুলো দাঁড়িয়ে, অপরিচিত দ্বীপের সৌরভ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন। নিশ্চিন্ত, তারা চলে' গিয়েছিলো অনেক দূরে; আলাপে মগ্ন, বুঝতে পারেনি, কতদূর এসেছে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'লো, আকাশ মেঘে-মেঘে ধোঁয়াটে হ'য়ে গেছে, বাতাস অস্বাভাবিকরকম গরম। চারদিকে তারা তাকিয়ে দেখলো: একদিকে গঙ্গার ঘোলা জলের চঞ্চলতা, অন্যদিকে প্রতীক্ষমান প্রান্তর যেন প্রতিটি ঘাসের ডগা দিয়ে এখনো অনাগত বৃষ্টির পদধ্বনি শুনছে।

অশান্ত বললে, 'চলো ফিরি।'

কিন্তু তাদের দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো; বৃষ্টি তাদেরকে ধরে' ফেললো। বাতাস মরে' গেলো, কয়েক মুহূর্ত্ত, বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতার মৃত্যু: তারপর সেই নিঃস্পন্দ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে' কয়েক ফোঁটা গরম বৃষ্টি পড়লো তাদের গালে। তারা তাড়াতাড়ি পা চালালে, কিন্তু পথ দীর্ঘ ও নির্জ্জন; বৃষ্টি দ্রুতগতি; এবং সহরের প্রধান যাতায়াতের বহির্ভূত এই রাস্তায়

একটা যাত্রীসন্ধানী ট্যাক্সি পেয়ে যাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির জোর বাড়লো; আবার জেগে উঠলো হাওয়া—এবার তীব্ররকম ঠাণ্ডা।

রাণী বললে, 'নাঃ, আর পালানো গেলো না। ভিজে গেলাম যে।'

'চলো ঐ গাছটার নিচে গিয়ে একটু দাঁড়াই।' এ ছাড়া অশান্ত আর কোনো উপায় ভাবতে পারলে না।

গাছটা বেশ বড় রকম; প্রথমটায় তাদের মনে হ'লো, যা হোক্ একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে। কিন্তু একটু পরেই পাতার ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পিছনে সরতে-সরতে তারা একেবারে গাছের গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়ালো; কিন্তু পাতার অশ্রান্ত মর্ম্মর যেন একটা ঝরণার গান, যে-ঝরণার নিচে তারা দাঁড়িয়েছে। হাওয়া কোন্‌দিকের বোঝবার উপায় নেই; যেন একসঙ্গে সবদিক থেকে ঝাপটা এসে লাগছে তাদের গায়ে।

আর সমস্তটা বৃষ্টির মধ্যে তারা দু'জন সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলো। তীব্র, হিংস্র বৃষ্টি; চামড়ার উপর তার স্পর্শ চাবুকের মত ধারালো। উদ্দাম, অজস্র বৃষ্টি: কখনো যেন তার শেষ হবে না। পৃথিবী মুছে গেছে: সমস্ত সৃষ্টির উপর একটা সাদা-ধূসর পরদা। সেই পরদার নিচে আর-কিছু নেই; সীমাহীন, সময়হীন শূন্যতা। শুধু মাঝে-মাঝে, আকাশকে টুকরো-টুকরো করে' দিয়ে এক অতি-সংক্ষিপ্ত, চোখ-ধাঁধানো মুহূর্ত্তে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎ-বিদার এক অপরিচিত প্রেত-প্রান্তর তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে' দিচ্ছিলো। আর আকাশ থেকে আকাশে বজ্রের স্বর গড়িয়ে চলেছে।

হঠাৎ এক সময় মেঘে মেঘে লাগলো এক ভীষণ সংঘর্ষ: বিদ্যুতের ঝলসানিকে ভালো করে' নিবতে না-দিয়েই প্রচণ্ড শব্দে, যেন ঠিক তাদের মাথার উপর, ভেঙে পড়লো বাজ: ধ্বনির পর ধ্বনি, আকাশ

যেন কুচি-কুচি হ'য়ে ফেটে যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে রাণী তার হাতের মুঠির মধ্যে অশান্তর কাঁধ শক্ত করে' আঁকড়ে ধরে' কম্পিত, অস্বাভাবিক স্বরে বললে, 'আমার কেমন ভয় করছে।' বলে' সে কাঁপতে আরম্ভ করলো, যেন কাঁপতে-কাঁপতে সে মরে' যাবে; অশান্ত শুনতে পেলো তার দাঁতের শব্দ। বৃষ্টির জল তাদের চামড়া ভেদ করে' যেন মাংসের ভিতরে প্রবিষ্ট হ'লো। শীতটা আর বাইরের কোনো কারণে নয়; তাদের পেটের ভিতর থেকেই এই ঠাণ্ডা উত্থিত হচ্ছে, তাকে আটকাতে গেলে আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে। তাদের আঙুলের ডগাগুলো শিটিয়ে সাদা হ'য়ে গেলো; থেকে-থেকে একটা অদম্য ঠেলা পেট থেকে গলা পর্য্যন্ত উঠতে লাগলো, যেন তাদের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি এক্ষুনি বমি হ'য়ে বেরিয়ে যাবে। আর, যেন রাণীর শরীর থেকে সেই কাঁপুনি সঞ্চারিত হ'লো অশান্তর মধ্যে; তার মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেলো, মাঝে-মাঝে তার দুই হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হ'তে লাগলো। যেন অনেক চেষ্টার পর, অনেক কষ্টে রাণী ভাঙা-ভাঙাভাবে, অন্য-কারো স্বরে উচ্চারণ করলে, 'শীতে যে মরে' গেলাম।' দু'বাহু দিয়ে অশান্তকে জড়িয়ে ধরে' সে নিজেকে চেপে ধরলো তার শরীরের উপর, পিষে ফেললো। 'আমাকে জড়িয়ে ধরো', অশান্তর কাঁধের উপর চূর্ণ তার মুখ, বিকৃত চাপা গলায় সে বলে' উঠলো, 'জড়িয়ে ধরো'। অশান্ত অনুভব করলো, তার জামা ভেদ করে' রাণীর দাঁত তার কাঁধের মাংসে বসে' যাচ্ছে। সে তার সমস্ত শরীর দিয়ে আচ্ছন্ন করলে রাণীকে; তবু যেন সান্নিধ্য যথেষ্ট নিকট হচ্ছে না, তবু রাণী বলছে, 'আরো, আরো।' আর, এমনি তারা রইলো, বৃষ্টি, যখন অজস্র ঝরে' যাচ্ছে, সেই বর্ণ-হীন শূন্যতার ভিতর দিয়ে, এমনি তারা রইলো, শরীরের সঙ্গে শরীর জাপ্‌টানো, একটু উত্তাপের জন্য, আরো, আরো কাছে, পরস্পরের শরীর থেকে একটু, একটু উত্তাপ যদি

ছেঁকে আনতে পারে। কিন্তু সে-উত্তাপ তারা পেলো না; একজন থেকে আর-একজনে শীতের স্রোত বয়ে' চললো। অসাড়, অবশ, তাদের মনে হ'লো, এক্ষুনি তারা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে।

বৃষ্টি যখন থামলো, তারা আধ-মরা হবার কাছাকাছি এসেছে। তারা জানে না, কী করে' নিজেদেরকে তারা টেনে নিয়ে এসেছিলো সেই গাছতলা থেকে, কোথায় একটা ট্যাক্সি পেয়েছিলো এবং কী করে' তাতে উঠেছিলো। বাড়ি পৌঁছনো পর্য্যন্ত একটি কথা তারা বললে না। এবং বাড়ি ফিরেও যে খুব বেশি কথা বলতে পারলো, তা নয়।

সে-রাত্রে রাণীর বোর্ডিঙে ফেরবার কথা উঠতেই পারে না। তার বমি-বমি ভাব তখনো যায়নি; খেতে বসে' সে কিছুই খেতে পারলে না। তার মাথা যেন ফেটে পড়ছিলো; তাড়াতাড়ি সে শুতে গেলো।

আর অশান্তর শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম এলো না; এক অস্ফুট প্রত্যাশা তাকে জাগিয়ে রাখলে। কিসের প্রত্যাশা সে জানে না; বরং, জানতে সাহস করে না। এত বৃষ্টির পরেও আবার গরম; কিন্তু তার যেন এখনো শীত করছে, নিজেকে সে যেন উষ্ণ করতে পারছে না। অন্ধকারে সে অপেক্ষা করলো। কিন্তু মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে রাত্রি ক্ষয় হ'য়ে যেতে লাগলো; অপেক্ষা দীর্ঘতরো অপেক্ষায় নিজেকে প্রসারিত করে' গেলো। শেষটায়, প্রায় ভোরের দিকে অশান্ত ঘুমিয়ে পড়লো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক সন্ধেবেলা মালতীকে রাত্তিরের রান্নাটা নামিয়ে রাখতে হচ্ছিলো। কড়াইয়ের উপর ফুটন্ত তেল সবেমাত্র ছ্যাঁকছ্যাঁক করে' উঠেছে, এমন সময় সেখানে আবির্ভূত হ'লো বিমল। মালতী মুখ ফিরিয়ে তার দিকে শুধু একবার তাকালো, তারপর রান্নায় মন দিলে। কোনো কথা বললে না।

রান্নাঘরের এক পাশে একটা ব্যবহার-অনুপযোগী তক্তপোষ ফেলে' রাখা হয়েছিলো; একটু দাঁড়িয়ে থেকে, যেন কোনো-কিছুর আশায় একটু অপেক্ষা করে', বিমল বসলো সেখানে।

'এখানে কেন বসলে?' বিমলের দিকে মুখ না-ফিরিয়েই মালতী বললে।

'বসি না।'

'এখানে বড় গরম।'

'একটু গরমই তো।'

'দাদা বাড়ি নেই?' একটু পরে, মুহূর্ত্তের দৃষ্টির ঝলক বিমলের মুখের উপর ফেলে' মালতী জিজ্ঞেস করলে।

'দেখলুম না তো।'

এর পরে খানিকক্ষণ দু'জনেই নীরব রইলো। এই অতি সংক্ষিপ্ত আলাপের মধ্যে যা-কিছু বলা হয়নি; প্রকারান্তরে, নিহিতভাবে যা-কিছু বলা হ'লো, দু'জনের মধ্যে তা একটা অস্বস্তি, দু'জনের মধ্যে তা

একটা ব্যবধান। মালতী কোটা তরকারিগুলো ঢেলে দিলে কড়াইতে ; ছ্যাঁকছ্যাঁকানি প্রায় গর্জ্জনে পরিণত হ'লো। বাঁ হাতে একবার কপাল থেকে চুল সরিয়ে সে আপাতত নিবিষ্টচিত্তে খুন্তি দিয়ে তরকারিগুলোকে খোঁচাতে লাগলো, ঘরে অন্য-কেউ আছে, তার ধরণ থেকে এমন প্রকাশ পেলো না।

বিমল, ততক্ষণ, তক্তপোষের উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে' স্থির দৃষ্টিতে মালতীকে লক্ষ্য করছিলো। কয়লার উনুনের আগুন, ইলেকট্রিক আলো সত্ত্বেও, তার মুখে ফেলছিলো গোলাপি আভা, তার মুখ—ঘামে একেবারে তেলতেলে হ'য়ে উঠেছে। কপালের উপর স্খলনোন্মুখ ছোট-ছোট চুলগুলোকে সে সামলাতে পারছে না ; তার হাতের নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যে ছোট-ছোট আলোর তীর ছুঁড়ে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে চুড়ি। তার মুখের ভাব একাগ্র, একটু শক্ত যেন, যেন তার মনের মধ্যে চলেছে এক অনির্দ্দিষ্ট উন্মীলন, যাকে সে চাইছে অস্বীকার করতে। তার হাত কাজ করে' গেলো খুন্তি নিয়ে, বিমল তাকিয়ে রইলো। ছ্যাঁকছ্যাঁকানি নিবৃত্ত হ'লো ; খানিক পরে কড়াই নামিয়ে রাখা ছাড়া আর-কিছু করবার রইলো না। আঁচলের দু'দিক দু'হাতের মুঠির মধ্যে ধরে' মালতী গরম কড়াই নামালে। তারপর হাত ধুয়ে সেই আঁচলেই হাত ও পরে মুখ মুছলো। অপরিচ্ছন্নতার প্রতিষেধক হিসেবে সাড়িটা রঙিন ; তার হাতের আঙুলের ডগায় ম্লান হ'য়েও ঠিক মুছে যায়নি মশলার হলুদ রঙ। হাতের কাজ সেরে, যেন অনজ্ঞাত কোনো-কিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে' নিয়ে মালতী সোজা তাকালো বিমলের চোখের দিকে।

তখন বিমল বললে, 'তোমাকে আমার একটা কথা বলবার ছিলো।'

'বলো, কী ?'

'বুঝতে পারো না, কী ?'

এক অদ্ভুত তীব্রতা হঠাৎ বিদ্যুতের মত মালতীর চোখে ঝলসে গেলো। পরমুহূর্তেই তা মিলিয়ে গিয়ে তার দৃষ্টি কঠিন, প্রায় ব্যঞ্জনাহীন হ'য়ে উঠলো ; এক শুষ্ক ভঙ্গিতে তার ঠোঁটের কোণ গেলো একটু বেঁকে। 'তবু, বলো না, তোমার যা বলবার। শুনতে তো ভালো লাগবে।'

'এ-ছাড়া আর-কিছু কি তোমার বলবার নেই ?'

'তুমি যাও না', মালতীর দৃষ্টি মশলা-মাখা মাছের থালার উপর পড়লো, 'দাদার ঘরে গিয়ে বসো। রান্নাঘরে এসে বসে'-থাকা— দেখতেও তো সেটা খারাপ দেখায়।'

বিমল মন্থরভাবে উঠে দাঁড়ালো। 'আমি আজই উত্তর চাইনে', মৃদুস্বরে সে বললে, 'তুমি ভেবে গ্যাখো, মন ঠিক করতে পারলে আমাকে বোলো। যেদিন হয়।' বলে' সে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

যে-মুহূর্তে বিমল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, মালতী এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। যেন দিগন্তে দেখা দিয়েছিলো এক বিশাল, ভয়াবহ মেঘ— তাকে আচ্ছন্ন করতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত—তাকে সে ব্যর্থ করছে বাহুর ভঙ্গিতে, গোপন কোনো মন্ত্র-উচ্চারণে—তাকে সে ছিন্ন করছে দৃষ্টির জ্বলন্ত খড়্গে। খড়্গ ঝলসে উঠছে দিগন্তের মুখের উপর, আকাশ এখন শূন্য। মালতী চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, মালতী নিঃশ্বাস ছাড়লো।

ঝকঝকে কাঁসার থালায় মশলা-মাখা মাছ। সাদা, তিন-কোণা করে' কাটা ইলিশ। দাদা ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসে। ইলিশের মত মাছ হয় না, মা বলেন। দেখতে ভালো, রাঁধতে ভালো, খেতে ভালো। মালতী ধবধবে মাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো—নরম, মসৃণ মাংস— তেলে আর গন্ধে ভরা। সত্যি, দেখতে ভালো। আর, এমন করে' রাঁধতে হয় যাতে এই নরম, ধবধবে চেহারা অক্ষুণ্ণ থাকে, অবিনষ্ট থাকে

তার মজ্জগত সৌরভ। একটু কাঁচা রাখতে হয়, নয় তো ইলিশ না-খেয়ে বোয়াল খেলেও কোনো ক্ষতি নেই। বেশি মশলা দিলে ইলিশকে নিছক হত্যা করা হয়। ইলিশ রান্নার এ-ই হচ্ছে কৌশল। রাঁধতে অত কম সময় লাগে সেইজন্যেই তো।

না, ইলিশ রাঁধতে মোটেও সময় লাগে না। কিন্তু মেঘ যে দূর হয়েছে, সেটা একটা মোহ মাত্র। তার বাহুর ভঙ্গি, তার চোখের দৃষ্টি—একটা ভেল্কিবাজি। জাদুকরের মত সে বাহুর এক ভঙ্গি করেছে, ঝলসে উঠেছে এক আপাতখড়্গ—আর, কোথায় মেঘ! কোথায়! দিগন্ত পার হ'য়ে কোনোখানে, ইন্দ্রিয় পার হ'য়ে কোনোখানে—কোনো অদৃশ্যে, কোনো অন্ধকারে, কোনো সঙ্গোপন সূর্য্যের হৃদয়ে—নিশ্চিন্ত, চিরন্তন, সেই বিশাল, অন্ধ মেঘ—এখন বিক্ষিপ্ত, পরাজিত, শূন্যীকৃত—কিন্তু যে-কোনো মুহূর্ত্তে জমে' উঠতে প্রস্তুত, ভয়াবহ আকৃতি নিতে; তাকে আক্রমণ করতে, আচ্ছন্ন করতে, তাকে লুপ্ত করে' দিতে প্রস্তুত। কী করে' তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কী করে' তাকে মিলিয়ে দেয়া যায়। আকাশ যে শূন্য এটা মোহ, তার ভেল্কির একটা খেলা: আকাশ শূন্য নয়, এ-শূন্যতা সেই মেঘের অনুপস্থিতি মাত্র। যা পরাক্রান্ত, যা ভীষণ—তার নেতৃত্ব মাত্র, নিজেরই মধ্যে পরাক্রান্ত ও সর্ব্বব্যাপী। সূক্ষ্মতম মাত্রায় তা ঝুলে রয়েছে: যে-কোনো মুহূর্ত্তে তা উল্টিয়ে যেতে পারে; ভয়, কোনো মুহূর্ত্তে এই 'নেই' 'আছে' হ'য়ে উঠতে পারে, আর তখন—

দাদা ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসে, মালতী ভাবলে। কড়াইতে সে ঢাললে একটু সর্ষের তেল (খুব বেশি নয়—তাতে ইলিশের ইলিশত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়), তারপর মাছগুলো একখানা-একখানা করে' ছেড়ে দিতে লাগলো। সযত্নে, সন্তর্পণে। তাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বেশি ভাজা না-হ'য়ে যায়। চিরকাল মা-র হাতের রান্না খেয়ে অভ্যস্ত

দাদার জিহ্বার সচেতনতা বলতে গেলে অমানুষিক। তাকে সাবধান থাকতে হবে, খুব সাবধান। একটু কাঁচা থাকতেই নামাতে হবে, আগুন এর কোমল শুভ্রতা ঝলসে দিতে পারার আগেই। আর এত কম সময় নেয়—ইলিশ রাঁধতে।

তাকে সে যেন অনুভব করছে তার পিছনে, সেই অনুপস্থিতিকে। তা তাকে ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে। এই অভাবকে সে ভুলে' থাকতে পারছে না। তার মানেই, তা এখনো রয়ে' গেছে, যেটা মূল, যেটা ভয়াবহ, যেটা চিরন্তন। অদৃশ্য বিদ্যুতের মত তা ঘরের হাওয়ায়। তক্তপোষের উপর বিমল যেখানটায় বসে' ছিলো, মালতী একবার সেদিকে তাকালো। এ কী নিদারুণ, সঙ্গোপন শক্তি—যা তার আর আমার ভিতরে অলক্ষ্যে পথ করে' যাচ্ছে, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত! ওঃ, এই আত্মস্থ, আত্ম-কেন্দ্রীভূত, আত্ম-বিলাসী পুরুষ! এই অন্ধ, উত্তপ্ত, অনস্বীকার্য্য পুরুষত্ব! সে জানে—একে সে জানে। আর সে একে ঘৃণা করে—এর শান্ত নিশ্চিন্ততা, এর অসহনীয়, অপরিমিত, বিরতিহীন চাপ। বিশাল, অন্ধ, মূঢ় একটা মেঘ, স্ফীত হ'য়ে উঠছে, নিচু হ'য়ে পড়ছে—তাকে ধরতে, তাকে আচ্ছন্ন করতে, নিশ্চিহ্ন করে' দিতে। অন্ধ, নির্ব্বোধ পুরুষ-সত্তা। শ্রান্তিহীন, তৃপ্তিহীন। অলক্ষ্য সঞ্চারে তার ভিতর দিয়ে তা ক্ষয়ে' যাচ্ছে—অন্ধকার, গোপন সুড়ঙ্গ। কিন্তু সে তাকে চায় না। সে তাকে ঘৃণা করে। আর ভয় করে—হ্যাঁ, মনে-মনে, মগ্নচৈতন্যে, নিজে না-জেনে, জেনেও স্বীকার না-করে', সে একে ভয় করে। কেমন করে' সে একে রোধ করবে—এই সূক্ষ্ম, ক্ষয়কারী সঞ্চারকে? কেমন করে', কেমন করে'? ইলিশ মাছের সৌরভ মালতীর নাকে এলো। আঃ, সত্যি ভালো। দেখতে ভালো, রাঁধতে ভালো, খেতে ভালো। রাঁধতে, বিশেষ করে'। যে-কোনো কাজ করা ভালো

—যতক্ষণ তা নিজেকে আবদ্ধ করে' রাখে নিজের মধ্যে। সে-ই তো আশ্রয়ের দুর্গ, জীবনের দুরন্ত জলরাশির মধ্যে সে-ই তো শান্তির দ্বীপ। যে-কোনো কাজ ভালো : কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, আফ্রিকার অরণ্য উদ্‌ঘাটন করা; ইলিশ মাছ রান্না করাও ভালো। পৃথিবীতে ইলিশ মাছের অস্তিত্বের জন্য মালতী অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলে। খুন্তি দিয়ে সে মাছগুলোকে ওল্টাতে লাগলো—অত্যন্ত সযত্নে, প্রায় সস্নেহে। প্রায় হ'য়ে এলো। এত কম সময় লাগে!

কেননা, ভেবে দেখতে গেলে, সময়েরই ব্যাপার, তা ছাড়া কিছু নয়। যদি শুধু যথেষ্ট সময়ে ধরে' থাকা যায়, ফাঁকি দেয়া যায়, যদি শুধু বিশেষ ও অদ্ভুত একটি মুহূর্ত্তের প্রভাব শেষ হ'য়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ব্যবধান সৃষ্টি করা যায়—তাহ'লেই তা পঙ্গু হবে, দিগন্তের এই স্ফীত-হ'য়ে-ওঠা মেঘ, তাহ'লেই খণ্ডিত হবে কঠিন, নিশ্চেতন এই পুরুষ-সত্তা। কেবল সময় নিয়েই কথা। কেননা মুহূর্ত্তগুলো বিরল; তা সব সময় আসে না, আর যদি না আসে, জোর করে' তা সৃষ্টি করা যায় না। এমন মুহূর্ত্ত আসে যা আগুনের স্তম্ভের মত, তা যেন সব গ্রাস করতে উদ্যত, দাউ-দাউ করে' যা জ্বলে' ওঠে চারদিক দিয়ে ভীষণ উৎসাহে। কিন্তু চেয়ে ছাখো—আর চুপ করে' থাকো, একটু সহ্য করো—আর হঠাৎ তা ভেঙে পড়েছে, সেই আগুনের স্তম্ভ, তা নিবে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। মুহূর্ত্ত মরে' যায়—ভয় যায় কেটে। হ্যাঁ, সময় নিয়েই তো কথা। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তের নিষ্ফলতায়, সমস্ত পুরুষ-শক্তি নিঃশেষিত হ'তে পারে—ভেঙে যেতে পারে তার অসহিষ্ণুতা কানে-কানে-টানা ধনুকের মত। এমনি একটা জয় এখনই হয়-তো তার হচ্ছে, মনে-মনে মালতী বললে। কড়াই থেকে উঠছে যে-ধোঁয়া, তার ভিতর দিয়ে বিমলকে সে দেখতে পেলে, অশান্তর ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে', হাতে

কোনো বই। কী শান্তভাবে সে বসে' আছে, যেন সমস্ত পৃথিবীতে কিছু সে চায় না, যেন নিজের মধ্যে সে নিজে সম্পূর্ণ। আর তার চোখ সত্যি-সত্যি বইয়ের লাইনগুলো পার হ'য়ে যাচ্ছে: এমন ভাণ তার করতেই হবে যে সে পড়ছে, নয় তো নিজের কাছে তার মান থাকে না।

আর একটু পরেই মাছের কড়াই নামাবার সময় হবে। তারপর?...কিন্তু মুহূর্ত্ত তো নিবে গেছে, ভেঙে পড়েছে। বিমল এখন অক্ষম। তার সমস্ত অন্ধ পুরুষ-শক্তি এমন শূন্যীভূত। মুহূর্ত্ত কেটে গেছে। বিমলের কথা ভাবতে তার একটু ভালো লাগলো—ইজি-চেয়ারে বই হাতে করে' বসে'। একটু পরে সে যাবে, সোজা তাকাবে তার দিকে, বসবে কাছাকাছি চেয়ারে, আলাপ করবে মিশরের ইতিহাস নিয়ে। মিশরের ইতিহাস! কথাটা ভেবে মালতীর এত ভালো লাগলো যে সে হেসে উঠলো, প্রায় শব্দ করে'।

ইলিশ মাছ, মিশরের ইতিহাস। কিছু-একটা হ'তেই হবে। সে-পৃথিবীতে বিমল, যে-পৃথিবীতে পুরুষের অগ্নিময় মুহূর্ত্ত, সেখানে তার একা প্রবেশ করবার উপায় নেই। সে যা, তা হবার উপায় নেই। সব সময় তাকে হ'তে হবে অন্য-কিছু, নিতে হবে কোনো আশ্রয়, কোনো আচ্ছাদন। কিছু-একটা আঁকড়ে ধরবার, ধরে' রাখবার জন্য। কিন্তু কেন, কেন? আর হঠাৎ, একটা আগুনের জিহ্বা যেন তার বুকের ভিতরটাকে লেহন করে' দিয়ে গেলো, সে আরক্ত হ'য়ে উঠলো গলা থেকে কপাল পর্য্যন্ত। একটা লজ্জা, অবমাননা, ব্যর্থতার চেতনায় তার দৃষ্টি যেন অন্ধ হ'য়ে গেলো। এমনি খেলা করে', তাহ'লে, তাকে বেড়াতে হবে; লুকিয়ে, এড়িয়ে? সে—কামনীয়? আর সমস্ত জিনিসটার এটা তো একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ—তার এই পালিয়ে বেড়ানো। সে কামনীয়, সে ঈপ্সিত—এ-ই তো তার সম্বন্ধে শেষ ও সমস্ত সত্য।

সে ঠোঁট চেপে ধরলো দাঁত দিয়ে। কামনীয়—ঐ একটি কথার নিষ্পেষণে সে যেন চূর্ণ হ'য়ে গেলো। সে আর-কিছু নয়, আর-কিছু নয়। একা, তার নিজের মধ্যে, সে কিছু নয়। সে তখনই সত্য, যখন আর-একজনের বাসনায় সে গৃহীত, প্রতিফলিত। সেই ভয়ঙ্কর অন্ধ শক্তি তাকে চায়, চায়, চায়! তাকে তার প্রয়োজন! প্রয়োজন—কী নিষ্ঠুর, কী সর্ব্বধ্বংসী এই কথা, প্র য়ো জ ন! তোমাকে আমার চাই, তোমাকে না-হ'লে আমার চলবে না। আ—সে জানে, জানে, ও-সমস্ত কথা অনেক আগেই সে জেনে রেখেছে। কিন্তু কেন চলবে না? কেন এই নির্ব্বোধ জবরদস্তি? একজন কেন প্রয়োজন হবে আর-একজনের জীবনে? কিন্তু বিশাল, ভয়াল সেই মেঘ—সে কিছু বোঝে না, সে শুধু কাছে আসে, নিচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে, শুধু চাপা দেয়—পুরুষের আত্ম-অন্ধ ইচ্ছার সেই অপরিমিত, অসহনীয় চাপ। সে মালতী, সে কেন একা থাকতে পারে না? সে কেন হ'য়ে উঠতে পারে না, যেমন সে চায়, তার নিজের ছন্দে। কেন অনিবার্য্যরূপে, আর-একজন আসবে দাঁটাতে?- সে চায়, সে চাওয়ার উপলক্ষ্য হ'তে পারে না। কী চায় সে?

মালতীর চিন্তার স্রোত বরাবর এখানে এসে থেমে গেছে। পাহাড়ি পথ বেয়ে-বেয়ে উপরে উঠে হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড এক গহ্বর, শূন্যতার মুখব্যাদন। এত কষ্ট করে' না-এলেও হ'তো। ব্যর্থ হ'লো এই তীব্র, সঙ্কটময় যাত্রা। আর এই নিষ্ফলতার চেতনা তার মনের মধ্যে একটা অন্ধকারের ফাটল, যা দিয়ে, সাবধানী না হ'লে, সচেতনভাবে সচেষ্ট না হ'লে, তার সমস্ত প্রাণশক্তি চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে আসতে পারতো। সে গর্ব্বিত, কিন্তু সেই গর্ব্বের কোনো বহির্গত সমর্থন নেই। সে সবল, কিন্তু তার শক্তির নির্দ্দিষ্ট কোনো স্রোত নেই। কী চায় সে?

সে জানে না, সে তা' খুঁজে পায়নি। তবু চিরকাল সে প্রত্যাখ্যান করেছে, যা-কিছু হাতের কাছে এসেছে। সে অস্বীকার করেছে গণ-উত্তেজনার অংশীভূত হ'তে। যে-বিচিত্র ও অনেক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে লোকে ভালোবাসা বলে, জীবনে যেটা মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায়, কৈশোর থেকেই তার এমন স্পষ্ট রূপ তার মনে যে সত্যি-সত্যি সে কখনো প্রেমে পড়বে বলে' মন ঠিক করে' উঠতে পারেনি। যেন সমস্তই তার ঘটেছে, পরোক্ষভাবে, প্রক্সির সাহায্যে—সে রোজালিণ্ড্ হয়েছিলো, সে-ই তো ভেসে গিয়েছিলো নদীর জলে, গান করতে-করতে;

I loved Ophelia: forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum—

এ-কথা তো তারই জন্যে। আর এমনি, সে পার হ'য়ে এসেছিলো কৈশোর, প্রেমে না-পড়ে', পরোক্ষভাবে প্রেমের রোমাঞ্চ অনুভব করে'। কিশোর বয়েসে প্রেমে পড়া মানুষের মনের গভীর প্রয়োজন—তাকে শক্তি দেয় পরবর্ত্তী গভীরতরো প্রেমের জন্য। কিশোর প্রেমে প্রস্তাবনা হ'য়ে না-গেলে তৃতীয় অঙ্ক ভালো জমতে চায় না। এদিক থেকে, এই মস্ত একটা প্রেরণা মালতী হারিয়েছে, যাতে তার সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো ছাড়া পেতে পারতো। আর তারপর—জীবিকার জন্য তাকে কাজ করতে হয় না, কোনো কাজ তাকে করতে হয় না—আর এটাই বোধ হয় সব চেয়ে খারাপ। সে মাষ্টারি করে না, রাণী যেমন করে; তার মা-র মত ভালো ইলিশ মাছ রাঁধতে পর্য্যন্ত সে পারে না। সব সময়, সবার শেষে সেই শূন্যময় গহ্বর, যেখান থেকে ফিরে আসতে হয়, যার মুখোমুখি নিজেকে একবারে নিষ্ফল, অর্থহীন মনে হয়।

আর হঠাৎ, যে-রাগ তার নিজের উপর, তার নিজের কেন্দ্রহীনতার উপর, তা প্রতিহত হ'য়ে, উর্দ্ধচূড় হ'য়ে উঠলো, রাগের একটা আরক্ত তরঙ্গ, বিমলের বিরুদ্ধে একটা দৃষ্টিহীন, রুদ্ধশ্বাস আক্রোশ। যে-বিমল তাকে চায়, তাকে না-হ'লে যার চলবে না। আর সেই মুহূর্ত্তে মালতী মনে-মনে কামনা করলে: সে ধ্বংস হ'য়ে যাক্, নিঃশেষিত হ'য়ে যাক্, বিধ্বস্ত, বিচূর্ণ, উৎপাটিত হ'য়ে যাক্—তার যেন আর-কিছু না থাকে, তার বৃহৎ, ঈষৎ-আর্দ্র পুরুষ-সত্তার, কিছু যেন আর ফিরে না আসে, সে যেন অশান্তর ঘরে গিয়ে তাকে আর দেখতে না পায়, কখনো তাকে আর দেখতে না পায়। আ—কেন এই চাপ তাকে সহ্য করতেই হবে, তার আত্মার উপর এই শ্রান্তিহীন দাবি; কেন সে বাধ্য হবে আত্ম-চ্যুত হ'তে, নিজেকে ছাড়িয়ে দিতে, নিজেকে দিয়ে দিতে? এ হ'তেই পারে না, এ থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হবে, বিমলকে ধ্বংস হ'তেই হবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি কাটলো। মালতী যদি ঈশ্বর হ'তো, তাহ'লে সেই সময়ে বজ্র ভেঙে পড়তো বিমলের মাথার উপর, তারপর তার আর এতটুকু চিহ্ন থাকতো না। কিন্তু ঢেউ গড়িয়ে চলে' গেলো মালতীর মাথার উপর দিয়ে, ঢেউ মিলিয়ে গেলো। এখনো সে শুনতে পাচ্ছে নিজের হৃৎস্পন্দন। আর তারপর আবার তার বিমলকে মনে পড়লো, ইজি চেয়ারে বসে, বই হাতে করে'। মিশরের ইতিহাস। দ্বিতীয় র‍্যামেসিস সম্বন্ধে কোনো-একটা স্বপ্ন তাকে তৈরি করতে হবে। মিশরের ইতিহাস, ইলিশ মাছ···একটা দুর্গ, তার নিজের অনধিগম্য পরিমণ্ডল। ইলিশ মাছের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে' গেছে। কড়াইর মধ্যে তাকিয়ে সে—চমকে উঠলো। সর্ব্বনাশ, মাছগুলো টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠেছে যে। এতক্ষণ সে করছিলো কী?

আঁচলটা দু' হাতের মুঠির মধ্যে গোল করে' পাকিয়ে ধরে' তাড়াতাড়ি সে কড়াইটা নামালে। লালচে ঝোল খানিকক্ষণ টগ্‌বগ্ করে' ফুটে শান্ত হ'লো।, বড় বেশি লাল হ'য়ে গেছে ঝোলের রঙ: মালতী একবার তাকালো। মশলা বেশি পড়ে' গেছে। তুলতুলে নরম, সাদা ছিলো মাছগুলো; এখন ঝোলের মধ্যে ভাসছে ইঁটের টুকরোর মত। নষ্ট করলো, এমন ভালো মাছটা সে নষ্ট করে' ফেললো। ব্যাপার বিশেষ-কিছু নয়: কিন্তু মালতীর মনের মধ্যে তা কেবলই ফেনিয়ে উঠতে লাগলো, বিষিয়ে উঠতে লাগলো। সে কিছু পারে না—ভালো করে' একটু ইলিশ মাছ রান্না করা—তা পর্য্যন্ত সে পারে না। তার সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা যেন ঝোলে ভরা কড়াইয়ের ভিতর থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর তাই সে একটা থালায় ঢেলে ফেললো মাছের ঝোল, অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ঢেকে রাখলো চাপা দিয়ে। তারপর রান্নার বাসনগুলোয় জল ঢেলে রাখলো—ঝি এসে ধুয়ে রাখবে। তারপর চিমটেয় করে' উনুন থেকে কয়েকটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো তুলে আনলো—আঁচ রাখলো কমিয়ে। উনুনটা একেবারে না-থাকলে চলে না—দাদার খেতে হয়-তো দেরি হবে: খাবার আগে যদি আবার গরম করে' নিতে হয়।

আর তারপর—আর-কিছু করবার নেই। চারদিকে সে একবার তাকালো: আর-কিছু করবার নেই তার। এখানে, এই রান্নঘরে তাকে দিয়ে আর দরকার নেই। তাকে এখন উঠতে হবে, তাকে এখন যেতে হবে।

আর দিগন্তে রয়েছে সেই মেঘ—পুঞ্জীভূত ভয়ের মত। তা তা বিশাল অদৃশ্য শুঁড় বাড়িয়ে দিচ্ছে তার দিকে; সমস্ত আকাশে ত ছড়িয়ে পড়লো, সমস্ত আকাশে; ভিতরে-ভিতরে বিদ্যুতের কী অসহ্য,

ভয়ঙ্কর চাপ! মালতী যদি একটু চুপ করে' থাকে, তাহ'লে তার শরীরের হাড় যেন ভেঙে যাবে।

সে উঠে দাঁড়ালো। উপায় যখন নেই, তখন একে সে দেখে নেবে, মুখোমুখি দেখে নেবে। পুরুষ-ইচ্ছার এই অন্ধ, নির্বোধ সর্ব্বব্যাপী মেঘ! কিন্তু সেও-কি মারতে পারে না, তার শক্তিরই কি সীমা আছে! তার দৃষ্টি থেকে কি লাফিয়ে উঠতে পারে না তীব্র, প্রচণ্ড ঝড়, আকাশের দিকে, আকাশ ভরে' দিয়ে—আর তাতে কি সেই মেঘ ছিঁড়ে যাবে না কুচি-কুচি হ'য়ে, ভেঙে যাবে না, লুটিয়ে পড়বে না ছেঁড়া নিশানের মত, কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে না?

ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে' মালতী চুপ করে' একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর একবার মুখ মুছলো আঁচলে। আঁচলটায় মশলার গন্ধ; রান্নার গন্ধ সারা গায়ে। তাকে আগে নাইতে হবে, সাড়িটা বদলাতে হবে।

আর কথাটা মনে হবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই একা ঘরে সমস্ত মুখ তার লাল হ'য়ে উঠলো: শাপ দিলে, নিজে... অভিশাপ দিলে; লজ্জায়, ঘৃণায়, অবমাননায় তার হৃৎপিণ্ড যেন তার গলায় উঠে এসে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইলো। মেয়ে! মেয়ে! চীৎকার করে' উঠলো তার সমস্ত অন্তর। যত কথাই তুমি বলো, আর যা-ই তুমি করো, তুমি মেয়ে; তোমার মাংসের প্রতি তন্তুতে তুমি মেয়ে। আর তাই তো তুমি এখন স্নান করবে, ভালো সাড়ি পরবে, আর তারপর—তারপর—

মানুষ নিজেরই মধ্যে যখন দু'টুকরো হ'য়ে যায়, যখন তার নিজের রক্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফুলে' উঠে—তুলনা নেই, সে-কষ্টের তুলনা নেই। কী ভয়ানক, কী নিষ্ঠুর, কী ভীষণ নিষ্ঠুর যে মেয়ে তাকে

হ'তেই হবে, মেয়ে না-হ'য়ে তার উপায় নেই। কোথায় যাবে সে? সমস্ত পৃথিবীর হাত সে এড়াতে পারে, কিন্তু নিজের কাছ থেকে সে পালাবে কেমন করে'?

কিন্তু, একটু পরেই সে ভাবলো, মেয়ে হ'তে কেন ভয় করবো? এই ভয় করে' আমি তাকেই তো খাতির করছি, যাকে হার মানাতে চাই। লজ্জা দিতে গিয়ে নিজেই তো কেবল লজ্জা পাচ্ছি। না, এতটুকু জায়গা আমি ছেড়ে দেবো না, উল্টোদিক থেকেও নয়। তাকে আমি ভয় করিনে: কিন্তু ভয় যে করিনে সে-কথা বার-বার এমন জোর করে' বলা হবে কেন? এত বড় সাহস আমার আছে যে আমি চুপ করে' থাকতে পারি, সহজ হ'তে পারি: আমি যা, তা-ই আমি হ'বো, এমন শক্তি আমার আছে।

আর তাই সে সেখান থেকে গেলো অশান্তর ঘরে। যা সে ভেবেছিলো! বিমল বসে' আছে ইজি-চেয়ারে, বসে' পড়ছে—মালতী এক ঝলকেই বইটা চিনতে পারলো—ক্লাইভ বেল্-এর 'আর্ট'। মালতী ঢুকতেই সে কোলের উপর বইটা নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকালো।

'দাদা কোথায়?'

'তোমার মা বললেন সে বেরিয়ে গেছে।'

টেবিলের উপর ছোট টাইমপীসটার দিকে মালতী একবার তাকালো।

'বোধ হয় তার নিমন্ত্রণ আছে কোনোখানে', বিমল বললে।

'তুমি একা বসে' আছো!'

তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি', বিমল বললে, মালতীর উপর নিবদ্ধ তার চোখ।

মালতী কিছু বললে না।

'তোমার রান্না শেষ হয়েছে ?'

একটু চুপ করে' থেকে মালতী বললে : 'তুমি বোসো, আমি চট্ করে' একটু স্নান করে' আসছি।

আর স্নানের ঘরে যখন সে একা, মালতী হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলো কী ব্যথা—কেউ যে আমাকে চায়, কী অসহ্য এর ব্যথা। আমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়, ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, উপড়ে তুলে নিতে চায়। আর যখন সে জল ঢাললো গায়ে, তার শরীরের উপর দিয়ে জলের ছোট-ছোট স্রোত বয়ে' যেতে লাগলো, সে অনুভব করলো তার হৃৎপিণ্ড যে অবিশ্রান্ত ছুড়ছুড় করছে, ঢিপঢিপ করছে, কাঁপছে, কাঁপছে, যেন তার মাংসের দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষে তা ভেঙে পড়তে চায়। অনেক সময় নিলে তার স্নানে : এই ছোট্ট বাথরুম—এই তার শেষ আশ্রয়, শেষ দুর্গ; যে-মুহূর্তে এখান থেকে বেরোবে, সেই নামহীন রহস্যের ফলা তাকে দীর্ণ করে' ফেলবে।

স্নানের পরে সে পরলো খয়েরি বুটি তোলা একটি ঢাকাই সাড়ি, চুলটা নিলে ঠিক করে' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখলো। তারপর আবার ঢুকলো এসে সেই ঘরে। বিমল তখনও পড়ছে।

'এসো', বইটা এইবার সত্যি-সত্যি বন্ধ করে' বিমল সরিয়ে রেখে দিলে।

মালতী একটা চেয়ারে বসলো, সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

একটু চুপচাপ কাটলো। বিমল সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে' স্থির, গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মালতীর দিকে। মালতী কিছু বললে না, চোখ নামিয়ে নিলে না।

'আমার যা বলবার, তা তো তুমি জানো', বিমল আস্তে-আস্তে বললে।

'হ্যাঁ, জানি। জানি। অনেক বইয়ে তা পড়েছি, অনেক কবিতায়।'

বিমল চোখ নামিয়ে নিলে।

'কিন্তু তা তো নয়', তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, 'তা তো না। বইয়ের বাইরে এই জিনিস। এটা আসল।'

'আসল ?'

'বই থেকে তুমি কী বুঝবে ? কতটুকু বুঝবে ? তুমি কি জানো না, সমস্ত বই মিথ্যা মনে হয়, অসম্পূর্ণ মনে হয় ?'

'আসল, আসল', মালতী চাপা গলায় বললে, অনেকটা যেন নিজের মনে-মনে। 'আমার মধ্যে যেটা আছে সেটাই আসল। অন্যের মধ্যে যেটা দেখছি, সেটাই মেকি।'

'অনেক সময় তা-ই হয় যে।' ছোট একটু হাসি খেলে' গেলো বিমলের মুখে।

'আমি ভাবছি', মালতী তার আঙুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে থুতনিটা তার উপর চেপে ধরলো, 'আমি ভাবছি যদি পৃথিবীতে কোনো বই না-থাকতো তাহ'লে কি তুমি আর আমি আজ এখানে এসে বসতুম—এমন করে' কথা বলতুম ? একটা গল্প তৈরি হচ্ছে—আমরা তার চরিত্র : যে যার পার্ট করে' যাচ্ছি।'

একটু সময়, বিমল চুপ করে' মালতীর দিকে তাকিয়ে রইলো ; সেখানে আজ অসাধারণ, অস্বাভাবিক দীপ্তি, যেন ভিতরের কোনো আগুনে তা পুড়ছে।

'ও-কথা কেন বলছো ? যদি তা-ই হ'তো, তাহ'লে কি তুমি আজ এমন কষ্ট পেতে ?'

আর হঠাৎ মনে হ'লো যেন মালতীর কালো চোখের ভিতর থেকে কালো একটা সাপ ফণা তুলে ছুটে এলো তাকে মারবে বলে'।

অর্দ্ধেক উঠে এলো তার হাত, চোখ ঢাকবার জন্য। কিন্তু গেলো সেই মুহূর্ত্ত কেটে, তার হাত আবার নেমে এলো তার পাশে: নির্ভীক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো।

'কত জানো তুমি!' মালতীর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ক্ষীণতম সুর। 'কত জানো তুমি অন্যের সম্বন্ধে!'

'ভুল তো আমি বলিনি। তোমাকে দেখেই তা বোঝা যায়।'

'কী বোঝা যায়?'

বিমল চুপ করে' রইলো।

মালতী তার আঙুলের মধ্যে আঁচলের প্রান্তটা জড়িয়ে আবার খুলে ফেললো।—'আর এখন—আমাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে—এ-ই তো?' কথাটা শেষ করে' সে বিমলের দিকে চোখ তুললো।

তবু বিমল কিছু বললে না। চাপা তার ঠোঁট, দীর্ঘ অপেক্ষার স্থৈর্য্য তার মুখে। আর শান্ত তার চোখ, শান্ত: প্রিয়-দর্শনের আনন্দ থেকে আসে যে-শান্তি, সেই শান্তিতে স্নিগ্ধ।

'তুমি কি তা-ই চাও না?' মালতী আবার বললে।

'কেন জিজ্ঞেস করো? জানোই তো।'

'জানি! জানি!' নিবিড় চাপা গলায় মালতী বলে' উঠলো। 'সবই আমি জানি। বলতে পারো না? তুমি কিছু বলতে পারো না?' বলতে-বলতে তার নিশ্বাস দ্রুত হ'য়ে উঠলো; সে ঠোঁট চেপে ধরলো দাঁত দিয়ে।

একটু চুপ করে' থেকে বিমল বললে, 'কার সঙ্গে তুমি ঝগড়া করছো?'

'ঝগড়া করছি কে বললে তোমাকে? কিন্তু তুমি বড় বেশি ধরে' নিচ্ছো। আমি কিছুই জানিনে; আমি জানতে চাই।'

'যদি নিজেকে কষ্ট দিয়ে তোমার ভালো লাগে আমি কী করতে পারি?'

কিন্তু মালতী যেন কথাটা শুনতেই পেলো না—'তোমার মনে যখন একটা প্রশ্ন আছে, আমাকেও একটা উত্তর দিতে হবে বোধ করি? সেই উত্তর পেলেই কি তুমি চলে' যাবে?'

'হ্যাঁ, উত্তর নিয়েই যাবো বইকি।'

'শোনো তবে : তুমি যা চাও তা হবে না, হ'তে পারে না।'

'এ-উত্তর আমি নিতে পারিনে', প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিমল বলে' উঠলো।

'তুমি যা চাও, তা-ই কি হ'তেই হবে সব সময়ে?'

'সব সময় না-ই বা হ'লো। একবার হোক্। এবার হোক্।'

মালতী মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো; সাদা ইলেকট্রিকের আলো চিক্‌চিক্ করে' উঠলো তার কালো চুলে।—'নিজের বাইরে তুমি কি কিছুই দেখতে পাও না কখনো?'

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি খুব স্পষ্ট করে'ই।'

'হ্যাঁ, আমাকে দেখতে পাচ্ছো। তোমার জীবনের অন্যতম উপার্জ্জন, তোমার মস্ত গৌরব—তুমি তা সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতে পারবে।'

'এমন দুর্ভাগ্য যেন না হয় যে কেবল জীবিকা অর্জ্জন করে'ই মরলাম। অন্য-কিছু অর্জ্জন করতে দাও আমাকে।'

'আমি তোমার বিশ্রাম, আমি তোমার আশ্রয়', যেন একটা সম্মোহনের ভিতর থেকে মালতী বলতে লাগলো, 'আমি তোমার অবসরের রঙ। তুমি আমাকে যত্নে লালন করবে, তুমি আমাকে আড়াল করবে পৃথিবী থেকে, তুমি আমাকে "ভালোবাসবে"।'

'ভালো তো বাসবোই।'

'একজন পুরুষ আমাকে "ভালোবাসবে" আর সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে আমার !'

বিমল চেয়ার ছেড়ে উঠলো, দাঁড়ালো জানলার কাছে গিয়ে। আকাশ ছেঁড়া মেঘে এলোমেলো, তারই এক ফাঁকে মস্ত, নিঃসঙ্গ একটা তারা চুপ করে' তাকিয়ে আছে। নিচে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের ধার ঘেঁসে গাছ উঠেছে, ইলেকট্রিক আলোয় তার মসৃণ পাতাগুলো জ্বলে' উঠেছে সবুজ আভায়। বিমল তাকিয়ে রইলো, দাঁড়িয়ে রইলো।

আর মালতী তার নীরব, নিরপেক্ষ পিঠের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হঠাৎ যেন বুঝতে পারলে কী দুঃসহ, কী প্রচণ্ড এর শক্তি, এই অন্ধ, উত্তপ্ত পুরুষ-ইচ্ছার—যা তাকে চায়, তাকে চায়, চায়, চায়। যেন বুঝতে পারলে তার নিজের অপরিসীম ক্ষুদ্রতা ; কোথায় লুকোনো আছে তার মধ্যে ক্ষুদ্র, অদৃশ্য এক দুর্ব্বলতা—তার রক্তকে তা জল করে' দিচ্ছে। দিগন্তকে আঁকড়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর কালো মেঘের স্তূপ—এই নীরবতায়, এই নিরপেক্ষতার ভিতর থেকে হাত বাড়াচ্ছে তার দিকে, তাকে টেনে নিচ্ছে, তাকে উপড়ে ফেলছে। এ কোনো কথা বলে না, এ প্রতিবাদ করে না ; এর মধ্যে চঞ্চলতা নেই, উত্তেজনা নেই : শুধু এর নীরবতার ভয়ঙ্কর নিষ্পেষণে আমি চূর্ণ হ'য়ে গেলাম ; শুধু এর বাসনার দুর্নিবার, উত্তপ্ত হাত এগিয়ে আসছে, কেবলই আমার দিকে এগিয়ে আসছে—সমস্ত আকাশ পার হ'য়ে সমস্ত সময় ছাড়িয়ে গিয়ে জাপটে ধরতে চাইছে আমাকে। যত কথাই সে বলুক, তার সমস্ত কথার ক্ষমতা নেই সেই মেঘপুঞ্জে ক্ষুদ্রতম রন্ধ্র রচনা করে। দুর্ব্বল—সে দুর্ব্বল, নিষ্ফল। তার আছে কেবল কথা, কথা : কিন্তু কথা কতটুকু, কথার বিষাক্ত তীর কতদূর যেতে পারে ? এই পুরুষের বাসনা উঠছে যেখান থেকে, কথা সেখানে পৌঁছয় না : আর তাই এর ফেরানো পিঠের স্তব্ধতা যেন

বাসনার বিদ্যুৎময় পরমাণুর নৃত্যে ফেটে পড়তে চাইছে। একে নিয়ে, সে কী করবে—এই ভীষণ, বিদ্যুৎময় নীরবতা নিয়ে কী করবে সে?

মালতীর একবার মনে হ'লো উঠে চলে' যায় এ-ঘর থেকে, নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' দেয়। পুরুষের বাসনা নিজের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরুক, ঝরে' পড়ুক শূন্যতায়, ব্যর্থতায় যাক্ নিঃশেষ হ'য়ে—সেই ভীষণ, নামহীন শক্তি নিজের ধারে নিজেকে ক্ষয় করে' দিক্। সে থাকবে দূরে—একা, বিচ্ছিন্ন, নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ।

না—তাতে তো তারই পরাভব। সে যদি এখান থেকে চলে' যায়, সে যদি চিরকালের মত দরজা বন্ধ করে' দেয়, তবু, মালতীর মনে হ'লো—তবু তা মরবে না, নামহীন, অন্ধকার সেই শক্তি, শূন্যতায় তা ঝরে' পড়বে না, যাবে না নিঃশেষ হ'য়ে। তা ফিরে আসবে, ফিরে আসবে—তারই বুকের মধ্যে দীর্ঘ অন্ধকার, অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ—তা পার হ'য়ে একদিন এসে ভেঙে পড়বে তার হৃৎপিণ্ডের উপর। না, মুখোমুখি দেখাই সব চেয়ে ভালো: দেখা যাক কোথায় এই অন্ধকারের শেষ; দেখা যাক তা ছাড়িয়েও আরো কিছু, অন্য-কিছু আছে কিনা।

কিন্তু মালতী কিছু বললে না। সে বসে' রইলো চুপ করে', বিমলের প্রশস্ত, সুগঠিত পিঠের দিকে তাকিয়ে। সে কি বুঝতে পারছে না, অনুভব করতে পারছে না এই দৃষ্টি? সে কি যাচ্ছে না দীর্ণ হ'য়ে, ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠছে না স্নায়ুর তারে-তারে? কতক্ষণ, আর কতক্ষণ সে সইতে পারবে এই স্তব্ধতার নিষ্পেষণ? এই তার শান্তি—তা কি তারই বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসে উঠবে না, তাকে ভেঙে ফেলবে না উন্মত্ত কলরোলে, উতরোল, উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে। আর তখন—তখন মালতী চুপ করে' থাকবে, চুপ করে' তাকিয়ে দেখবে, নিঃশব্দে চলে' যাবে।

আর খানিকক্ষণ পরে বিমল মুখ ফিরিয়ে তাকালো। 'রাত বাড়ছে', মৃদুস্বরে সে বললে।

'তুমি এখন যাও।'

কিন্তু বিমল স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যেখানে সে ছিলো।

'তুমি এখন যাও', মালতী আবার বললে।

'আর-একটু থাকি।' বিমলের চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মালতীর মুখের উপর এসে পড়লো।

মালতীর চোখ নিজে থেকেই নেমে এলো, যেন কিসের ভারে। সঙ্গে-সঙ্গে লজ্জা হ'লো তার : কেন আমি ওর দিকে তাকাতে পারবো না? জোর করে' সে তুললো তার চোখ : আর বিমলের মুখ তার মনে হ'লো যেন অস্পষ্ট, অপরিচিত—কোন্ রহস্যে অন্ধকার যেন। আর আতঙ্ক বেজে উঠলো তার বুকে ভীষণ কোনো ঘণ্টার মত। দুই হাত উপরের দিকে তুলে সে লুটিয়ে পড়তে চাইলো; তার বুকে ঠেলে' উঠতে চাইলো প্রার্থনা : দয়া করো, দয়া করো আমাকে—তোমার মুখ ফিরিয়ে নাও।

তবু সে বললে, যেন দাঁতে দাঁত চেপে ধরে' : 'তা'হ'লে এখন তোমার একজন স্ত্রীর দরকার?'

'এটা বুঝতে পারছি যে তোমাকে আমার দরকার।'

'একজন স্ত্রী—তোমার জীবনে যে আনবে পুণ্য, আনবে কল্যাণ, আনবে স্বর্গের বসন্তের হাওয়া। আর তুমি—তোমার যখন সময় হবে—তুমি তাকে একটু আদর করবে, কথা বলবে মিষ্টি করে', মেজাজ ভালো থাকলে তার জন্য সাড়ি কিনে আনবে।'

বিমল জানলার দিক থেকে একটু এগিয়ে এলো—স্তব্ধ, অন্ধকার, রহস্যে নিবিড় তার মুখ। আর মালতীর ইচ্ছে করলো চীৎকার করে' ওঠে, তাকে বাধা দেয়, দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখে—এই যে

ভয়ঙ্কর, অন্ধকার অভ্যাগম ঘনিয়ে আসছে—তাকে বিনাশ করতে, তাঁর সমস্ত জীবনকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে উদ্যত। তার শরীরের কঙ্কাল যেন কেঁপে উঠলো যন্ত্রণায়—তাকে আসতে দেখে, আরো কাছে আসতে দেখে।

'তুমি চুপ করে' আছো কেন?' রুদ্ধস্বরে সে বলে' উঠলো, 'তুমি কথা বলতে পারো না? কিছু বলতে পারো না?'

বিমল নিঃশব্দে মালতীর কাছে এসে দাঁড়ালো, একখানা হাত তুলে আস্তে রাখলো তার কাঁধের উপর। যেন নদীর উপর আকাশের সমস্ত মেঘ নুয়ে পড়লো; সমস্ত আকাশের মেঘ ভেঙে পড়লো মালতীর শরীরের উপর। মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হ'লো আর সে সইতে পারবে না: এই ভীষণ নিষ্পেষণে সে মরে' যাবে—এই হাত তাকে চূর্ণ করে' ফেলবে পাকা আঙুরের মত, নিঙড়ে বার করে' নেবে তার সমস্ত গোপন প্রাণ-রস। তার চোখ বুজে এলো; আর সেই হাতের স্পর্শ যেন তার চামড়া ভেদ করে' মাংসের মধ্যে ঢুকে গেলো—তার শরীরের মাংস জ্বলছে, জ্বলছে, আর সেই হাত থেকে একটা আগুনের স্রোত তার রক্তের মধ্যে গিয়ে মিশলো, একটা অগ্নি-স্তূপ হ'য়ে উঠলো তার সমস্ত শরীর, চোখ বুজে সে তা অনুভব করতে লাগলো—সেই জ্বলন্ত স্রোত আর মধ্যে ঝরে' পড়ছে, ঝরে' পড়ছে: এখন আর কষ্টও নয়, এখন মূর্চ্ছা—তীব্র মূর্চ্ছার মত মধুর। আর তার সচেতন মনের ভাঙা-চোরা, কাটা-ছেঁড়া তাকে বয়ে' বেড়াতে হবে না: এখন এসেছে মৃত্যু, মৃত্যুর মধুর সম্পূর্ণতা।

আর যখন সে চোখ খুললো, বিমলের ঈষৎ আনত মুখ তার মনে হ'লো সুন্দর, পরম সুন্দর, অপরূপ। কে জানতো—এত সুন্দর তুমি তা কে জানতো। 'তুমি আমাকে চাও, সত্যি?' বিহ্বলের মত সে বলে' উঠলো, 'সত্যি চাও? সত্যি?' বলতে-বলতে তার গলা ভেঙে গেলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে মালতী অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারলো না। কিছু সে ভাবছিলো না, তার আশে-পাশে কোনো জিনিস সে টের পাচ্ছিলো না। কেবল আনন্দ: আনন্দ উঠছিলো তার বুকের ভিতর থেকে, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ স্রোতে। তাকে বোঝা যায় না, তার কোনো নাম দেয়া যায় না। শুধু চুপ করে' শুয়ে থাকতে হয়, শুধু চুপ করে' থাকতে হয়; নিজের শরীরটাকেও আর অনুভব করা যায় না। সে গলে' গেলো, ভেসে গেলো, আনন্দে আর সমর্পণে; সে যেন নিজের ভিতর থেকে খুলে গেলো; উন্মুক্ত, উন্মোচিত হ'য়ে বেরিয়ে এলো আত্ম-সমর্পণে আর পরিপূর্ণতায়। এই আনন্দের উৎসে এতদিন সে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলো; তার ভিতরে ছিলো পাথর, পাথর—কষ্টে সে মরে' যাচ্ছিলো। আজ এসেছে মুক্তি। আজ সে গলে' যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে, হৃৎস্পন্দনের পর হৃৎস্পন্দনে। আনন্দের ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে ভাসিয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তার সব, এতদিন সে যা-কিছু ছিলো, যত ভাবনার, যত মোহের, যত গর্ব্বের সমষ্টি এতদিন সে ছিলো। আজ এসেছে মুক্তি।

দিন পনেরো পরে অত্যন্ত শান্তভাবে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেলো। আয়োজনের কোনোরকম বাড়াবাড়ি হ'লো না। এলো উভয়পক্ষের কয়েকজন আত্মীয়, এলো রাণী ইস্কুল থেকে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে।

বিয়ের পরদিন বিমল তার নিজের বাড়িতে চলে' গেলো মালতীকে নিয়ে। আর যদিও হৈ-চৈ কিছু হয়নি, তবু সমস্ত বাড়ি হঠাৎ যেন শূন্য হ'য়ে গেলো। অশান্ত আর রাণী পা টিপে হাঁটে, চুপি-চুপি কথা কয়। কেমন অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা, তা কী যেন মনে করবার, কী যেন বলে' ওঠবার চেষ্টা করছে। বাতাসে কিসের গন্ধ লেগে রয়েছে, তাকে ভোলা যায় না।

বাসন্তীর শরীর ছিলো ক্লান্ত, সন্ধের পরেই তিনি শুয়ে পড়লেন। খাবার সময় অশান্ত তাঁকে ডাকতে গেলো, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

রাণী বললে, 'থাক্, ডেকো না, ঘুমোতে দাও—কাল তো তাঁর এতটুকু ঘুম হয়নি। চলো আমরা নিজেরাই গিয়ে খেয়ে নিই।'

'আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না', অশান্ত বললে।

'আমারও না। তবু চলো একটু খাবে।'

দু'জনে নামমাত্র খেয়ে উঠলো, তারপর বসলো অশান্তর ঘরে গিয়ে। কারো মুখে কথা নেই, দু'জনে চুপ করে' কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে।

রাত্রের শেষ ছোটখাটো কাজ শেষ করে' ঝি চলে' গেলো, অশান্ত উঠে গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে' দিলে। হঠাৎ সমস্ত বাড়িটা এমন চুপচাপ, একটু-একটু যেন ভয় করে।

'যাই, শুয়ে থাকি গে', রাণী বললে।

'হ্যাঁ, আমারও ঘুম পাচ্ছে।'

রাণী চলে' গেলো পাশের ঘরে, যেটা ছিল মালতীর। অশান্ত দেরি করলে না, আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

সে কি ঘুমিয়েছিলো? সে কি চুপ করে' জেগে ছিলো সমস্তক্ষণ? সে মনে করতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে ঝড় উঠলো রাত্রির বুকে, সমস্ত রাত্রি আলোড়িত, উন্মথিত, আবর্তিত হ'য়ে উঠলো।

জোয়ার এলো রাত্রির সমুদ্রে, রক্তের সমুদ্র উঠলো দুলে। রক্তে সমুদ্রে উঠলো ঢেউ ; দুই বিশাল উত্তপ্ত ঢেউয়ের সংঘর্ষে ফেনার ফোয়ারা আকাশে লাফিয়ে উঠলো, দুলে উঠলো সমুদ্র, পরস্পরের মধ্যে মিশে গেলে দুই ঢেউ—তারপর আর-কিছু রইলো না—কোনো আকাশ, কোনো পৃথিবী, কোনো অনুভূতি—কিছু রইলো না। শুধু চিরন্তন রাত্রি, আর রক্তের সমুদ্রের নিঃসীম অন্ধকার।

কী করে' রাত কাটলো কেউ টের পেলো না। বুঝতে পারলে না কী তারা স্পর্শ করলে, কী তারা অনুভব করলে, কী মৃত্যু জানলে তাদের শরীর, কোন্ নব-জন্ম। তারপর ভোরের দিকে ক্লান্তিতে তাদের চোখ জড়িয়ে এলো, ক্লান্তিতে, শান্তিতে, অপরূপ, অপরূপ শান্তিতে। তারা স্তব্ধ হ'য়ে রইলো সেই শান্তিতে, পরস্পরে পরিপূর্ণ ; ঘুম এলো না। ভোর হ'য়ে এলো, জানলার কাচে প্রথম ধূসর আলো এসে লাগলো ; তবু তাদের ঘুম এলো না।

তখন রাণী বললে, নিঃশ্বাসের স্বরে : 'অবাক হয়েছিলে ?'

'না।···আমি জানতুম।'

'আর এখন—তুমি কি সুখী হয়েছো ?'

অশান্ত একবার সেই অস্পষ্ট আলোয় রাণীর দিকে তাকালো, তারপর চোখ বুজলো।

'বলো না।'

'হ্যাঁ, হয়েছি সুখী। তুমি ?'

রাণীর দীর্ঘশ্বাস অশান্তর মুখে এসে লাগলো।

'এরই মধ্যে দিন !' একটু পরে অশান্ত বললে।

'এখনো দেরি আছে। এখনো একটু সময় আছে।'

অশান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলো—'আর এর পর ?'

'কী তুমি ভাবছো?'

'একটু পরেই আসবে দিন। আসবে মানুষ। মানুষের পৃথিবী।'

'তা সইতে পারবে না?'

'এ যদি হারিয়ে যায় তবে কী করবো?'

'হারিয়ে যাবে না।'

'যাবে না?'

'না, যাবে না।'

দীর্ঘ নীরবতা। আলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো; বাইরের ম্লান আকাশ হ'য়ে উঠেছে নতুন রোদে।

'এখনো কি তোমার ভয়?' রাণী বললে।

'দিন!' অশান্ত বলে' উঠলো, ঘরের মধ্যে তাকিয়ে।

'হোক্ না। অনেক সময় আছে এখনো। আছে সমস্ত জীবন।'

'এই তো—তুমি এখন চলে' যাবে আমাকে ছেড়ে।'

'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো!'

আর আবার তারা অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলো, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারপর অশান্ত চোখ মেলে' দেখলো পূবের জানলা দিয়ে নরম, সোনালি রোদের রেখা ঘরে এসে পড়েছে। বালিসের মধ্যে সে চেপে ধরলো মুখ—অন্ধ হ'য়ে যেতে, অন্ধকার করে' দিতে।

রাণী আস্তে-আস্তে উঠলো।

'তুমি একটু ঘুমোও, আমি চা করে' আনছি।'

কিন্তু অশান্ত আরো জোরে মুখ চেপে ধরলো বালিসে। সে ভাবতে না—নানা কাজে, নানা বাজে জিনিসে মেশানো দীর্ঘ দিনের সে ভাবতে পারে না।

পরস্পর

রাণী একটু অপেক্ষা করলো।

'শোনো', সে ডাকলে।

অশান্ত মুখ তুললো।

'তাকিয়ে একটু ছাখো, 'কী সুন্দর দিন।'

অশান্ত রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'এই দিন এখনই কেন এসে ডাকলো? এই দিনই তো তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে '

'না, না, ও-কথা বোলো না। তাকে আসতে দাও, তাকাও তার দিকে। খুসি হ'য়ে তার দিকে তাকাও—আমাদের নতুন জীবনের এই প্রথম দিন।'